বিপ্লবী বীর
সাভারকর



বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র - 9339499595

বিপ্লবী বীর সাভারকর

শ্রীহৃষীকেশ শীল

বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

বিপ্লবী বীর সাভারকর

প্রকাশক ঃ
শ্রী অরুণ ঘোষ
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা -৭০০ ০৭৩

পরিবর্দ্ধিত ২য় সংস্করণ ঃ শ্রাবণ, ১৩৭৩

নতুন রূপে প্রকাশ ঃ আশ্বিন, ১৪১১

লেজার টাইপসেটিং
"ডিজিটেক"
কলকাতা

মুদ্রক

৪০৭

মূল্য ঃ সাধারণ বাঁধাই ৮০.০০
বোর্ড বাঁধাই ১০০.০০

—উপক্রমণিকা—

জাতীয় মুক্তিমন্দিরে কংগ্রেস যখন আবেদন-নিবেদন নৈবেদ্য হস্তে চরমে নরমে বিভ্রান্ত পান্থ্ মাত্র জাতীয় জাগরণের সেই প্রথম প্রভাত লগ্নে ভারত জননীর অসীম সাহসী সন্তান বীর বিনায়ক রাও দামোদর সাভারকর অভিনব-ভারত প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করিয়া অভিনব উপায়ে স্বদেশ জননীর হস্ত হইতে লৌহ শৃঙ্খল বিদূরিত করিয়া সুবর্ণবলয়ে সালঙ্কৃতা করিবার জন্য প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন বিপ্লব-বহ্নি। বিপ্লবী সাভারকরের রক্তরাগ রঞ্জিত একটি পদবিক্ষেপ অপরটি অপেক্ষা অধিকতর রহস্যঘন রোমাঞ্চকর ও বিস্ময়কর। কাল বিজয়ী শিলালিপি তুল্য পদচিহ্ন শব্দতুলিকার রূপায়ণ প্রয়াসে অনবধান জনিত ত্রুটি ক্ষমার্হ।

শৌর্য্যপ্রদ, মুক্তিপ্রদ এই পদচিহ্ন অনুসরণে Chitra Gupta সঙ্কলিত Life of Barrister Savarkar গ্রন্থখানি প্রধান দিশারী। উক্ত পাণ্ডুলিপির বহুলাংশ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন হিন্দু মহাসভার অন্যতম বিশিষ্ট নায়ক অখণ্ড বঙ্গের এম, এল, এ, স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ দাশ। তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি। নিউ ইণ্ডিয়া বক্সের অন্যতম সত্ত্বাধিকারী শ্রী ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র মহোদয়ের প্রচেষ্টায় পুস্তকখানি প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে। তাঁহার আন্তরিকতার জন্য চিরকৃতজ্ঞ। সাভারকরজীর 'ব্লক' দিয়াছেন হিন্দুমহাসভা কর্মী শ্রীজ্যোতি রায় ও শ্রীষোড়শ পাল। তাহাদের এই সৌজন্যের জন্যও চির কৃতজ্ঞ।

আমাদের তরুণ তরুণীগণ যদি স্বদেশ ও স্বজাতির হিতৈষণায় অনুপ্রেরণা লাভ করেন তাহা হইলেই শ্রম সার্থক মনে করিব।

শ্রীহৃষীকেশ শীল।

ধর্মান্তরিতরাই পৃথক জাতীয়তার ধূয়াতুলছেন। পৃথক রাষ্ট্রের দাবী করেছেন। পৃথক রাষ্ট্র করায়ত্ব করে প্রথম সুযোগেই সেখান থেকে হিন্দুদের নিশ্চিহ্ন করছেন।

— বীর সাভারকর।

শুধুমাত্র প্রতিবাদ প্রতিরোধ করিবার শক্তিই যথেষ্ট নয়।
শত্রুর মনে ভয় সৃষ্টি করিবার মত ক্ষমতা দেখাইতে
পারিলেই তাহার পক্ষে শান্তি অনাক্রমণ ও
অহিংসার কথা বলা শোভা পায়।

— বীর সাভারকর।

ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায় যতদিন না হিন্দুস্থানের মঙ্গল ও উন্নতিকে নিজেদের মঙ্গল ও উন্নতি বলে মনে করছেন অন্তঃত ততদিন হিন্দু জাতির কর্তব্য হবে নিজেদের বিভিন্ন সূক্ষ বন্ধনগুলি দূর করে এক অখণ্ড ও জীবন্ত সমাজে গড়ে তোলার জন্য। প্রাণপণ চেষ্টা করে যাওয়া।

— বীর সাভারকর।

রাজনীতি হিন্দু ভাবাপন্ন কর—হিন্দুজাতিকে যোদ্ধাজাতিতে পরিণত করা।

— বীর সাভারকর।

ভারতে ধর্মের পরিবর্তন ন্যাশনালিটির পরিবর্তনের সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই ধর্মান্তর সম্পর্কে আমাদের সতর্ক হতে হবে।

— বীর সাভারকর।

বিপ্লবী বীর সাভারকর

(এক)

"যাহার শক্তিতে আছে
অনাগত যুগের পাথেয়—
সৃষ্টির যাত্রায় সেই
দিতে পারে আপনার দেয়।"—রবীন্দ্রনাথ

ভারত জননীর সেই অসীম সাহসী সন্তান দেশবাসীকে বৈপ্লবিক পন্থায় বৈদেশিক শাসন মুক্ত করিবার জন্য ধমনীর প্রতিবিন্দু রক্ত এবং যৌবনের উদ্যম নিঃশেষ করিয়া স্বকীয় রোমাঞ্চকর কার্য্যকলাপে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করিয়াছেন, যিনি স্বদেশী আন্দোলনে দণ্ডিত প্রথম ভারতীয় ছাত্র, বিদেশী বস্ত্র বহ্ন্যুৎসবের প্রথম ভারতীয় হোতা, ধর্মাধিকরণ বঞ্চিত প্রথম ভারতীয় ব্যারীষ্টার, প্রথম ভারতীয় বিপ্লবী যাঁহার আত্মচরিত প্রকাশ সরকারী আদেশে নিষিদ্ধ ছিল, প্রথম ভারতীয় সাহিত্যিক যাঁহার গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বেই বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল, নিখিল বিশ্বের একমাত্র দেশপ্রেমিক যিনি দুইবার যাবজ্জীবন (৫০ বৎসর) নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, প্রথম ভারতীয় বিপ্লবী যিনি ইংরাজ আদালতে আত্ম সমর্থন করেন নাই, পৃথিবীতে একমাত্র কবি ও সাহিত্যিক যিনি কাগজ কলমের অভাবে কারাপ্রাচীরে কাঠ-কয়লা দিয়া কবিতা ও গ্রন্থ রচনা করেন। কাল্পনিক রহস্য অপেক্ষাও বৈচিত্র্যপূর্ণ তাঁহার ঘটনাবহুল জীবন কথা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য নয় অসাধ্য বলিলেও সত্যের বিন্দুমাত্র অপলাপ করা হয় না। কারণ জনগণ যখন উল্লাসমত্ত, বিপ্লবী তখন ব্যাপৃত থাকেন অভিষ্ট সাধনে, বিশ্বচরাচর যখন ঘুম ঘোরে অজ্ঞান অচৈতন্য, বিপ্লবী তখন বিনিদ্র যামিনী যাপন করেন জীবনব্রত সাধনে। লোকচক্ষুর অন্তরালে বিপ্লবীর কর্মক্ষেত্র, তজ্জন্য সর্বদা বিপ্লবীকে অনুসরন করা যায় না। স্বাতন্ত্র্যবীর বিনায়ক রাও দামোদর সাভারকরের কর্মক্ষেত্র ভারতের সীমারেখা অতিক্রম করিয়া বর্হিভারতেও বিস্তীর্ণ ছিল। ক্ষত্রবীর্য্য ও ব্রহ্মতেজোদীপ্ত এই বিক্রমী পুরুষের ঘটনা বহুল জীবনকথা বর্ণনা করা ততোধিক সুকঠিন। তথাপি মহাপুরুষের জীবনী ও বাণী আলোচনায় জাতীয় জীবন উন্নততরই হয় এই নীতিবাক্য স্মরণ করিয়াই বীর চরিত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

জাপানে হিন্দুমহাসভার সভাপতি সংগ্রামী নায়ক রাসবিহারী বসু মহোদয় বীর সাভারকরকে অভিনন্দিত করিয়া বলিয়াছিলেন, 'I am saluting the symbol of sacrifice itself, Oh, Savarkar, your leadership is the greatest hope in India'......অর্থাৎ হে সাভারকর, আপনাকে অভিনন্দন করিতে গিয়া ত্যাগের প্রতীককেই অভিনন্দন করিতেছি। ভারতে আপনার নেতৃত্বই আমাদের বৃহত্তম আশা।' মুক্তি সংগ্রামে

দুঃখ কষ্ট, নির্যাতন নিগ্রহ নিপীড়ন সহনশীলতায় মর্তের মূর্ত প্রতীক বীর **বিনায়ক রাও দামোদর সাভারকর** মহারাষ্ট্রের চেৎপাবন ব্রাহ্মণ বংশের অন্যতম মুখোজ্জ্বলকারী। ঐতিহ্যমণ্ডিত ভুবনবিদিত এই ব্রাহ্মণ বংশ যুগ প্রেরণায় ভারতের ইতিহাসে গৌরব মণ্ডিত নব নব অধ্যায়ের অভ্যুদয়কারী। চেৎপাবন ব্রাহ্মণ বংশীয় পেশোয়া বালাজী বাজিরাও ভারতে ইসলাম রাজ্য বিস্তারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। এই বংশের সন্তান নানা ফড়নবীশ্‌, নানা সাহেব, চাপেকর ভ্রাতৃদ্বয়, রাণাডে, মহামতি গোখেল, লোকমান্য তিলক ভারতের গণশক্তি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছিলেন। বীর বিনায়ক রাও দামোদর সাভারকরের অগ্রজ ঁগণেশ রাও দামোদর সাভারকর (বাবা রাও) আন্দামানে প্রথম ছয়জন ভারতীয় রাজনৈতিক বন্দীর অন্যতম, যাঁহাকে অন্তরীণ রাখিবার জন্য রাজসরকারকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১ এর (ক) ধারা প্রণয়ন ও বিধিবদ্ধ করিতে হইয়াছিল। বীর সাভারকরের অনুজ ঁডাঃ নারায়ণ রাও দামোদর সাভারকর রাজদ্রোহের অপরাধে অশেষ ক্লেশ এবং নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন। বিপ্লব জগতে এই ভ্রাতৃত্রয় সাভারকর ব্রাদার্স নামেই সুবিদিত। বিনায়ক সাভারকর মহারাষ্ট্রবাসীর নিকট তাঁতীয়া তোপী (মহানায়ক) নামেই সম্মানিত হন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ২৮শে মে নাসিক জেলার অন্তর্গত ভাগুর গ্রামে **দামোদর পন্থ** সাভারকরের গৃহে বিনায়ক যখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন তখন কুল-ললনার উলুধ্বনি এবং শঙ্খনিনাদ নবশিশুর আগমনবার্তা দিক্‌দিগন্তে বিঘোষিত করিতেছিল। সেইসময় কেহ কী কল্পনাও করিতে পারিয়াছিল যে, এই শিশুই একদিন সন্তরণে সাগর অতিক্রম করিয়া আন্তর্জাতিক বিচারসভাকে আলোড়িত করিবে? কে জানিত এই নবজাত শিশু বিধাতার এক অপূর্ব সৃষ্টি, কল্পনার শ্রেষ্ঠ রহস্য অপেক্ষাও রহস্যময় ইহার ভাগ্যলিপি? কে ভাবিয়াছিল এই শিশু আন্দামানে চতুষ্পদ বলীবর্দের মত কাষ্ঠঘানিতে সর্ষপ নিষ্পেশন করিবে এবং এই শিশুকেই আবার দিল্লীর রাজপ্রাসাদে রাজপ্রতিনিধি সম্মান সহকারে অভ্যর্থনা করিয়া ভারতের জটিল সমস্যার সমাধান ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতবাসীর সৌহার্দ্দ্যপূর্ণ সহযোগিতার জন্য উপদেশ চাহিবেন? সত্যই 'পুরুষস্য ভাগ্যং দেবাঃ নঃ জানন্তি।......'

দশ বৎসর বয়সে বিনায়ক সাভারকর মাতৃহীন হইলেন। পিতাও দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহণ না করিয়া পিতৃশাসন ও মাতৃস্নেহে তিনটি নাবালকপুত্র ও একটি নাবালিকা কন্যাকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। দামোদর পন্থ সুকবি ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত এবং রাজপুত ও মারাঠা জাতির বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী প্রাণবন্ত ভাষায় পিতা যখন বর্ণনা করিতেন বালক বিনায়ক তখন বালসুলভ চিত্তচাঞ্চল্য বিস্মৃত হইয়া বিমুগ্ধচিত্তে তাহাই শ্রবণ করিতে করিতে তন্ময় হইয়া যাইতেন। এইরূপে পিতার কবিপ্রতিভা পুত্রেও প্রসারিত হইয়াছিল। দশ বৎসর বয়সেই বিনায়ক সাভারকর কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার তৎকালীন কবিতা ও প্রবন্ধ উচ্চশ্রেণীর পত্র পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইয়া সকলেরই প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। সম্পাদক কিম্বা পাঠক কেহই অনুমানও করিতে পারিতেন না

যে অনুরূপ প্রাণময় বীর্য্যবন্তভাব ও ভাষা দশম বর্ষীয় বালকের লেখনী প্রসূত। অচিরেই বিনায়ক সাভারকর একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও কবিরূপে সর্বত্র সম্মানিত হইতে লাগিলেন। পিতা পুত্রের হৃদয় ক্ষেত্রে সাহিত্যের এবং পৌরুষের যে বীজ বপন করিয়াছিলেন এইরূপে তাহা অংকুরিত হইয়া জীবন বিকাশের স্তরে স্তরে কিরূপে কালক্রমে বিশাল মহীরুহে পরিণত হইয়াছিল তাহা যথাস্থানে আলোচনা করিব।

বিনায়ক বাল্যকাল হইতেই অতিশয় অধ্যয়ন প্রিয় ছিলেন। বিবিধ গ্রন্থ এবং সংবাদপত্র হইতে ঘন্টার পর ঘন্টা একাসনে বসিয়া জ্ঞান সঞ্চয় করিতেন। স্বদেশ ও বিদেশের তথ্যপূর্ণ ঘটনাবলী বক্তৃতারূপে অনর্গল বর্ণনা করিয়া তরুণ বন্ধুদিগকেও নব উদ্দীপনায় প্রবুদ্ধ করিতেন। এইরূপে ক্রমশ তিনি জ্ঞানী ও বক্তারূপে বন্ধুমহলে নেতৃস্থানীয় হইয়া উঠিলেন। এক সময় সত্য সত্যই তাঁহাকে প্রকৃত নেতার মত বন্ধুদিগকে আক্রমণকারীর হাত হইতে রক্ষা করিতে হইয়াছিল। ১৮৯৩-৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ ধর্মোম্মাদ নরঘাতকের লীলাভূমি ছিল। ধূলিকণা নর শোণিতে পঙ্কিল, বায়ুমণ্ডল সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে সমাচ্ছন্ন—হিন্দুমুসলমান শক্তি পরীক্ষায় পরস্পরের সম্মুখীন। সাম্প্রদায়িক এই বর্বরতা অন্যান্য প্রদেশের মত মহারাষ্ট্রেও দাবানলের মত বিস্তার লাভ করিল। বিবিধ সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠায় গৃহদাহ, ধর্মমন্দির কলুষিত, নিষ্ঠুর নরহত্যা, হিন্দুনারী-হরণের সংবাদে বিনায়ক সাভারকরের শোণিত ধারা উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। ভবিতব্য বিপদের আশঙ্কায় সহাধ্যায়ী ও বন্ধুদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া বিনায়ক সাভারকরও আত্মরক্ষায় প্রস্তুত হইলেন। একদিন গ্রাম্য বিদ্যালয়ে সামান্য বচসা হইতেই মুসলমান ছাত্রগণ হিন্দুছাত্রদিগকে আক্রমণ করিল। অতর্কিতে আক্রান্ত হিন্দুছাত্রগণ দিশেহারা হইয়া পড়িল। কেহ কেহ নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মুসলমান ছাত্রগণ সম্ভবত পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। বিনায়ক সাভারকর ধীরভাবে সমস্তই লক্ষ্য করিলেন এবং আক্রমণকারীর সম্মুখীন হইয়া অসীম সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধি বলে আক্রমণকারীকে পরাভূত করিয়া সমুচিত শিক্ষা দিলেন। আত্মগোপনকারী বন্ধুদিগকে কাপুরুষতার জন্য তিরস্কার ও ধিক্কার করিয়া সকলকে সংঘবদ্ধ নিয়মানুবর্তী এবং সৎসাহসী হইতে আহ্বান করিলেন। বাল্য জীবনের অনুরূপ অনেকঘটনাবলী হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে নেতৃত্বে এবং বাগ্মীতায় সহজাত প্রতিভা লইয়াই বিনায়ক সাভারকর ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

'রুদ্ররূপে তীব্র দুঃখ যদি নেমে আসে
উর্দ্ধে বাহু বাড়াস্
ঝড় ঝঞ্ঝায় যদি অশনি খসে পড়ে
মাথা তুলে দাঁড়াস।'

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে পুণায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন, শিবাজী ও গণপতি উৎসব মারাঠা জাতির মধ্যে এক নব চেতনা এবং অভূতপূর্ব প্রেরণা আনিয়া দিল। মুক্তি প্রয়াসে জাতীয় জীবন যখন চঞ্চল হইয়া উঠিল তখন প্লেগব্যাধি ভয়াল ভয়ংকর মৃত্যু-দূতরূপে পুণার প্রতি গৃহে হানা দিল। প্রাণ সংহারক এই কালব্যাধি প্রত্যহ অগণিত নরনারীকে মহাকালের

করালদন্তে নিষ্পেষিত করিয়া কর্ম্মমুখর মুক্তি চঞ্চল জনপদ জনশূন্য করিতে লাগিল। প্রতি গৃহে পিতৃ মাতৃহীন সন্তানের. ক্রন্দন, স্বামীহীনার বিলাপ ধ্বনি, সন্তানহীন মাতাপিতার আর্তনাদ মহারাষ্ট্রের একপ্রান্ত হইতে বাংলার অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মানব আত্মাকে বিচলিত করিয়া তুলিল। মহারাষ্ট্রের এই ঘোর দুর্দিনে মহামানব স্বামী বিবেকানন্দ গুরু ভ্রাতাদিগকে সঙ্গে করিয়া রোগাতুর মানব আত্মার সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। ভারতের নব জাগরণের ইতিহাসে ইহাই আর্তত্রাণের **সংঘবদ্ধ প্রথম প্রচেষ্টা**।

এই নিদারুণ কালব্যাধিতে যে জীবন্তের রাজ্য হইতে মৃতের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিত সে বরং নিষ্কৃতি পাইত, কারণ মৃতের পরিজন বর্গের দুর্গতি ছিল অবর্ণনীয়। মহামারী নিবারণ কল্পে যেই সব শ্বেতকায় সৈনিক নিযুক্ত হইয়াছিল রোগী অপেক্ষা নারী ছিল তাহাদের অধিক আকর্ষণীয়। রোগাক্রান্ত গৃহ বীজানুমুক্ত করিবার জন্য গৃহের যাবতীয় আসবাবপত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া গৃহবাসীকে বিতাড়িত করিত। সুতরাং বৃক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণ করা ভিন্ন তাহাদের অন্য উপায় থাকিত না। তখন মহারাণী ভিক্টোরীয়ার হীরকজয়ন্তী উৎসব সময়। সরকারী মহল হইতে এই উৎসব সাফল্য মণ্ডিত করিবার জন্য সর্বপ্রকারে আয়োজন চলিতে লাগিল। পক্ষান্তরে প্লেগ-নিবারণের নামে ইংরাজ সৈনিকের বর্বর অত্যাচারে উৎপীড়িত নবজাগ্রত উদীয়মান তরুণ সম্প্রদায় এই উৎসব পণ্ড করিবার জন্য সঙ্গোপনে সচেষ্ট হইল। সৈনিকের হীন আচরণের বিরুদ্ধে আবেদন নিবেদন প্রতিবাদ করিয়া যখন বিফল হইল তখন প্লেগ কমিশনার মিঃ র‍্যাণ্ড্ (Mr. Rand the plague commissioner) আগ্নেয় অস্ত্রে নিহত হইলেন ২২শে জুন ১৮৯৭। ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে এই গুপ্ত হত্যা এক অভিনব ব্যাপার। কংগ্রেস পন্থীগণ বিস্মিত ও বিচলিত হইলেন। শাসকগণ ইহাকে সংঘবদ্ধ সুপরিকল্পনারূপে স্থির করিয়া কঠোর হস্তে দমন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। রাণাডে এবং চাপেকর ভ্রাতাদ্বয় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। সন্দেহক্রমে লোকমান্য তিলক কারাগারে অবরুদ্ধ হইলেন। অনেকে এই গুপ্ত হত্যার জন্য গালিবর্ষণ করিয়া ঘৃণাসূচক মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, কিন্তু আর এক শ্রেণী অনুরূপ হত্যাকার্য পবিত্র কর্তব্য বলিয়া সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন। বলাবাহুল্য মাত্র যে, বিনায়ক দামোদর সাভারকর ইহাদের অন্যতম।

রাণাডে এবং চাপেকার ভ্রাতাদের কায্যকলাপে বিনায়ক সাভারকর ভারতে ব্রিটীশ প্রভুত্ব বিলুপ্ত করিবার এক নূতন পথের সন্ধান পাইলেন। পরাধীন ব্যক্তির ভোগবিলাসে কালাতিপাত করা মানব জীবনের কলঙ্ক, চাপেকার ভ্রাতাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের অসমাপ্ত জীবনব্রত উদ্‌যাপন করিবার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে মনে মনে এইরূপে স্থির করিয়া একদিন গৃহের আরাধ্যা দেবী অষ্টভূজার সম্মুখে উপবেশন করিয়া সজল নয়নে কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করিলেন,—'মা আশীর্বাদ কর, জাতির মুক্তি চেষ্টায় প্রয়োজন হইলে জীবন বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত না হই। প্রার্থনা কালে সহসা তাঁহার মনে হইল বিশ্বমাতা বিবিধ অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিতা, অস্ত্রের দ্বারাই শত্রুকে পদদলিত করিয়া রাখিয়াছেন; সুতরাং শক্তি সঞ্চয় ও অস্ত্রবিদ্যা আয়ত্ত করিবার দৃঢ় সংকল্প লইয়া—তিনি মন্দির পরিত্যাগ করিলেন।

পরবর্তী কালে বিশ্ববিশ্রুত বিপ্লবীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন, ফ্রান্স্ ও রাশিয়া হইতে তরুণ বন্ধুদিগকে বিস্ফোরক পদার্থ প্রণয়ন কৌশল এবং গুপ্ত উদ্দেশ্যে তার প্রয়োগ পদ্ধতি শিক্ষা দিয়া সাম্রাজ্যবাদীদের ত্রাসের সঞ্চার করা, ক্রুর-ক্রুদ্ধ ইংরাজ সৈনিকের ফরাসী উপকূলে আন্তর্জাতিক আইনের মর্যাদা তাচ্ছিল্য করিয়া পরাধীন ভারতের এই তরুণ বিপ্লবীর বিরুদ্ধে নিন্দনীয় অভিযান ও গ্রেপ্তার সমস্তই ভাগুর গৃহমন্দিরে প্রতিজ্ঞা গ্রহণের চরম পরিণতি।

প্লেগরূপী মৃত্যুদূত নগর অতিক্রম করিয়া পল্লীবাসীর গৃহদ্বারে আঘাত হানিল। সেই নির্মম নিষ্ঠুর আঘাতে কত শত গৃহ ধ্বংস স্তূপে পরিণত হইল। দামোদর পন্থ সাভারকরও এই আঘাতে মহাকালের কবলিত হইলেন এবং নারায়ণ সাভারকরও আক্রান্ত হইলেন। একান্ত অসহায় ভাবেই পরিবারস্থ অন্যান্য সকলে গ্রাম প্রান্তে এক জীর্ণ মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। এই ঘোর দুর্দিনে গণেশ দামোদর সাভারকর নাসিকস্থ জনৈক বন্ধুর আহ্বানে কষ্টিপাথরের বুকে ক্ষীণ রেখা সম আশার আলো দেখিতে পাইলেন।

(দুই)

'ঘটনার স্রোত যেন না ফিরায় তব ভাগের গতি,
ঘটনাবলীর অধিরাজ তুমি, তুমি ভাগ্যের পতি'।

—০—

গণেশ দামোদর সাভারকর নাসিকে আসিয়া বন্ধুর আশ্রয় লইলেন।

রোগাক্রান্ত নারায়ণকে প্লেগ হাসপাতালে ভর্তি করিয়া গণেশ দামোদর সাভারকর রোগীর শুশ্রূষার জন্য হাসপাতালে রহিলেন। বিনায়ক সাভারকরকে প্রত্যহ খাদ্য ও বস্ত্রাদি লইয়া তথায় যাইতে হইত। বাসস্থান হইতে হাসপাতালের দূরত্বও ছিল অনেক এবং নাসিক নগরীও রোগমুক্ত ছিল না। এই সংক্রামক ব্যাধির ভয়ে ধনী সম্প্রদায় নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিল। যাহারা তাহা পারিল না একে একে একলা যাওয়ার পথে যাইতে বাধ্য হইল। একদিন যথারীতি বিনায়ক খাদ্য ও বস্ত্রাদি লইয়া হাসপাতালে যাইতে ছিলেন। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। ঘনঘোর অন্ধকারে গগনতল অবলুপ্ত। মৃত্যুপথ যাত্রীর অন্তিম—শ্বাস, প্রিয়জনের রোদন ধ্বনি, শ্মশানের ধুমায়িত অগ্নিশিখা নৈশ অন্ধকার ভীষণতর করিয়াছে, বায়ুভরে কম্পিত শুষ্ক পত্রের মর্মর ধ্বনি পিশাচের পদক্ষেপে পথ অতিক্রম করিতেছেন এমন সময় সন্নিকটে শববাহকের কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, 'রাম বল ভাই রাম বল।' দ্রুতগামী যুবকের মন অজ্ঞাত আশংকায় কাঁপিয়া উঠিল। হাসপাতালে আসিয়া জানিতে পারিলেন যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্লেগ আক্রান্ত হইয়াছেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণের অবস্থাও মরণাপন্ন। চিকিৎসকগণ দুইবার তাঁহার জীবনের আশা ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন। এই নিদারুণ সংবাদে বিনায়ক সাভারকর বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।

গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া নির্জন কক্ষে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন। কনিষ্ঠ দেবরের অন্তিম অবস্থায় এবং স্বামীরোগাক্রান্ত হইবার সংবাদে মনোবেদনা গভীর নিঃশ্বাসে ব্যক্ত

করিয়া সাভারকর কুললক্ষ্মী বিনায়ক-কে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, বিপদে ধৈর্যহীন হইও না, এইসব জগতের নিয়ম, জগতে বাস করিতে হইলে এইসব সহ্য করিতেই হইবে। এই মহীয়সী মহিলার চারিত্রিক দৃঢ়তা, অদম্য মনোবল এবং সৎসাহস ভাবি বিপ্লবী বিনায়ক সাভারকরের হৃদয়ে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

এই বিশ্ব এক বৃহৎ পরীক্ষাক্ষেত্র, বিপদরূপ কষ্টি পাথরে জগদীশ্বর আমাদিগকে পরীক্ষা করেন। প্রকৃত বন্ধুর মতই গণেশ দামোদর সাভারকরের বন্ধু শ্রীযুক্ত দাতার তাঁহাদিগকে সর্বপ্রকারে সহায়তা করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ সাভারকর ভ্রাতাদ্বয় আরোগ্য লাভ করিলেন। বিদ্যাশিক্ষার পক্ষে নাসিকই উপযুক্ত স্থান স্থির করিয়া স্থায়ীভাবে তথায় বসতি স্থাপন করিলেন। এইরূপ ঘাত প্রতিঘাতেই কবি কণ্ঠে ধ্বণিত হয়

'শক্তি যদি নাহি থাকে প্রভু
জুড়ায়ে দিতে ক্ষত,
কেমন করে বুঝব তোমায়
মহান তুমি কত।'

এই কর্ম-মুখর জগতে কর্ম-বিমুখের স্থান কোথাও নাই। সহস্র বিপর্যয়ে, চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র রাজি বিরুদ্ধবাদী হইলেও এবং নির্মম নিয়তির নিষ্ঠুরতায় কর্মবীর তাহার কর্মপথ ভ্রষ্ট হন না। কর্মমুখরতাই জগতের প্রাণ শক্তি। বিনায়ক সাভারকর এই শক্তিতেই শক্তিমান, তাই তো শংকাহীন চিত্তে অবিশ্রান্তগতিতে স্থির সংকল্পে ছুটিয়া চলিয়াছেন লক্ষ্যস্থলে; ভ্রাতৃদ্বয় মৃত্যু পথযাত্রী, যে কোন মুহূর্তে তিনিও তাঁহাদের অনুগমন করিতে পারিতেন। এইরূপ পরিস্থিতির মধ্যেও জীবন ব্রত ধ্রুব ও অটল রাখিয়া স্বীয় কর্ম ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইলেন। নাসিকের তরুণদলও তাঁহাকে সাদরে নেতৃপদে বরণ করিয়া লইলেন। সুরভি কুসুম যেখানেই প্রস্ফুটিত হয় মধুকর তাহাতে আকৃষ্ট হইবেই।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী বিনায়ক সাভারকর **মিত্র মেলা** স্থাপন করিলেন। তখন তাহার বয়স মাত্র ১৭ বৎসর। বয়সে বা নামে কি আসে যায়। কায্যদক্ষতাই সার্থকতা বহন করে। মিত্র মেলার কায্যপদ্ধতি প্রধাণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রকাশ্য বিভাগ ও গুপ্ত বিভাগ। প্রকাশ্য বিভাগের কায্য ছিল জনসেবা, সমাজ সংস্কার ও জনমত গঠন করা এবং গুপ্ত বিভাগের কায্য ছিল জনসাধারণের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। পরবর্তী কালে বিচারালয়ে মিত্র মেলার কর্মীদের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযোগ, বিবিধ সাক্ষ্য গ্রহণাদি এবং বিচারকের মন্তব্যে ইহাই প্রকাশিত হয় যে, গুপ্ত বিভাগের উদ্দেশ্য ছিল অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ করিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়া। অংকুরেই মিত্র মেলা বিনষ্ট করিতে এবং কর্মীদের প্রতি সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে গোয়েন্দা বিভাগের প্রতি কড়া আদেশ ছিল। কিন্তু গোয়েন্দাদের সর্বপ্রকার সতর্কতা ব্যর্থ করিয়া মিত্র মেলার কায্য পূর্ণ উদ্যমেই চলিতেছিল। তৎকালে মিত্র মেলাই ছিল নাসিকে জনমতের অভিব্যক্তি। সাপ্তাহিক জনসভা, পুস্তিকা ও প্রচারপত্র বিতরণ, সর্বোপরি বিনায়ক সাভারকরের তেজোদৃপ্ত ভাষণ এবং শিবাজী ও গণপতি উৎসব দেশময়

নবউদ্দীপনা সঞ্চার করিল। বিনায়ক সাভারকরের উদাত্ত আহ্বান মারাঠার প্রতি গিরিকন্দরে প্রতিগৃহে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, আমরা দেশ বিদেশের বীরপুরুষদের জীবনী আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হইব না তাঁহাদের আদর্শ কায্যত গ্রহণ করিয়া আমাদেরও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিব।'

'নায়ম্ আত্মা বলহীনেন লভ্য
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত।'

বর্তমানে বাল্য বিবাহ আইন বিরুদ্ধ। এক সময় বাল্য বিবাহই ছিল প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা। আমাদের জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত, যাঁহারা জাতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির ধারক বাহক এবং পরিপূরক যাহাঁরা, তাঁহারা হয় অনধিক বয়সে বিবাহ করিয়াছেন অথবা ব্রহ্মচর্য্যের মহাবীর্যকে অবলম্বন করিয়াই জগতের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। ইহাও অতিশয় সত্য যে বাল্য বিবাহে যথোপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন না করিলে তারও ভয়ানক অপকারিতা আছে। তৎকালীন প্রথা অনুসারে বিনায়ক সাভারকর ১৯০১ সালে মার্চ মাসে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইলেন এবং ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

পরীক্ষার পর অধিকাংশ সময় মিত্রমেলার কাজে অতিবাহিত করিতেন। মিত্রমেলার সদস্যগণ সকলেই ছাত্র ছিলেন। নায়ক বিনায়ক সাভারকর তাহাদিগকে নিয়মিত রূপে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন এবং গৃহে পাঠ সমাপনের উৎসাহ দিতেন এবং নিজেও এই নীতি মানিয়া চলিতেন বলিয়া কখনো কোন পরীক্ষায় বিফল হন নাই। তাঁহার অবর্তমানে যাহাতে মিত্র মেলার কাজ অব্যাহত থাকে সেই বিষয় কর্ম্মীদিগকে সচেতন করিয়া স্বয়ং ফার্গুসান কলেজে ভর্তি হইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন।

পুণায় যাত্রা করিবার দিনকয়েক পূর্বে সাভারকর সম্বর্দ্ধনা সভা আহূত হইল। বলা বাহুল্য মাত্র যে সেই সভায় নবীন-প্রবীণের বিপুল সমাবেশ হইয়াছিল। উক্ত জনসভায় বিনায়ক সাভারকর বলিলেন যে, এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের কায্যকলাপ নাসিকেই সীমাবদ্ধ আছে। পুণায় ফার্গুসান কলেজে ভর্তি হওয়ার দরুণ যেই সুযোগ ঘটিবে তাহাতে তাহাদের আদর্শ ও কায্যকলাপ মহারাষ্ট্রের নানা স্থান হইতে ছাত্রগণ তথায় আসেন এবং ভবিষ্যতে তাহারাই জনগণের চিন্তা ধারা পরিচালন করিবেন। সুতরাং তাহাদিগকে স্বমতে আনিতে পারিলে তাহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্থানে ফিরিয়া যাইয়া এই মহান ব্রতের প্রকৃত সমর্থক ও প্রচারক হইবেন। এইরূপে অল্প সময়ের মধ্যেই মিত্র মেলার কাজ সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে। অন্তত এই আশা ও উদ্যম লইয়াই তিনি কলেজে ভর্তি হইবেন।

(তিন)

'আমি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছি, ভারতের মুক্তি নির্ভর করিতেছে একদল যুবকের উপর যাহারা নির্ভীক, বলিষ্ঠ, হৃদয়বান ও চরিত্রবান—যাহাদের মাংসপেশী সমূহ বজ্রদৃঢ়, স্নায়ু ইস্পাত নির্ম্মিত বক্ষস্থল লৌহদৃঢ়, মন মুক্ত পবনের মত ও নির্ম্মল; যাহারা বজ্রের মত

সংহার মূর্ত্তিতে ফাটিয়া পড়িতে পারে চূড়মার করিতে পারে সসাগরা ধরণী, সুমেরু হইতে কুমেরু পর্য্যন্ত।'

—স্বামী বিবেকানন্দ

বিনায়ক সাভারকর কলেজে প্রবেশ করিবার অনতিকাল মধ্যেই ছাত্র মহলে বিশেষ পরিচিত এবং শীর্ষস্থানীয় হইয়া উঠিলেন। তৎকালে ছাত্রগণ গতানুগতিক ভাবেই বিদ্যালয়ে যাতায়াত করিত। চা-এর আসর ক্রীড়া কৌতুক বড় জোর চাঁদার খাতা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিত। কিন্তু সাভারকর আসিয়া এক নূতন আলোক শিখা তাহাদের সামনে তুলিয়া ধরিলেন। লুথার, নকস, ম্যাৎসিনী, মার্কস, সক্রেটিস্ প্রভৃতি চিন্তা নায়কেরা তাঁহাদের যুগে যেমন মানবের চিন্তাধারা পরিচালন করিয়াছিলেন বিনায়ক সাভারকরও তেমন তাঁহার সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, নির্ভীকতা, স্থায়ীকায্যকরী ক্ষমতা, অনতিক্রম্য অভিপ্রায়, অতুলনীয় দেশপ্রেম এবং নির্মল চরিত্র মাধুর্য্যে সমকালীন ছাত্র সমাজ নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ক্রমশঃ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে রাজনীতি চর্চাই প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠিল। অধ্যাপক মণ্ডলী ছাত্র সম্প্রদায়ের এই আকস্মিক পরিবর্তন বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলেন। তাঁহাদে মধ্যে কেহ কেহ এইরূপ মন্তব্যও করিলেন যে, বিনায়ক সাভারকর কালে একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হইবেন।

উক্ত কলেজের অনতিদূরে পর্বত গহ্বরে এক প্রাচীন শিব মন্দির ছিল। প্রতি রবিবারে তথায় বিনায়ক সাভারকর বন্ধুগণ পরিবৃত হইয়া ভারতে ইংরাজ শাসনের অবসান কল্পে নানারূপ আলাপ আলোচনা করিতেন। কিরূপে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রাম করিবেন ইহাই ছিল তাঁহাদের গুপ্ত মন্ত্রণা। বিভিন্ন দেশের রাজনীতি এবং বৈপ্লবিক আন্দোলন সম্বন্ধে বিনায়ক সাভারকর ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিতেন। ঘন্টার পর ঘন্টা দৃপ্ত কণ্ঠে প্রাণবন্ত ভাষায় যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করিতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। পরবর্তী কালে দেখিতে পাওয়া যায়, বিচারালয়ে গোয়েন্দা বিভাগীয় পুলিশ বিনায়ক সাভারকরের এই সময়ের কায্যাবলীর বিবরণীতে উল্লেখ করিয়াছিল যে, বাইশ বৎসর বয়সেই তিনি পৃথিবীর যে কোন শ্রেষ্ঠ বক্তার সমতুল্য ছিলেন। উক্ত শিব মন্দিরে বিনায়ক সাভারকর সহপাঠী সুহৃদগণের সহিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, ভারতমাতার মুক্তির জন্য মৃত্যু বরণ করিতে ভীত হইবেন না। নিয়মিত ব্যায়াম, স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ, বিলাতী দ্রব্য ও বিলাসিতা বর্জন, তাঁহাদের অন্যতম প্রতিজ্ঞা ছিল। তাঁহারা সকলে একই প্রকার পোষাক পরিধান করিতেন, সরল জীবন যাত্রায় স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করিয়াও কেহ কোন প্রকার সন্দেহ করিতে পারিতেন না, অধিকন্তু তাঁহাদের বিশেষতঃ বিনায়কের বিনয়নম্র শান্ত মধুর ব্যবহারে তাঁহারা সকলেরই প্রিয় ছিলেন। বলাবাহুল্য মাত্র যে, গান্ধীজী তখনও ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেন নাই। ক্রমশঃ বিনায়ক সাভারকরের খ্যাতি কলেজের সীমারেখা অতিক্রম করিয়া পুণার সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এই সময় তিনি লোকমান্য তিলক এবং সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক শিবরাম মহাদেও পারঞ্জপের সংস্রবে আসিলেন।

লোকমান্য তিলকের বিরাট ব্যক্তিত্ব, গভীর পাণ্ডিত্য, অসামান্য রাজনৈতিক প্রতিভা, সর্বভারতীয় নেতৃত্ব এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা, ইংরাজ শাসকের ভয়ের কারণ ছিল। ১৯১৮ সালে ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লয়েড্ জর্জ বলিয়াছিলেন, 'I fear only one man in India he is Mr. Ttilak.' 'আমি ভারতে একজন মানুষকেই ভয় করি তিনি হইলেন তিলক'।

শিবরাম মহাদেও পারঞ্জপ **'কাল'** নামক পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। অন্যান্য সাংবাদিকগণ স্বায়ত্তশাসন দাবী করিতেও যখন ভীত ছিলেন তখনও তিনি বহু ক্লেশ ও নির্যাতন সহ্য করিয়া স্বাধীনতার দাবী প্রচার করিতেন। তখনকার দিনে 'কাল' পত্রিকা প্রচারে ও প্রভাবে শীর্ষ স্থানীয় ছিল। বিনায়ক সাভারকর উক্ত পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। তাঁহার বিবিধ প্রবন্ধ কবিতা ও গান ছিল পাঠকবর্গের অতিশয় প্রিয়। গানগুলি এতই জনপ্রিয় ছিল যে পথের ভিক্ষুক, মাঠের কৃষক, বিদ্যালয়ের ছাত্র, কুলবধূ সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যাইত। এতদ্ভিন্ন বিনায়ক সাভারকর কলেজ ক্লাব হইতে হস্ত লিখিত একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকাও সম্পাদন করিতেন। উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার মৌলিক রচনাদি পুণার বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। এই সময়ে তাঁহার রচিত **'তানোজি'** এবং **'বাজিপ্রভু'** নামক কাব্য দুইখানি মারাঠা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। দেশহিতব্রতী বিনায়ক সাভারকরের কায্যকলাপ হয়ত দেশবাসী ভুলিয়া যাইতে পারে, মুক্তি সংগ্রামে তাঁহার ত্যাগ নিষ্ঠা ও নির্যাতন সহনশীলতা কাহারো স্মরণ না থাকিতে পারে, বিনায়ক সাভারকরের ব্যাপার লইয়া আন্তর্জাতিক আইনের সংবিধানে যে নূতন নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে, আন্তর্জাতিক আইনবিদ্গণ কালক্রমে তাহাও হয়ত ছিড়িয়া ফেলিতে পারেন, কিন্তু তিনি অমরতা লাভ করিবেন তাঁহার সাহিত্য প্রতিভার জন্য।

'থাকে না লৌহের বেড়া মর্মর গাঁথন
কালের অজেয় শুধু কালীর বাঁধন।'

তাঁহার রচিত ১৮৫৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, (Indian war of Independence of 1857) "হিন্দুত্ব", "হিন্দুবাদ বাদশাহী" প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহাকে করিয়া রাখিবে, মৃত্যুহীন। কবি ও সাহিত্যিক রূপেই তিনি কীর্তিমান নহেন; ভাষা ও অক্ষর সংস্কারের জন্যও তিনি অক্ষয় কীর্তিলাভ করিয়াছেন। প্রচীন নাগরী বর্ণমালা মারাঠা ভাষায় প্রচলিত ছিল। আধুনিক মুদ্রণ কার্যে তাহা বিশেষ অসুবিধাজনক ছিল, এবং শিক্ষার্থীদের পক্ষেও তাহা আয়ত্ত করা সময়সাপেক্ষ ছিল। ভাষার কোন প্রকার মর্যাদাহানী না করিয়া বিনায়ক সাভারকর বিশেষ নিপুণতার সহিত বর্ণমালা সংস্কার করিয়াছেন। তাঁহার সেই সংশোধিত বর্ণমালাই মহারাষ্ট্রবাসী লিখন পঠনে ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং "কেশরী", "নবপ্রকাশ" প্রভৃতি সংবাদপত্র ঐ লিপিই ব্যবহার করে। পূর্বে মারাঠা সাহিত্যিকগণ আরবী, হিন্দি, ইংরাজী প্রভৃতি শব্দও ব্যবহার করিতেন। বিনায়ক সাভারকর ভাষাশুদ্ধি আন্দোলনের দ্বারা বিশুদ্ধ মারাঠা প্রচলন করিতেও সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার গুণমুগ্ধ স্বদেশীয়গণ উত্তরকালে

তাঁহাকে মারাঠা সাহিত্য অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচন করিয়া নিজেরাই কৃতার্থ হইয়াছেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলনে বিনায়ক সাভারকর সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের গ্রীষ্মকালিন অবকাশে সুদূর পল্লী অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিয়া জনসভায় বক্তৃতা দ্বারা জনগণকে বিদেশী দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করিতে লাগিলেন। কবি সাহিত্যিক এবং বক্তারূপে পূর্বেই তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং তাঁহাকে দেখিবার জন্যও দলে দলে আবালবৃদ্ধ নরনারী সভায় যোগদান করিত। ইংরাজরা বাণিজ্য করিতে আসিয়া কিরূপে ভারত সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছে, ভারতের ধনসম্পদ শোষণ করিয়া ভারতবাসীকে পদানত করিয়া রাখিয়াছে, বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার করিয়া কিরূপে ভারতবাসী বিদেশীর হাতে টাকা তুলিয়া দিতেছে তাহা পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহার এই প্রাণময় ভাষণে দেশময় এক অভূতপূর্ব সাড়া পড়িয়া গেল। মানুষ যখন হইতে লজ্জা নিবারণ করিতে শিখিয়াছে তখনই সভ্যতার প্রথম সোপানে পদক্ষেপ করিয়াছে। সভ্যতার প্রথম প্রভাতকালে বস্ত্রশিল্পে ভারতবাসী ছিল শীর্ষস্থানীয়।

'বাংলার মস্‌লীন বোগদাদ রোম চীন
কাঞ্চন তৌলেই কিনতেন একদিন।'

কিন্তু ইংরাজেরা রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে এই শিল্প সম্পদ বিনষ্ট করিয়া ভারতবাসীকে তাঁহাদেরই মুখাপেক্ষী করিয়া রাখিয়াছে লজ্জা নিবারণের জন্য, এই চিন্তাই বিনায়ক সাভারকরকে বিশেষভাবে ব্যথিত করিয়া তুলিত। সুতরাং ভারত হইতে বিদেশী বস্ত্র নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য তিনি বদ্ধ পরিকর হইলেন। ১৯০৫ সালে অক্টোবর মাসে পুণায় এক বিরাট জনসভায় তিনি বিদেশী বস্ত্র বর্জন করিবার জন্য জ্বালাময়ী ভাষায় হৃদয়গ্রাহী আহ্বান জানাইলেন। বক্তার প্রতিটি শব্দ শ্রোতার হৃদয়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত প্রবেশ করিয়া দাসজাতি সুলভ বিদেশী মোহ ভস্মীভূত করিল। এই দিনের বক্তৃতা এতই মর্মস্পর্শী হইয়াছিল যে, বক্তা, শ্রোতা ও বক্তব্য বিষয় যেন এক হইয়া গিয়াছিল। সদ্য মোহ মুক্ত জনগণ সোৎসাহে বিলাতী পোষাক পরিচ্ছদ্ পরিত্যাগ করিয়া ঘৃণা ভরে ভূমিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে তাহা এক বিশাল স্তূপে পরিণত হইল। এইরূপে স্বেচ্ছায় পরিত্যক্ত দ্রব্য সম্ভার শোভাযাত্রা সহকারে নগরের অপর প্রান্তে মুক্ত প্রাঙ্গনে নীত হইল। বলা বাহুল্য মাত্র, যে এই শোভা যাত্রায় অগণিত নরনারী যোগদান করিয়াছিল। লোকমান্য তিলক তখন কারামুক্ত। তিনিও এইরূপ প্রত্যক্ষ সংগ্রামে প্রবল আপত্তি জানাইলেন। কিন্তু বিনায়ক সাভারকরের দৃঢ়তায় এবং জনমতের চাপে লোকমান্য মত পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন এবং এই বহ্নি উৎসবে অংশ গ্রহণ করিলেন। এই স্থানেও বিনায়ক সাভারকর বজ্র নির্ঘোষ কণ্ঠে জনতাকে পুনরায় আহ্বান করিলেন—আজিকার এই উদ্দীপনা যেন মুহূর্তের ভাবাবেগে পরিণত না হয়, সর্বদা সর্ব অবস্থায় স্বদেশী দ্রব্যই গ্রহণ করিব এই দৃঢ় সংকল্প যেন হৃদয়ে গাঁথা থাকে। লোকমান্যও মনোজ্ঞ বক্তৃতা করিলেন। পারঞ্জপে স্তূপীকৃত বস্ত্ররাশি হইতে একটি কোট তুলিয়া লইয়া সকলকে বুঝাইয়া দিলেন বাণিজ্যের দ্বারা ইংরাজ জাতি কি প্রকারে আমাদিগকে আরাম প্রিয়, বিলাসী ও পদানত করিয়া রাখিয়াছে। অতঃপর তুমুল

হর্ষধ্বনি সহকারে বস্ত্র স্তূপে অগ্নি প্রদান করা হইল, তৎক্ষণাৎ উচ্ছ্বসিত জনকণ্ঠে মুহুর্মুহুঃ বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিক্‌মণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া তুলিল। নিমেষে লেলিহান অনলশিখা গগনতল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তখনো পর্যন্ত যাহারা বিদেশী বসন-ভূষণের মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই, তাহাদিগকে বিশেষতঃ ছাত্রগণকে লক্ষ্য করিয়া বিনায়ক সাভারকর পুনরায় আহ্বান জানাইলেন। অমনি যজ্ঞে আহুতি দানের মত চারিদিক্ হইতে ন্যাক্‌টাই, হ্যাট্ কোট নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

'সুপ্তের রাজ্যে দৈবের সাড়া
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া।।'

বিবিধ সংবাদপত্রে ফলাও করিয়া এই বহ্নিউৎসব সংবাদ পরিবেশিত হইল। ইংরাজ পরিচালিত পত্রিকাগুলি বিনায়ক সাভারকরের এই ঔদ্ধত্যের জন্য কঠোর দণ্ড বিধানের দাবী জ্ঞাপন করিল। ফার্গুসান কলেজের অধ্যাপক ও পরিচালক মণ্ডলী ইহাতে বিশেষ বিচলিত ও শংকিত হইয়া উঠিলেন। রাজরোষের ভয়ে তাঁহারা পূর্বেই সতর্কতা অবলম্বন করিলেন। চব্বিশ ঘন্টার বিজ্ঞপ্তি (Notice) দিয়া বিদেশী বস্ত্র বহ্ন্যুৎসবের প্রথম ভারতীয় ছাত্রকে ছাত্রাবাস হইতে বহিষ্কার করিলেন এবং দশ টাকা অর্থ-দণ্ড করিয়া বিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত করিলেন।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই আচরণে জনমত বিশেষভাবে বিক্ষুব্ধ হইল। ভারতের নানা স্থানে প্রতিবাদ সভায় দণ্ডিত অর্থ সংগৃহীত হইতে লাগিল। নাসিকবাসী অনুরূপ বহ্ন্যুৎসব এবং অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহাদের উদীয়মান প্রিয় নেতাকে অভিনন্দিত এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের রক্তচক্ষুর বিরুদ্ধে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করিল। বলাবাহুল্য মাত্র যে এইরূপে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ হইল এবং বিনায়ক সাভারকরও তাহা জনকল্যাণে ব্যয় করিলেন। ফার্গুসান কলেজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তিরষ্কৃত হইয়াও দেশবাসীর দ্বারা সাদরে সম্বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

১৯৪৪ সালে সাভারকরের ৬১ তম জন্ম জয়ন্তীতে বোম্বাইনগরে জন সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন ফার্গুসান কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ এবং অষ্ট্রেলীয়ায় ভারতের তৎকালিন রাষ্ট্রদূত স্যার আর, পি, পারঞ্জপে। স্যার পারঞ্জপে সভাপতির ভাষণে বিনায়ক সাভারকরের অকুণ্ঠ ত্যাগ, অকৃত্রিম দেশ সেবা, অশেষ নির্যাতন ভোগ, বহুমুখী প্রতিভা এবং বহ্নি-উৎসবের ঘটনা ও পরিস্থিতি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, ছাত্র শিক্ষকের এই দ্বন্দ্বে তিনি অন্তরে ছাত্রের প্রতি কোন প্রকার বিদ্বেষ পোষণ করিতেন না। উক্ত স্মরণীয় সভায় সভাপতিত্ব করিতে পারিয়া গৌরব বোধ করেন। এই বৎসর অর্থাৎ ১৯০৫ সালের প্রথম ভাগে বিনায়ক সাভারকরের পুত্র **প্রভাকর** জন্ম গ্রহণ করে।

অবশেষে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় বিনায়ক সাভারকরকে বি, এ, পরীক্ষা প্রদানের অনুমতি দিয়া দেশবাসীর প্রশংসা ভাজন হইলেন। (এই বিপত্তিতেও তিনি বিন্দুমাত্র ভীত বা বিচলিত না হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে জীবন সাধনায় লিপ্ত রহিলেন) যথাকালে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণও হইলেন ১৯০৫, ২১শে ডিসেম্বর। পরীক্ষায় এই সফলতার জন্য যাঁহারা তাঁহাকে স্বদেশী

'ভেগাবণ্ড্' বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন তাঁহারাও তাঁহাকে কেহ প্রকাশ্যে, কেহ বা অন্তরে অন্তরে শ্রদ্ধা করিতেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত অধ্যয়ন হইতে অবকাশ পাইয়া বিনায়ক সাভারকর তাঁহার আরব্ধ কার্যের প্রসারতা এবং পরিপূর্ণতার জন্য সম্পূর্ণরূপে আত্ম নিয়োগ করিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন গুপ্ত কেন্দ্রগুলি এ পর্যন্ত তিনি বিশেষ সতর্কতা ও নিপুণতার সঙ্গে পরস্পরের পরিচয় ও যোগাযোগ হইতে পৃথক রাখিয়াছিলেন। এইসব গুপ্ত কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদিগকে একত্রিত করিয়া এক গুপ্ত বৈঠকে তাঁহাদের কায্যক্রম আলোচনা করিলেন। বিনায়ক সাভারকরের বিপ্লব জীবনে বিশেষ গুরুত্ব ও দায়িত্বপূর্ণ এই গোপন বৈঠকে ২০০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। মাতৃভূমির মুক্তি সংগ্রামে প্রস্তুতির জন্য নায়ক বিনায়ক সাভারকর আহ্বান জানাইলেন এবং তাঁহাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও প্রচার করিবার জন্য এক বলিষ্ঠ পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য **'অভিনব ভারত'** নামে এক নূতন সংঘও গঠন করেন। ইহার পর বিনায়ক সাভারকর দেশময় ভ্রমণ করিয়া তাঁহার স্বভাব সুলভ জ্বালাময়ী ভাষণে জনগণকে স্বাদেশিকতায় উদ্‌বুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তদুপরি চারণ কবি গোবিন্দ বৈপ্লবিক গান গাহিয়া জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ—উদ্দীপনা ও ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব জাগাইয়া তুলিতে লাগিলেন। পরবর্তীকালে পুলিশ বিবরণীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উক্ত চারণ কবি বিনায়ক সাভারকরের একজন সমর্থক এবং 'অভিনব ভারত'-এ র সদস্য ও প্রচারক ছিলেন। এই সময় বিনায়ক সাভারকর আরও কয়েকখানি দেশাত্মবোধক পুস্তক ও বহু স্বদেশী গান রচনা করেন। তাঁহার জ্বালাময়ী বক্তৃতা বিদ্রোহ সূচক গান, এবং চারণ কবি গোবিন্দের জাগরণী সঙ্গীত মহারাষ্ট্রে গণবিপ্লবের উন্মাদনা সৃষ্টি করিল। ইংরাজ সরকার আর নীরব থাকিতে পারিলেন না। আসন্ন গণ বিদ্রোহের আশঙ্কায় সাভারকর রচিত সমস্ত পুস্তক বাজেয়াপ্ত ও গান নিষিদ্ধ করিলেন। ইহাতে জনসাধারণের উৎসাহ আরো বাড়িয়া গেল। যাহারা পূর্বে এই সব পুস্তকের বিষয় কিছুই জানিতেন না অথবা নাম মাত্র শুনিয়াছিলেন এখন তাহারাও ইহা পাওয়ার জন্য গোপনে সচেষ্ট হইলেন। ফলে এই সব গান লোক মুখে মুখেই প্রচার হইতে লাগিল। ঐ সব গান এখনো সোৎসাহে গীত হইয়া থাকে।

এইরূপে ভ্রমণ তালিকা শেষ করিয়া ১৯০৬ সালের প্রথম ভাগে বিনায়ক সাভারকর বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অধ্যয়নের জন্য ভর্তি হইলেন। পূর্বে ফার্গুসান কলেজে অধ্যয়ণ কালে ১৯০৪ সালে ১৯শে ডিসেম্বর প্রথম এল, এল, বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। বোম্বাইতে আসিয়াও বিনায়ক সাভারকর তাঁহার কায্য পূর্ণ উদ্যমে চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার এই কায্যকলাপে ইংরাজ সরকার বিশেষ বিচলিত ও চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। এই সময় পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি এমনই ছিল যে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিলে ব্যাপক গণবিক্ষোভ এবং রাষ্ট্র বিপ্লবের আশঙ্কায় অন্য কোন উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। নাসিকে জনসভায় ব্রিটীশ বিরোধী উদ্দীপনা পূর্ণ বক্তৃতা দেওয়ায় গ্রেপ্তার করাই স্থির হইল। যথা সময়ে

সাভারকরের নিকট এই সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল এবং তিনিও যে কোন মুহূর্তে গ্রেপ্তার হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

লণ্ডনে হোমরুল সোসাইটির (Home Rule Society) প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা প্রদত্ত, **শিবাজী বৃত্তি** লাভ করায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইল না। শ্যামজী, ভারতীয় ছাত্রগণ যাহাতে স্বাধীন দেশে বাস করিয়া রাজনীতি চর্চা করিতে পারে, তার জন্য 'শিবাজী' বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বিনায়ক সাভারকর লণ্ডনে আইন অধ্যয়নের জন্য সমুদ্র যাত্রায় প্রস্তুত হইতেছেন, এই সংবাদে ইংরাজ শাসক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। তাহারা ভাবিলেন— সাভারকর যখন লণ্ডন যাইতেছেন তখন তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা বা কোন প্রকার বাধা দেওয়া যুক্তি সঙ্গিত নয়। ইংরাজ জাতির শৌর্য বীর্য ও ঐশ্বর্যের লীলা ভূমি লণ্ডন মহানগরীতে উপস্থিত হইয়া ইংরাজের বলবিক্রমের পরিচয় পাইবে এবং ভারত হইতে ইংরাজ শাসন উচ্ছেদ করিবার তরুণ মনের কল্পনা শূন্যে বিলীন হইবে। ভারতে ফিরিয়া আসিয়া প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ রূপে অর্থোর্জন ও যশলিপ্সায় বিভোর থাকিয়া ধ্বংসাত্মক কায্য হইতে বিরত থাকিবেন, দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির জন্য তাঁহার অনুগামীরাও আরব্ধ কায্য হইতে বিরত থাকিবেন। বিনায়ক সাভারকরের শ্বশুর শ্রীচিপ্লংকর ভাবিলেন বিনায়ক দেশে থাকিয়া স্বদেশী আন্দোলনই করিবে এবং ইহার অনিবার্য পরিণামও বিষময়। সুতরাং তিনি তাঁহাকে বিলাত যাত্রায় উৎসাহ দিয়া আর্থিক সাহার্য করিতেও সম্মত হইলেন। বিনায়ক সাভারকরের বন্ধু ও অনুগামীরা মনে করিলেন, তাঁহাদের দলপতি যদি উচ্চ শিক্ষা লাভ করে তাঁহাদেরই গৌরব। বিনায়ক সাভারকর ভাবিলেন, স্বাধীন দেশে গমন করিয়া স্বাধীনতার স্পন্দন অনুভব করিবেন। ভারতীয় ছাত্রদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া অধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবেন।

'রথ ভাবে আমি দেব, পথ ভাবে আমি,
মূর্তি ভাবে আমি দেব, হাসে অর্ন্তযামী'

ইউরোপ যাত্রার পূর্বে বিনায়ক সাভারকর বোম্বাই হইতে 'বিহারী' নামক একখানি সাপ্তাহিক মারাঠা পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন এবং 'অভিনব ভারত'-এর এক গুপ্ত শাখা সমিতি স্থাপন করেন। গুপ্ত সমিতির এক গোপন বৈঠকে সাভারকর বলেন, ভারতের নানা স্থান হইতে বিদ্যার্থীরা ইউরোপ গমন করেন। তাহারা হয় মেধাবী কিম্বা ধনবান। ভাবিকালে আইনজ্ঞ, চিকিৎসক বা উচ্চ পদস্থ রাজ কর্মচারী রূপে ভারতে আসিয়া দেশ শাসন করিবেন। এই সব প্রবাসী ছাত্রদিগকে যদি স্বমতে আনিতে পারি, পথ দেখাইয়া দিতে পারি তাহা হইলে রাশিয়াবাসী যেমন মুক্ত কৃপাণে ও বোমার দ্বারা জারের বর্বর ও নিষ্ঠুর অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন আমরাও অনুরূপ ভাবে মুক্তি লাভ করিতে পারিব। বিশ্ব বিখ্যাত বিপ্লবীদের নিকট কায্য পদ্ধতি, বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুত প্রণালী ও গুপ্ত উদ্দেশ্যে তার প্রয়োগ বিধি আয়ত্ত করিয়া ব্রিটীশ বিরোধী অন্যান্য দেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিয়া ভারত ও বর্হিভারত হইতে বৈপ্লবিক আঘাতে নিশ্চয় ভারতে ইংরাজ শাসন বিলুপ্ত হইবে।

১৯০৬ সালে ৯ই ডিসেম্বর ভারত মাতার ২৩ বৎসর বয়স্ক বিপ্লবী সন্তান দেশবাসীর

মুক্তি সংগ্রামে প্রস্তুতির তীব্র আকাঙ্খায় জলযানে আরোহণ করিলেন। যাতনাক্লিষ্টা ভারত জননী শৃংখলিতা হস্তদ্বয় প্রসারিত করিয়া যেন সজল নয়নে প্রবাসযাত্রী পুত্রকে নীরবে আশীর্বাদ করিলেন, শেষ সীমারেখায় আত্মীয় বন্ধু ও অনুগামীগণ পলকবিহীন নেত্রে অভিনন্দন জানাইল। অজ্ঞাত অব্যক্ত আশঙ্কায় শঙ্কিতা সাভারকর গৃহিনীর সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসে শিশুপুত্র মাতৃঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। ক্রমশঃ দূরে দিগন্ত রেখায় দ্রুতগতিতে বাষ্পীয় পোত অদৃশ্য হইল।

(চার)

'ভূবন বিখ্যাত সেই যশের কারণ,
বনিতা, দুহিতা তরে,
লও অসি, লও করে।
ভারতের লাগি সবে কর তবে রণ।'

—নবীন চন্দ্র সেন।

সীমাহীন জলরাশি অতিক্রম করিয়া বাষ্পীয় পোত গন্তব্য স্থানে দ্রুত গতিতে চলিয়াছে। নীরব শর্বরী। যাত্রীগণ সুপ্তি মগ্ন। বিনায়ক সাভারকর একাকী স্বীয় কক্ষে বসিয়া আছেন, সহকর্মী ও বন্ধুদের কথা ভাবিতেছেন। কখনো বা ভাবিতেছেন কিরূপে জীবন ব্রত সফল করিবেন। ঊর্দ্ধে দিগন্ত বিস্তৃত অনন্ত গগনে অসংখ্য নক্ষত্র, নিম্নে উত্তাল তরঙ্গ হিল্লোলে জল কল্লোল, শূন্যে মহামৌন নিস্তব্ধতা; প্রাকৃতিক এই অপরূপ সৌন্দর্যে বিনায়ক সাভারকরের কবি মন আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিল, তিনি ধীরে ধীরে ডেকের উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং সামুদ্রিক শোভা উপভোগ করিতে লাগিলেন। অনতিদূরে তাঁহারই সমবয়সী অপর এক তরুণ বিষণ্ণ অন্তরে ডেকের উপর দাঁড়াইয়া আপন মনে বাড়ী ফিরিয়া যাওয়ার কথা ভাবিতেছিলেন। মনের কথা খুলিয়া বলিবার মত কোন সঙ্গী খুঁজিয়া পাইতে ছিলেন না। বিনায়ক তাঁহাকে তদ্‌বস্থায় দেখিতে পাইয়া নিকটে আসিলেন এবং সামান্য আলাপেই যুবকটি বুঝিতে পারিলেন যে, সাভারকর একজন কবি। দু-চারিটি মারাঠি কবিতা আবৃত্তি করিবার জন্য তিনি অনুরোধ করিলেন। বিনায়ক সাভারকরের অমায়িক আচরণে ও মধুর আলাপনে মুগ্ধ হইয়া তিনি অকপটে বলিয়া ফেলিলেন যে, পরবর্তী বন্দরে অবতরণ করিয়াই তিনি দেশে ফিরিয়া যাইবেন। বিদেশে শিক্ষালাভ করিয়া দেশে আসিয়া অর্থ উপার্জনে তাহার প্রয়োজন নাই। বিধবা মাতার একমাত্র সন্তান, পিতাও প্রচুর রাখিয়া গিয়াছেন। বিনায়ক বলিলেন, বন্ধু কেন ফিরে যাবেন? সমুদ্র যাত্রা জনিত অসুস্থাতার জন্য, না বাড়ীর জন্য মন খারাপ লাগ্‌ছে? একবার ভেবে দেখুন আমাদের জাতীয় জীবন কেমন করে গড়ে উঠছে। দুই শত বৎসর পূর্বেও আমাদের মারাঠা দেশের মেয়েদের কথা একবার মনে করে দেখুন, তাঁরা ঘোড়ায় চড়ে হাট বাজার করতেই পটু ছিলেন না, শত্রুর সঙ্গে রীতিমত লড়াইও করেছেন, পালতুলে সমুদ্রে নৌকাও চালিয়েছেন। ইংরাজদের কথাও একবার ভেবে দেখুন।

ক্লাইভের সময় প্রায় ছ-মাস লাগতো আসতে সুতরাং তাদের পৌছ সংবাদ দেশে পৌছাতেও এক বৎসর সময় লাগতো। যাতায়াতও ছিল বিপদ সঙ্কুল। তারা কিন্তু এসব গ্রাহ্যও করতেন না। বাণিজ্য করতে এসে রাজ্য জয় করলেন, এখন আমাদিগকে শাসন করছেন। সেই তুলনায় আমরা কত আরামে যাচ্ছি প্রথম শ্রেণীর কামরায়। না না বন্ধু আপনার ফিরে যাওয়া কোন মতেই ঠিক নয়। আপনার বা আপনার মায়ের টাকার দরকার থাকতে না পারে, কিন্তু আপনার মা, আপনার মায়েরও মা, আমাদের সকলেরই মা ভারত মায়েরত দরকার আছে। আমাদের মাকে বিদেশী এসে শাসন ও শোষণ করবে এটা আমাদের কত বড় অপমান। এ অপমানের প্রতিকার চাই। এই জগৎটাকে ভাল করে দেখতে হবে, বুঝতে হবে। স্বাধীন জাতির শক্তির মূল কোথায়—আমাদের দুর্বলতার কারণ কি অনুসন্ধান করতে হবে। রাশিয়া, জার্মানী, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড্ যেতে হবে, রাষ্ট্র বিপ্লব শিখতে হবে। যদি বলেন, প্রিয় জনের কথা, ভাই আমিও তার জন্য কম ব্যথিত নই। আমাদের মাতৃ-ভূমি প্রিয়জন অপেক্ষাও প্রিয়। বলা বাহুল্য মাত্র যে, সাভারকরের এই প্রাণস্পর্শী আবেদন নিষ্ফল হয় নাই। উত্তরকালে এই যুবক শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞরূপে প্রচুর খ্যাতি ও ধন উপার্জন করিয়াছিলেন।

বাষ্পীয়-পোত লণ্ডনে পৌছিল। ভারত হইতে সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজকে বিতাড়িত করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া বিনায়ক সাভারকর ইংরাজ জাতির বাস ভূমিতে পদার্পণ করিলেন। পণ্ডিত শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ভারত-ভবন (India House) এর অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন।

বিনায়ক সাভারকর প্রথমতঃ পণ্ডিতজীর কর্মপদ্ধতি এবং ভারতীয় ছাত্রগণের আদর্শ-ও কায্যকলাপ ধীরভাবে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তৎকালে ভারত-ভবন ভারতীয় ছাত্রগণের মিলন কেন্দ্র ছিল। পণ্ডিতজী ভারতের পূর্ণ-স্বাধীনতার দাবী জ্ঞাপন করিয়া ইউরোপে প্রচার কায্য চালাইতে ছিলেন। তাঁহার আন্দোলনের পদ্ধতি ছিল শান্তিপূর্ণ ও বৈধ উপায়। বিনায়ক সাভারকর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনৈতিক উত্থান পতনের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত দেখাইয়া পণ্ডিতজীর শান্তিপূর্ণ বৈধ উপায়ে 'হোম-রূল' আন্দোলনের অসারতা এবং ব্যর্থতার তীব্র সমালোচনা করিয়া মন্তব্য করিতে লাগিলেন, 'শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্র বিপ্লব কখনও সম্ভব নহে—বিপ্লব চিরদিনই বিপ্লব।' তিন লণ্ডনেও 'অভিনব ভারত' সংঘ গঠন করিলেন। ভারতীয় মাত্রই এই সংঘে যোগদান করিতে পারিতেন এবং প্রকাশ্য ভাবেই সংঘের কায্য পরিচালিত হইত। সংঘের সাপ্তাহিক সভায় বিনায়ক সাভারকর রাশিয়া, ইটালী, ফ্রান্স, আমেরিকা, জার্মানী প্রভৃতি দেশের রাষ্ট্র বিপ্লবের ইতিহাস ধারাবাহিকরূপে আলোচনা করিতেন। তাঁহার নির্ভীক উক্তি, অকাট্য যুক্তি, সদ্য যুক্তিপ্রদ প্রাণবন্ত আহবান, অকৃত্রিম দেশপ্রীতি, চরিত্র মাধুর্য, এবং অতুলনীয় আত্ম প্রত্যয় ভারতীয় ছাত্রদের নয়ন সম্মুখে আসন্ন স্বাধীন ভারতের পূর্ণরূপ উজ্জ্বল আলোক মণ্ডলের মত ভাস্বর করিয়া তুলিল। ভাই পরমানন্দ বলেন ১৯০৬ সালে লণ্ডনে এক জনসভায় তিনি বিনায়ক সাভারকরের সঙ্গে পরিচিত হন এবং প্রথম দৃষ্টিতেই তিনি তাঁহার সংগঠন শক্তি ও নেতৃত্বের পরিচয় পান। তাঁহার এই উক্তি অতীব সত্য। বিনায়ক সাভারকর লণ্ডনে মাত্র এক বৎসর উপস্থিতির মধ্যেই অক্সফোর্ড, ক্যামব্রিজ,

এডিনবরা, ম্যানচেষ্টিয়ার প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ছাত্রদিগকে স্বমতে নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ হন। ভারত জননীর বিপ্লব বাদিনী নন্দিনী **ভিকাজী কামাও** সাভারকরের বিপ্লবদলে যোগদান করেন। এই বীরাঙ্গনা ভারত ললনা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মৃত্যুহীনা। পণ্ডিত শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা জীবন সায়াহ্নে স্বীয় মত পরিত্যাগ করিয়া সাভারকরের নির্দেশিত পথে পদক্ষেপ করেন। তিনি ভারত-ভবনের ভার সাভারকরের হস্তে ন্যস্ত করিয়া প্যারিসে চলিয়া যান এবং 'বোম' (Bom) নামক পত্রিকা পরিচালন করেন। যে সমস্ত মৃত্যুঞ্জয়ী বীর যুবক আত্মত্যাগে ও নির্ভীক নিরলস কর্মতৎপরতায় 'অভিনব ভারত'কে শক্তিশালী করিয়া ব্রিটীশ রাজের ত্রাসের সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং শাসন শক্তির এক বিরাট অংশ যাঁহাদের জন্য দিবস রজনী সবিশেষ সতর্ক থাকিত আজও তাঁহারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে কিরূপ অখ্যাত, অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত নিম্ন ঘটনাই-তার উজ্বল দৃষ্টান্ত।

'অভিনব ভারত'-এর বিশিষ্টি কর্মী এবং বীর সাভারকরের অনুগামী নিরঞ্জন পাল ১৯৫৯ এর নভেম্বর মাসে লণ্ডনে পরলোকগমন করেন। ভারতের সংবাদ পত্রগুলি তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পর্যন্ত প্রকাশ করেন নাই—জীবনী দূরের কথা। গ্লাসগো হইতে প্রকাশিত সুবিখ্যাত সাপ্তাহিক 'ওয়ার্ড' ('Word', an organ of the United Socialist Movement, Glassgo) পত্রিকায় নিরঞ্জন পালের মৃত্যুসংবাদ ও জীবনী প্রকাশিত হয়। পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণার্থ উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুলিখিত হইল;

'বাংলা তথা ভারতের সুসন্তান বাগ্মী **বিপিন চন্দ্র পালের পুত্র নিরঞ্জন পাল**। অল্প রোগ ভোগের পর পরলোক গমন করিয়াছেন শুনিয়া মর্মাহত হইলাম। শ্রীপাল লণ্ডনে বীর সাভারকরের অন্যতম সহকর্মী ছিলেন। ধিংড়ার ফাঁসীর পর হাইড্ পার্কের নিকট নিরঞ্জন পাল বাস করিতেন। 'গয়ে. এ. আল্‌ড্রেড' ভারতের স্বাধীনতার আকাঙ্খার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনের অপরাধে লণ্ডনের আদালতে অভিযুক্ত হন। সেই মামলা চলা কালে নিরঞ্জন পাল সেন্ট্রাল ক্রিমিন্যাল কোর্টে উপস্থিত ছিলেন। আদালতে প্রদত্ত আলড্রেডের বিবৃতি তিনি গ্লোবের মাধ্যমে প্রচার করেন। পুণার মারাঠা পত্রিকাতেও বিবৃতি প্রকাশ করা হয়।

সাভারকর ও আলড্রেড্ একত্রে গ্রেপ্তার হইবার পর তাঁহাদিগকে ব্রিক্সটন জেলে রাখা হয়। নিরঞ্জন পাল ও তাঁহার বন্ধু ডেভিড্ গার্নেট সাভারকর এবং আলড্রেডের জেল হইতে পলায়নের আয়োজন করেন কিন্তু সেই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।

লণ্ডনে শ্রীপাল ইংরাজী নাটক লেখেন। একজন ইউরোপীয় মহিলাকে বিবাহ করেন। ভারতে আসা তাঁহার পক্ষে নিষেধ ছিল।

শ্রীপাল যাহাতে ভারতে ফিরিয়া আসিতে পারেন, তজ্জন্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশেষ চেষ্টা করেন। তৎপূর্বেই শ্রীপাল পিতার কঠিন অসুখের সংবাদ পাইয়া সন্ন্যাসীর নাম ও ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া ভারতে **প্রবেশ** করেন, কিন্তু তিনি পিতাকে জীবিত দেখিতে পান নাই।

অতঃপর শ্রীপাল শান্তি নিকেতনে গিয়া রবীন্দ্রনাথের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এইখানে

বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ ফিল্ম ডাইরেক্টর হিমাংশু রায় এবং রবীন্দ্রনাথের পৌত্রী ফিল্ম অভিনেত্রী দেবিকারাণীর সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। তিনি লণ্ডনে ফিরিয়া যান।

১৯৩৭ সালে সুভাষ বোস (নেতাজী) গান্ধী ও নেহেরুকে অনুরোধ করেন তাঁহারা যেন নিরঞ্জন পালের উপর নিষেধ আজ্ঞা প্রত্যাহারের চেষ্টা করেন। গান্ধী, নেহেরু শ্রীবসুর বিরোধিতা করেন। অবশেষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাইসরয়কে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া পত্র দেন এবং নিরঞ্জন পালের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়।

নিরঞ্জন পাল ভারত স্বাধীনতা লাভের পর বোম্বাই-এ যান এবং তাঁহার কাহিনী লইয়া ফিল্ম তোলা হইতে থাকে।

শ্রীপাল ৪০ বৎসর পর বীর সাভারকরের সঙ্গে এখানে সাক্ষাৎ করেন।

১৮৫৭ সালের সংগ্রামে, বীর সাভারকর রচিত কাহিনী, অবলম্বনে শ্রীপাল ফিল্মের উপযোগী একটি **চিত্রনাট্য** রচনা করেন। নেহেরু সরকার এই ছবি তুলিবার অনুমতি দেন নাই। উহাতে নাকি ভারতের পরবর্তী কালের বিপ্লব আন্দোলনের উল্লেখ ছিল এবং গান্ধী নেহেরুর কার্য্য কলাপের সমালোচনা ছিল।

১৯৪৭ সালে শ্রীপালের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়ে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অর্থ সাহায্য দেওয়া হইলেও শ্রীপালকে কোন প্রকার সাহায্য দেওয়া হয় নাই।

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর হইয়াছিল, তাঁহার স্ত্রী ও একপুত্র রহিয়াছেন।

বীর সাভারকর পরলোকগত এই সহকর্মীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থ বলেন, 'শিল্পী শ্রীপালের মৃত্যুতে ভারতমাতা একজন সুসন্তান ও 'অভিনব ভারত'-এর একজন নির্ভীক সৈনিক হারাইল।' আজকাল কংগ্রেসের ইঁদুর বিড়াল মরিলেও ঘটা করিয়া প্রচার করা হয় আর সাহসী মুক্তি যোদ্ধাদিগকে উপেক্ষা করা হয়, কিন্তু আমাদের বিপ্লবীদের প্রচণ্ড আঘাতের ফলেই ইংরাজ আপোষ রফা করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং এই সংগ্রামী পুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা জাতীয় কর্তব্য।

ইউরোপে 'অভিনব ভারত'-এর মরণ বিজয়ী এই বীর তরুণদের মধ্যে রবি শংকর শুক্ল (পরবর্তীকালে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী), সুখলাল দত্ত (উল্লাসকর দত্তের ভ্রাতা), ডাঃ রাজন, সেনাপতি বাপৎ, হেমচন্দ্র নাগ (মেদিনীপুর), স্যার সেকেন্দার হায়াৎখাঁ, ভি, ভি, এস, আয়ার, জ্ঞান চাঁদ ভারমা, বি, এন, চট্টোপাধ্যায় (—সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা, ভারত প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়ায় পরলোক গমন করেন), লালাহরদয়াল (আই, সি, এস পড়িতে বিলাত যান, বীর সাভারকরের সংসর্গে আসিয়া রাজকীয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত বৃত্তি ঘৃণা ভরে প্রত্যাখান করেন ও মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যুজ্জ্বল রত্ন বিশেষ ছিলেন) প্রভৃতির নাম বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য। এই সংগ্রামী সেনানীরা বীর সাভারকরের মন্ত্রণায় ও প্রেরণায় ব্রিটীশ সরকারের যেমন ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছিলেন তেমন ভারতবাসীর মুক্তি সংগ্রামে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন।

বিপ্লবী সাভারকরের বহুমুখী প্রতিভার মধ্যে সাহিত্য প্রতিভা অন্যতম। বিবিধ জটিল কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি নিয়মিত ভাবে সাহিত্য চর্চার সময় করিয়া লইতেন। স্বাধীন দেশের মৃত্তিকা প্রসূত, স্বাধীন জাতির শ্রমলব্ধ খাদ্য সম্ভারে দৈহিক পরিপুষ্টি সাধন করিয়া, স্বাধীন দেশের মুক্ত বায়ুতে বিচরণ করিয়া সহজাত প্রতিভাবান স্বাধীন চেতা সাভারকর যে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন তার প্রতি শব্দ বিন্যাসে স্বাধীন চিন্তাধারা মূর্তরূপ ধারণ করিয়াছিল, বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ ম্যাৎসিনী (Mazzni)-র অনুবাদ এবং ১৮৫৭ সালে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে ইতিহাস (The war of Independence of 1857) নামক গ্রন্থদ্বয়ে। বীর সাভারকর লণ্ডনে আসিয়া (১৯০৬ অব্দের জুলাইর শেষার্দ্ধ হইতে সেপ্টেম্বরের শেষার্দ্ধ) তাঁহার প্রিয় ম্যাৎসিনির (Mazzni) গ্রন্থাবলী মারাঠী ভাষায় অনুবাদ করিয়া নাসিক হইতে প্রকাশিত করেন। উক্ত পুস্তকের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে এক কথায় ইহাই বলিতে পারা যায় যে আজ পর্য্যন্ত মারাঠী ভাষায় কোন পুস্তকই এত অধিক বিক্রয় হয় নাই। তখনকার দিনে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক সকলেই উক্ত গ্রন্থের উপক্রমণিকা কণ্ঠস্থ করিতেন। পণ্ডিত মণ্ডলী এবং সংবাদ পত্রে গ্রন্থখানি উচ্চ প্রশংসিত হইল। কোন কোন স্থানে শোভাযাত্রা সহকারে দেবমন্দিরে বা পাঠাগারে নীত হইল। শিক্ষিত মারাঠী মাত্রেরই যত্রতত্র আলোচ্য বিষয় ছিল এই গ্রন্থখানি। অবশেষে জনসমাদৃত গ্রন্থখানি সরকার বাজেয়াপ্ত করিলেন।

বীর সাভারকরের অপর একখানি সংকলন ১৮৫৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। ভারতের এই মহাবিপ্লব রাজকোষ লুণ্ঠনকারী, ইংরাজ ললনা লাঞ্ছনাকারী দস্যুর বর্বর অভিযান রূপে প্রচার করিয়া বিশ্বজনচক্ষে ভারতবাসীকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে ইংরাজ জাতি প্রয়াসী ছিল। দিন রাত্রে অমানুষিক কঠোর পরিশ্রমে প্রামাণ্যতথ্য সংগ্রহ করিয়া বীর সাভারকর এই বিকৃত প্রচারের প্রতিবাদে প্রকৃত ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। একদিন সাভারকর গ্রন্থ রচনায় মগ্ন আছেন, এমন সময় পুলিশ আসিয়া তাঁহার গৃহ তল্লসীর নির্দেশ পত্র দেখাইল। সাভারকর স্মিতহাস্যে পুলিশের কর্তাকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার নিজ আসনে বসাইলেন এবং স্বভাব সুলভ বিনয় নম্র আলাপনে রত হইলেন; বসাইবার সময় চকিতে পাণ্ডুলিপি ঐ আসনের নীচেই লুকাইয়া রাখিলেন। ওদিকে পুলিশ তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত গৃহ অনুসন্ধান করিয়া বিফল হইল। পুলিশের অধিকর্তা কল্পনাও করিতে পারিলেন না যে যাহা খুঁজিতেছেন তিনি তার উপরই বসিয়া আছেন। এই রূপে সাভারকর সেদিন পাণ্ডুলিপি রক্ষা করতে সমর্থ হইলেন। অবশেষে ব্রিটিশ সরকার গ্রন্থখানি প্রকাশের পূর্বেই বাজেয়াপ্ত করিলেন। সরকারের এই স্নায়বিক দুর্বলতার জন্য কোন কোন ইংরাজ পরিচালিত পত্রিকা তীব্র সমালোচনা করিয়াছিল। মানব আত্মা স্বাধীন, চিন্তাও স্বাধীন কিন্তু অবয়ব রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রনাধীন বলিয়া পরাধীন ভারতের যুবক সাভারকর স্বাধীন জাতির ভাষায় স্বাধীন জাতির রাজধানীতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস প্রকাশ করিতে সমর্থ না হইলেও নিষিদ্ধকারীর চক্ষে ধূলা নিক্ষেপ করিয়া হলিউড্ হইতে প্রকাশ করিলেন এবং বিশ্ব সাহিত্য ভাণ্ডার পূর্ণ করিলেন। গ্রন্থখানি সর্বত্রই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। এই তরুণ বিপ্লবী দল সর্বপ্রকার

বাধা বিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতা ব্যর্থ করিয়া গোয়েন্দা পুলিশ—এবং শুল্ক বিভাগীয় কর্মচারিদের চোখের উপর দিয়াই ইহার শত শত খণ্ড ভারতেও প্রেরণ করিতেন। কোন কোন ইংরাজ গ্রন্থখানির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, মাতৃভাষা ব্যতীত কেহ যে এইরূপ শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন মিঃ সাভারকরের Indian War of Independence 1857 অধ্যয়ন না করিলে প্রত্যয় হয় না।

সোভিয়েট্ ঐতিহাসিক ঈগর রেশনার মতে বীর সাভারকরই প্রথম ভারতীয় যিনি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ১৮৫৭ সালের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

গান্ধীজী মন্তব্য করিয়াছিলেন,—তাঁহার (মিঃ সাভারকরের) লেখনি অসি অপেক্ষাও তীক্ষ্ণতর।

নেতাজীও বীর সাভারকরের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন, (You who gave us the inspiring history of 'The Indian War of Independence of 1857 and made an equally inspiring history in your youth' (Broad cast 1944) অর্থাৎ আপনি আমাদিগকে ১৮৫৭ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণাময় ইতিহাস দিয়াছেন এবং যৌবনে নিজেও অনুরূপ প্রেরণাময় ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছেন।

বলাবাহুল্য মাত্র যে, এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিশ্ববাসীর 'সিপাহী বিদ্রোহ' সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা দূর হইয়াছিল এবং এই ভ্রান্ত ধারনার মূলে স্বার্থান্বেষী ভারত শাসকের প্রচার যে কত মিথ্যা তাহাও বুঝিয়াছিল।

'অয়ি ইতিবৃত্ত কথা, ক্ষান্ত করো মুখর ভাষণ।
ওগো মিথ্যাময়ী,
তোমার লিখন পরে বিধাতার অভ্যর্থ লিখন
হবে আজি জয়ী।'

সার্থক হইল প্রাণপাত পরিশ্রমের ফল, জয়ী হইল সংগ্রামিক বীর সাভারকরের কালজয়ী লেখনী। আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের ক্ষাত্র শক্তি এবং দেশাত্মবোধ জাগ্রত করিবার জন্য নেতাজী উক্ত গ্রন্থখানি 'The Volcano' নামে অনুবাদ করাইয়া ছিলেন। এই বীর সেনানীগণের যেই 'দিল্লী চলো' রণহুংকারে ব্রিটীশ সিংহের ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছিল সেই ধ্বনি উক্ত গ্রন্থ হইতেই গৃহীত হইয়াছিল। মেজর জেনারেল শা নওয়াজের ভাষায়, 'Delhi Chaloo this cry was taken by' Netaji Bose from Savarkars work in 1857'.

বিপ্লবী সাভারকর ১৯০৬ সালে ডিসেম্বর মাসে, গান্ধীজী ও শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালন ব্যাপারে আলোচনা করেন। গান্ধীজী শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে মত প্রকাশ করেন কিন্তু সাভারকর বলেন, শান্তিময় রাজনৈতিক আন্দোলন আকাশ কুসুম। স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইলে প্রয়োজন শুক্না বারুদ্, দীর্ঘপাল্লা বিশিষ্ট কামান, তেজস্বী নায়ক ও নির্ভীক সৈনিক্।

উভয়ের লক্ষ্য এক, কিন্তু পথ ভিন্ন। পথিক তোমরা পথ অতিক্রম করিতে থাক।

তুষারাবৃত ভূমি ও বিশাল বারিধি অতিক্রম করিয়া ভারতে পৌঁছিতে হইবে। তোমাদের এই সুদীর্ঘ জীবন সংগ্রামের পথে এক অভাবনীয় অত্যুজ্বল আলোক বর্তিকা অতর্কিতে আবির্ভূত হইয়া উজ্বল প্রভায় পথের তমোরাশি বিনাশ করিবে এবং বিচ্ছুরিত অগ্নিপুঞ্জে ধূমকেতুর মত আত্মপ্রকাশ করিবে 'জয় হিন্দ্' মন্ত্রে সাধক বীর সেনানীরা—নেতাজীর অঙ্গুলী সংকেতে তাহারা পৌঁছাইয়া দিবে গন্তব্য স্থানে।

১৯০৭ সালে সিপাহী-বিদ্রোহ দমন করিবার ৫০ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় ব্রিটীশ সরকার লণ্ডন নগরে বিজয় উৎসব উদ্‌যাপন করিল। জনসভায় নানা সাহেব, তাঁতীয়া টোপী, রাণী লক্ষ্মীবাঈ, মৌলানা মহম্মদ সাহেব, কুমার সিং প্রমুখ স্বাধীনতা সংগ্রামী বীরপুরুষদিগকে দেশদ্রোহী, রাজস্ব লুণ্ঠনকারী, নারী অত্যাচারী, নিষ্ঠুর নারীহন্তা বলিয়া বর্ণনা করিল। ভারতে ও ইউরোপে বহু সংবাদ পত্রে অনুরূপ প্রবন্ধাদি ও মন্তব্য প্রকাশিত হইল।

এই ঘৃণ্য মিথ্যাপবাদে বিপ্লবী সাভারকর বড়ই বেদনা বোধ করিলেন। জাতীয় এই অবমাননার প্রতিবাদে মহাবিদ্রোহ ঘোষণার তারিখ ১০ই মে, লণ্ডনে স্বাধীনতা দিবস পালন করিলেন। প্রবীন জননায়কগণ ইহাতে প্রবল আপত্তি জানাইলেন কিন্তু সাভারকর সকলকে ইহার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া প্রকাশ্য জনসভায় এই স্বদেশ ভক্ত বরেণ্য বীরবর্গের মহান আত্মত্যাগ, শৌর্যবীর্যপূর্ণ অপূর্ব বিক্রম বর্ণনা করিয়া বক্তার পর বক্তা শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন। অভিনব ভারতের নির্ভীক সদস্যগণ উপবাস পালন করিয়া স্বাধীনতার সংকল্প বাক্য গ্রহণ করিলেন। 'Honours to the martyrs of 1857 ' লিখিত ব্যাজ্ ধারণ করিয়া সগৌরবে ক্যাম্‌ব্রেজ, অক্সফোর্ড, প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে, ভোজনালয়ে সর্বত্র যাতায়াত করিলেন। শহীদ ('Oh Martyrs') শিরোনাম দিয়া শতশত পুস্তিকা, প্রচার পত্র, বিতরণ করিলেন। ক্যাম্‌ব্রেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক, ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, দেশপ্রাণ বীর যোদ্ধা বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেছ কাহাকে, ইহারা ত দেশ-দ্রোহী উচ্ছৃঙ্খল নর হত্যার পাপে পাপী। ভারতীয় ছাত্রগণ এই উক্তি প্রত্যাহারের দাবী জানাইয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলেন, ফলে কেহ সরকারী বৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেন কেহ বা স্বেচ্ছায় প্রত্যাখান করিলেন। বিপদ বুঝিয়া কোন কোন অভিভাবক ঘরের ছেলে ঘরে ডাকিয়া আনিলেন।

'দেশ দেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।'

জনৈক রাশিয়ান বিপ্লবী ঐ সময় আত্মগোপন করিয়া ফ্রান্সে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহাকে অনুসন্ধান করিবার জন্য একজন মারাঠী যুবক একজন বাঙ্গালী ও মাদ্রাজী যুবক সঙ্গে করিয়া প্যারিস গমন করেন। তৎকালে কোন কোন রাশিয়াবাসী নিজেকে বিপ্লবী রূপে মিথ্যা পরিচয় দিয়া প্রচুর অর্থের বিনিময়ে বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দিতেন। ইহাতে কখনো কখনো মহাবিপদও ঘটিত। ভুল পদ্ধতিতে অপরিপটু হস্তে বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুতের ফলে অকস্মাৎ তাহা বিদীর্ণ হইয়া অঙ্গহানী কখনো বা প্রাণহানীও ঘটিত। 'অভিনব ভারত'-এর সন্ধানী যুবক তিনজনও প্রথমতঃ এই ভাবে প্রতারিত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা

নিরুৎসাহ না হইয়া তাঁহাদের ঈপ্সিত বিপ্লবীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে সন্ধানও পাইলেন। তাঁহাদিগকে বোমা তৈয়ার করিবার প্রণালী ও গুপ্ত উদ্দেশ্যে ব্যবহার বিধি উত্তমরূপে শিক্ষা দিলেন এবং ৫০ পৃষ্ঠার একখানি পুস্তিকাও প্রদান করিলেন, তজ্জন্য তিনি একটি মুদ্রাও গ্রহণ করিলেন না, অধিকন্তু তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে বারণ করিলেন। শিক্ষার্থীরা তাঁহাদের বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া লণ্ডনে ফিরিয়া আসেন।

বিপ্লবী সাভারকর বিশেষ সতর্কতা ও অধ্যবসায় সহকারে 'অভিনব ভারত'-এর বিশ্বস্ত সদস্যদিগকে এই গুপ্ত বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। পরবর্তীকালে পুলিশ বিবরণীতে দেখা যায় ভারতভবন (India House) এ শিক্ষা দিয়া অপরাহ্নে প্যারিসস্থ সদস্যদিগকে শিক্ষা দিতেন এবং মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া লণ্ডনে আসিয়া ভারত ভবনে ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি বিবিধ বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন।

বিপ্লবী সাভারকরের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলেই এই বিপ্লবীয় আন্দোলন নানা দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তিনি আয়ারের বিশ্ববিখ্যাত বিপ্লবী সাইন ফাইন (Sein Fein) এবং অপরাপর বিশ্ববিশ্রুত বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসেন। বিভিন্ন দেশের সন্ত্রাসবাদী পত্রিকায় তাঁহার প্রবন্ধ অনুবাদ করাইয়া নিয়মিত ভাবে প্রকাশ করিতেন। ঐ সব প্রবন্ধ অনুলিখিত হইয়া বোম্বাইর 'বিহারী' পত্রিকায়, কলিকাতার সমকালীন 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। ব্রিটীশ বিরোধী আয়ার্ল্যাণ্ড, মিশর, চীন, তুরস্ক, জার্মান, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করিয়া এক সঙ্গে সর্বত্র বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া তদনুসারে কায্য করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। ফ্রান্সে পণ্ডিত শ্যামজী, ম্যাদাম কামা প্রভৃতি কর্মীগণ, আমেরিকায় গদর পত্রিকার সম্পাদক লালাহরদয়াল, জার্মানীতে বি, এন, চট্রোপাধ্যায়, এবং রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকায়, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে অন্যান্য কর্মীরা কাজ করিতে লাগিলেন। বিপ্লবী সাভারকরের নেতৃত্বে এবং 'অভিনব ভারত'-এর কর্মীগণের নিরলস কর্মতৎপরতায় ও ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে মাত্র চারি বৎসরে (১৯০৬-১৯১০) ভারতবাসীর বৈপ্লবিক মুক্তি প্রচেষ্টা বিশ্বের চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। মিঃ কার্জন উইলীর গুপ্ত হত্যা, তার জন্য শহীদ ধিংড়ার নির্ভীক উক্তি, বিচারে প্রাণদণ্ড, বিপ্লবী সাভারকরের সন্তরণে সাগর অতিক্রম, আন্তর্জাতিক বিচার সভায় সাভারকর ব্যাপার ইত্যাদি ঘটনা পরম্পরায় বিশ্বের রাজনীতি ক্ষেত্র বিশেষ উষ্ণ ভাব ধারণ করিল এবং ব্রিটিশের শত্রুপক্ষ সেই উষ্ণতা বৃদ্ধি করিয়া ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সমর্থন জানাইল। এমন কি জার্মান সম্রাট কাইজার ১ম বিশ্বযুদ্ধে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা, বিশ্বশান্তির অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে সন্ধিপত্রে উত্থাপন করিয়াছিলেন।

'মরিব, মারিব, শত্রু করিব সংহার।'

তরুণ বিপ্লবীদল তাঁহাদের বহু আকাঙ্খিত আগ্নেয় বিদ্যার্জন করিয়া তাহা কায্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার জন্য মারণ মদিরায় বিভোর হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের এই দুর্জয় প্রবৃত্তি নিবৃত্ত করিয়া 'অভিনব ভারত'-এর অধিনায়ক বিনায়ক সাভারকর বলিলেন, ক্ষেত্র প্রস্তুত

না করিয়া কেহ কখনো বীজ বপন করে কি? নাম যশ আমাদের কাম্য নয়। বাহু বলে স্বাধীনতা অর্জন করাই আমাদের উদ্দেশ্য। ধীর চিত্তে স্থির ভাবে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। ভারতে গুপ্ত সমিতির সদস্যদিগকে বোমা প্রস্তুত প্রণালী ও বৈপ্লবিক কার্যে প্রয়োগ বিধি শিক্ষা দিতে হইবে, সন্ত্রাস কায্য পরিচালন পদ্ধতি শিক্ষা দিতে হইবে, ছাত্র শিক্ষক সরকারী কর্মচারী, সৈনিক সকলকে সন্ত্রাস সমর্থক করিয়া তুলিতে হইবে। এমন কর্মসূচী গ্রহণ করিতে হইবে যেন বিদ্যুৎগতিতে বিপ্লবানল ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এখন কর্মে প্রবৃত্ত হইলে ব্যর্থ হইব সুতরাং আত্মঘাতি নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে।

গুপ্ত সমিতির মন্ত্রণা পরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বীর সাভারকর কয়েকজন বিশ্বস্ত ও সিদ্ধহস্ত কর্মী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা সর্বভারতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। অগ্নিগর্ভ অন্যান্য কর্মীগণ ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে দ্বিগুণ উৎসাহে আসন্ন বহ্ন্যুৎসবের আয়োজনে আত্মহারা হইয়া উঠিলেন। ভারত ভবন দিবারাত্র কর্ম মুখর থাকিত। সাপ্তাহিক বক্তৃতা, প্রাত্যহিক আলাপ আলোচনা, নিয়মিত বিতর্কসভা, বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী ও প্রয়োগ পদ্ধতি শিক্ষন পুস্তিকা এবং রাশিয়ার পলাতক বিপ্লবীর প্রদত্ত পুস্তিকা লিখন ও মুদ্রণ এবং তাহা ব্রিটীশের অজ্ঞাতসারে সহস্র সতর্কতায় সহস্র গুপ্ত পথে ভারতের নানা স্থানে প্রেরণ প্রভৃতি কার্যে কর্মীদিগকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত।

ইউরোপ প্রবাসী বিপ্লবীরা যখন ভারতে তাঁহাদের সহকর্মীগণের কায্যকলাপ উৎসুক নয়নে পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন তখন অকস্মাৎ ১৯০৮ সালে ৩০শে এপ্রিল মজঃফরপুরে বোমা বিস্ফোরিত হইল। কলিকাতা মাণিকতলার বাগান বাড়ীতে বোমার কারখানা আবিষ্কার এবং উক্ত মামলায় প্রকাশিত তথ্যাদিতে প্রবাসী রিপ্লবীরা বুঝিতে পারিলেন যে ভারতীয় বিপ্লবীরা আর নিদ্রাভিভূত নহেন। তাঁহারা বাংলার বীর বিপ্লবীদিগকে অভিনন্দিত করিলেন— 'বাংলার বাহু দীর্ঘতর হউক।'

বীর সাভারকরের প্রচেষ্টায় জার্মানীর ষ্টাটগার্ট শহরে আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী সম্মেলনে ভারতীয় বিপ্লবীগণ তাঁহাদের পতাকা ভারতের জাতীয় পতাকা রূপে উড্ডীন করেন ১৯০৭ সালে ১৮ আগাষ্ট। বলাবাহুল্য মাত্র যে, তখন ভারতের কোন রাজনৈতিক দলের পতাকা ছিল না। বীর সাভারকর বহু চিন্তা করিয়া ত্রিবর্ণরঞ্জিত তারকা চিহ্নিত **পতাকার** পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং সাভারকর অনুগামী শ্রীহেম চন্দ্র দাস কঠোর পরিশ্রমে তাহা প্রস্তুত করেন। ইংল্যাণ্ডের সমাজতান্ত্রিক প্রতিনিধি মিঃ র‍্যামসে ম্যাডোলেণ্ড ভারত ব্রিটীশের শাসনাধীন বলিয়া ভারতীয় প্রতিনিধিগণের সম্মেলনে যোগদানে বাধা দেন। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের অপর প্রতিনিধি মিঃ হিণ্ডম্যান ও ফ্রান্সের মঃ জিসজরেসের সমর্থনে ভারতীয় প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদানে সমর্থ হন। বীর সাভারকরের নির্দেশে মাডাম কামা ও সর্দার সিং রাণা ভারতীয় প্রতিনিধি রূপে যোগদান করেন। কামা সম্মেলনে ভাষণ দান কালে উক্ত পতাকা

শ্রোতাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন এবং বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেন, 'This flag of Indian independence. Behold it is born. It is already sanctified by the blood of martyred India youths. I call upon you gentlemen to rise and salute this flag of independemce. In the name of this flag I appeal to all lovers of freedom all over the Continent to Co-operate with this flag in freeing one fifth of the human Race.' প্রতিনিধিবৃন্দ দণ্ডায়মান হইয়া উক্ত পতাকা অভিবাদন করেন। বৃটিশ সরকার শত চেষ্টা করিয়াও উক্ত পতাকা হস্তগত করিতে পারে নাই, এখনো তাহা সযত্নে **রক্ষিত** আছে।

১৯০৮ সালে ২রা মে লণ্ডন নগরে বীর সাভারকর ছত্রপতি শিবাজীর জন্মবার্ষিকী উৎসব আড়ম্বর সহকারে উদ্‌যাপন করেন। যাহাদের বিকৃত ইতিহাস ছত্রপতি শিবাজীকে 'দস্যু' বলিয়া উপহাস করে তাহাদের নয়ন সম্মুখে মহান্‌ শিবাজীকে মানবতার শ্রেষ্ঠ আসনে সমাসীন করিয়া অতুলনীয় দেশ প্রীতি, অসীম সাহস, অপূর্ব পুরুষকার এবং অব্যক্ত প্রত্যুৎপন্ন মতিত্বের জন্য আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন। ইহাতে ইংরাজ জাতির হৃদয়ে যে ক্ষোভ ও ক্রোধের সঞ্চার হইল তাহা প্রশমিত না হইতে ১০ই মে স্বাধীনতা দিবস গত বৎসর অপেক্ষাও অধিক উদ্দীপনার মধ্যে পালন করেন। ১৯০৮ সালে ২০ ডিসেম্বর লণ্ডনে ক্যাসটন হলে বীর সাভারকর ন্যাশানাল কনফারেন্স আহ্বান করেন। উক্ত কনফারেন্সে লালা লাজপত রায়, বিপিন চন্দ্র পাল, খাপর্দে, গকুলচাঁদ নাড়াং এবং আগা খাঁ ও উপস্থিত ছিলেন। বীর সাভারকর তাঁহার স্বভাব সুলভ তেজোদৃপ্ত ভাষণে বৈদেশিক সর্বপ্রকার সম্পর্ক বর্জিত সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই দাবী জ্ঞাপন করেন।

এই সব ঘটনা পরম্পরায় ইউরোপের জনমত বিশেষ চঞ্চল হইয়া উঠিল। বিভিন্ন সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিগণ সময়ে অসময়ে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বৈধ-অবৈধ নানা প্রশ্নে সাভারকরকে উত্যক্ত করিতে লাগিলেন। একদিন এক সাংবাদিক সাভারকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তিনি যে কক্ষে অধ্যয়নরত ছিলেন সেই কক্ষে পরিচারিকা সাংবাদিককে লইয়া গেল। সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করিলেন, মিঃ সাভারকর কোথায়? পরিচারিকা অঙ্গুলী সঙ্কেতে অধ্যয়নরত সাভারকরকে দেখাইয়া দিল। সাংবাদিক তাহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। পরিচারিকা তাহার সঙ্গে উপহাস করিতেছে ভাবিয়া বিরক্ত ও বিস্মিত হইলেন। কক্ষ মধ্যে অকস্মাৎ অপরিচিত ব্যক্তির আবির্ভাবে সাভারকরও অপ্রতিভ হইলেন এবং আসন ছাড়িয়া মৃদু হাস্যে অভ্যর্থনা করিলেন।

সাংবাদিক সহাস্যে প্রশ্ন করিলেন আপনি কি মিঃ সাভারকর?

হাঁ আমি ঐ নামেই পরিচিত সাভারকর বলিলেন।

সত্য কথা বলিতে কি, প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারি নাই যে বিশ্বত্রাস হেতু মিঃ সাভারকর অজাতশ্মশ্রু ক্ষীণকায় বালক মাত্র, আমরা ভাবিয়াছিলাম বিশ্ববিশ্রুত স্বনামখ্যাত বিপ্লবী আকারে আয়তনে............

বীর সাভারকর সাংবাদিকের মনোভাব ব্যক্ত করিবার পূর্বেই বলিয়া উঠিলেন, এইবার তো প্রত্যক্ষ করিলেন। আমিও আপনাদের আশানুরূপ হইতে পারি নাই বলিয়া আন্তরিক দুঃখিত। আশা করি অজাতশ্মশ্রু এই তরুণের কথা স্মরণ করিয়া নিশ্চয় আর লেখনীর সাহার্যেও বিরোধিতা করিবেন না।

অর্দ্ধধরিত্রীর অধীশ্বর জলস্থলনভ পথে একাধিপত্য করতলগত করিয়াও হায় ইংরাজ তোমরা তোমাদেরই শাসিত ভারতের অজাতশ্মশ্রু তরুণের ভয়ে ভীত। সত্যই ভারত মাতা বীর প্রসবিণী।

'পঞ্চনদীর তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে'

'দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে জাগিয়া' উঠিয়াছিল যাহারা তাহাদের প্রতি বীর সাভারকর উচ্চ আশা পোষণ করিতেন। স্বাধীনতা প্রিয় এই সংগ্রামী পুরুষদিগকে জননীর বন্ধন মোচনে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য তিনি সচেষ্ট হইলেন এবং পরিকল্পনা রচনা করিয়া 'অভিনব ভারত'-এর জনৈক বিশিষ্ট শিখ সদস্যের সঙ্গে একদিন আলোচনা করিতেছিলেন। তিনি খুব নৈরাশ্য ভাবে বলিলেন, আপনি চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন। কোন ফল হইবে বলিয়া মনে হয় না, কারণ পুরুষানুক্রমে তাহারা ইংরাজের চাক্‌রী করিয়া জীবিকা অর্জন করিতেছে, সুতরাং ''নিমক খাতা হ্যায়' বলিয়া বিরত থাকিবে।'

বীর সাভারকর প্রত্যুত্তরে বলিলেন, আপনিওত শিখ, নুন খাই যার গুণ গাই তার' নীতিতে লালিত পালিত বর্দ্ধিত। কিন্তু আপনিও স্বাধীনতা সংগ্রামে শেষ রক্তবিন্দু দান করিতে কুণ্ঠিত নহেন। আমরা যদি পাঁচ বৎসর তাহাদের মধ্যে প্রচার কায্য চালাইতে পারি নিশ্চয় তাহারা মুক্তি সংগ্রামে অস্ত্র ধারণ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করিবে না।

বৈপ্লবিক পন্থায় স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ করিলে এই বীর জাতি নিশ্চয়-কাষ্ঠের পুতুল প্রায়, সুসজ্জিত দাঁড়াইয়া একধারে বৃথা কাল হরণ করিতে পারিবে না, এই আশায় বীরভূম পাঞ্জাব প্রদেশে প্রচার কায্য চালাইতে লাগিলেন। উক্ত প্রদেশের সর্বত্র বিশেষতঃ অসিজীবী সৈনিকদের মধ্যে মুক্তি সংগ্রামের আহ্বান জানাইয়া গুরুমুখী ভাষায় প্রচার পত্র ও পুস্তিকা বিতরণ করিলেন। বিপ্লবী সাভারকরের তেজোদৃপ্ত লেখণী প্রসূত জ্বালাময়ী ভাষায় এই সব প্রচারপত্র আত্মবিস্মৃত জাতিকে নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিল। প্রবাসী শিখগণের মধ্যেও তিনি অনুরূপ প্রচার কায্য চালাইতে লাগিলেন। তিনি শিখ জাতির একখানি প্রাণময় প্রামান্য **ইতিহাস সংকলন** করিলেন এবং ভারতবর্ষ, হইতে প্রকাশ করিবার জন্য ঐ পাড়ুলিপি ডাকে ভারতে প্রেরণ করিলেন। কালচক্রের আবর্তনে ভারতে ব্রিটীশ শাসনের পরিবর্তন ঘটিল কিন্তু ব্রিটীশ সরকার তাহার বহু প্রশংসিত ডাক বিভাগের সাহায্যেও পাণ্ডুলিপিখানি যথা স্থানে পৌছাইয়া দিতে পারিল না। শিখগণের মধ্যে বীর সাভারকরের এই প্রচার প্রয়াস বিফল হইল না। প্রবাসী শিখগণ 'অভিনব ভারত'-এর পতাকাতলে সমবেত হইতে লাগিলেন। ১৯০৮ সালে ২৯ সে ডিসেম্বর লণ্ডনে গুরু গোবিন্দ সিংহের জন্মবার্ষিকী উৎসব

উদ্‌যাপন করেন। উক্ত সভায় লালা লাজপত রায়, বিপিন চন্দ্র পাল প্রমুখ জননায়কগণ শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন। বীর সাভারকর ওজস্বিনী ভাষায় বজ্রনির্ঘোষকণ্ঠে এই পুরুষসিংহের সংগঠন শক্তি, সংগ্রাম কৌশল, দেশপ্রীতি, স্বজাতি বাৎসল্য এবং আধ্যাত্মিক সাধনার উল্লেখ করিয়া অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা করিলেন। এই উৎসব উপলক্ষে বিশেষরূপে লিখিত বিপ্লবীয় পুস্তিকা এবং সাভারকরের মেঘমন্দ্র কণ্ঠনিনাদে রণউন্মাদ শিখ জাতির শোণিত ধারা উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। আমেরিকায় গুপ্ত সমিতির গদর পত্রিকা এবং অন্যান্য বৈপ্লবিক পুস্তিকাদি শিখ দিগকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। ব্রিটিশ বিরোধী এই ধূমায়িত মনোভাব ক্যানাডার প্রবাসী আন্দোলন এবং কোমাগাটা মারুর ঘটনাদিতে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। প্রবাসী 'গদর' দলভুক্ত শিখগণ রাষ্ট্র বিপ্লবের দৃঢ় সংকল্প লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন এবং স্বদেশীয়গণকে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। অবশেষে তাহারা ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে লাহোরে এবং ব্রহ্মদেশে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

'অভিনব ভারত'-এর গুপ্ত সমিতির কর্মীগণের নির্ভীক ও নিরলস কর্ম-তৎপরতায় বিপ্লবীয় কার্য্যকলাপ সর্বভারতীয় বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। 'অভিনব ভারত' অধিনায়ক বিনায়ক সাভারকর গুপ্ত আন্দোলন চালাইবার পরিকল্পিত নক্সা, সন্ত্রাসমূলক কার্য্য পরিচালন করিবার দলিল, রাশিয়ার বিপ্লবীর প্রদত্ত পুস্তিকার অনুলিপি প্রভৃতি নিয়মিতরূপে পাঠাইতেন তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এতদভিন্ন তাহার অগ্নিতুল্য বিপ্লব সাহিত্য 'অভিনব ভারত' সম্পাদিত 'বন্দেমাতরম্', ম্যাডাম্ কামার 'তলোয়ার' পণ্ডিত শ্যামজীর 'সোসিওলজিষ্ট' প্রভৃতি পত্রিকা ভারতের সর্বত্র বিভিন্ন বিদ্যালয়ে; ছাত্রাবাসে, পাঠাগারে বিতরিত হইত। ১৯০৯ অব্দের, ১৫ই ফেব্রুয়ারী ভারত ভবনের পাচক চতুর্ভুজের সঙ্গে ২১টি ব্রাউনিং রিভলভার ভারতে প্রেরণ করেন। ভান্‌সি আয়ার নামে জনৈক মাদ্রাজী যুবক টিনাভেলী জেলার ম্যাজিস্ট্রেট্ মিঃ আসে (Ashe) কে গুলী করিয়া হত্যা করেন। উক্ত মামলায় প্রমাণিত হয় যে, ভান্‌সি আয়ার কর্তৃক ব্যবহৃত রিভলভার চতুর্ভুজ আনিত রিভলভারগুলির অন্যতম। ভান্‌সিকে গ্রেপ্তার করিবার সময় তাহার নিকট এক সংখ্যা বন্দেমাতরম্ ও তামিল ভাষায় লিখিত একখানা পত্র পুলিশের হস্তগত হয়। উক্ত পত্রে এইরূপ নির্দেশ ছিল যে, কোন সভায়, কিংবা বাংলোতে, রেলপথে কিংবা গাড়ীতে, কোন দোকানে গির্জায়, বাগানে বা মেলায় যেখানে সুযোগ ঘটে সেখানেই ইংরাজকে হত্যা করিতে হইবে, মহান নানা সাহেবের পথই পথ। বীর বাঙ্গালীরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন—তাঁহারা জয়যুক্ত হইক। উক্ত মামলায় ইহাও প্রকাশিত হয় যে, পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক দিনে এইরূপ ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের নির্দেশ ছিল।

ইউরোপে এবং ভারতবর্ষে বিশেষতঃ ব্রিটীশ বহির্ভূত এলাকায় ভারতীয় বিপ্লবীগণের ক্রমবর্দ্ধমান দৌরাত্মে ব্রিটীশ সিংহ বিচলিত হইয়া উঠিল এবং কেশর ফুলাইয়া থাবা উদ্যত করিয়া রুখিয়া দাঁড়াইল, শিকার পাইলেই ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য। স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সুনিপুণ গোয়েন্দার দ্বারা সমগ্র ইউরোপ জালের মত বেষ্টন করিয়া ফেলিল, ভারতীয়

বিপ্লবীদের সন্ধানের জন্য। ভারতবর্ষেও রাজশক্তির এক বিরাট অংশ প্রয়োগ করা হইল, ভারতীয় বিপ্লবীদের অনুসন্ধানের জন্য। 'অভিনব ভারত'-এর অধিনায়ক বীর সাভারকরই যে এই বৈপ্লবিক কায্য পরিচালনায় মেরুদণ্ড স্বরূপ তাহা শাসকের বুদ্ধির অগোচরে রহিল না কিন্তু প্রকাশ্য ভাবে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ না পাইয়া জননায়কগণের উপরই শাসনদণ্ড পরিচালন করিলেন, লোকমান্য তিলক, পারঞ্জপে, গণেশ রাও দামোদর সাভারকর কারাগারে অবরুদ্ধ হইলেন। ফলে নাসিকে এবং বোম্বাইতে ব্রিটীশ বিরোধী দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাঁধিয়া গেল। সাভারকরের নাসিক বলিয়া নাসিকবাসী গর্ববোধ করিতে লাগিলেন। দর্পিত নাসিকবাসীর গর্ব খর্ব করিবার জন্য ভারত সরকার সমগ্র নাসিক নগরী দুর্ভেদ্য দুর্গ অবরোধের মত শ্বেতাঙ্গ সৈনিকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবন যাত্রাও বিঘ্নিত হইয়া উঠিল। নাসিকের যুবকগণ ছিল তাহাদের চোখের বালি। বীর সাভারকরের নাসিকবাসীও স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্মী কি জয়ধ্বনিতে সর্বপ্রকার অত্যাচার ও নির্যাতনের সম্মুখীন হইল।

'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনা হীন।'

বাঙ্গালী ও মারাঠি বিপ্লবীরা যেন একে অন্যের হাত ধরিয়া মারণ উল্লাসে মাতিয়া উঠিলেন। বাংলায় পুলিশ কর্মচারী, জেলা শাসক, ষড়যন্ত্র মামলায় রাজসাক্ষী, প্রদেশ পালের প্রতি গুলীবর্ষণ ক্রমশঃ ব্যাপক রূপ ধারণ করিল। সরকারও মানিকতলার বাগানে, এলাহাবাদে, লাহোরে, নাসিকে এবং আরো নানা স্থানে রাশিয়ান বিপ্লবীর প্রদত্ত পুস্তিকার অনুলিপি এবং বিপ্লব আন্দোলনের একই রূপ উপাদান ও পরিকল্পনা পুলিশের হস্তগত হইল। গোয়ালিয়রে অভিনব ভারতের গুপ্তসমিতির কয়েকজন সদস্য আগ্নেয় অস্ত্র ও উল্লিখিত পুস্তকাদি সহ ধৃত হইয়া কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইলেন।

ভারত-জননীর বন্ধন বিমোচনে পথনির্দেশক বিনায়ক সাভারকর যখন লণ্ডনে, নাসিকে তখন তাঁহার পুত্র প্রভাকর ভববন্ধন খণ্ডন করিল। এই নিদারুণ সংবাদে বীর হৃদয় মুহূর্তের জন্যও কাতর হইল না। না হইবারই কথা ঃ—

'স্ব-শরীর শরীরিণাবপি
শ্রুত সংযোগ বিপর্যয়ো যদা।
বিরহ কিমিবানুতাপয়েৎ
রঘুবংশম ৮।৮৯

নিজ দেহ ও আত্মার সঙ্গে যখন সংযোগ ও বিয়োগ ঘটে তখন অন্যের আত্মিক সংযোগ বা বিয়োগে জ্ঞানীরা আনন্দিত বা বিষাদিত হন না।

শাসকের রক্তচক্ষু এবং শাসিতের অবজ্ঞা উভয় মিলিয়া ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যখন জটিলতর হইতে ছিল তখন গণেশ দামোদর সাভারকর ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ

করিয়া মুক্তিলাভ করিলেন। তিনি কয়েক খানি বিপ্লবাত্মক পুস্তিকা রচনা করিয়া ভারতময় প্রচার করিলেন। তাঁহার গৃহ তল্লাসি করিয়া পুলিশ ঐ পুস্তিকা, আগ্নেয় অস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য প্রভৃতি হস্তগত করিল। সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং সমর প্রয়াসের অপরাধে ধৃত হইয়া ১৯০৯ সালের ৯ই জুন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। নবজাগ্রত ভারতে ইহাই প্রথম চরম দণ্ড, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। এই দণ্ডাদেশের ফলে বিষাদের কৃষ্ণছায়া ভারতের গগন মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য চেৎপাবন ব্রাহ্মণ বংশীয় অনন্ত কানহারে নামক জনৈক যুবক নাসিকের কালেক্টর মিঃ জ্যাক্‌সনকে গুলী করিয়া হত্যা করে।

এলাহাবাদে লর্ড মিন্টোর প্রতি বোমা নিক্ষেপের দরুণ অধিনায়ক সাভারকরের অনুজ ডাঃ নারায়ণ রাও সাভারকর কারাবাসের পর সদ্য গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন ' কিন্তু মিঃ জ্যাক্‌সনের হত্যাপরাধে পুনরায় ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হইলেন। বিনায়ক সাভারকরের ভারত প্রবেশও নিষিদ্ধ হইল।

অগ্রজ দ্বীপান্তরে, অনুজ কারাগারে, শোক সন্তপ্তা সহধর্মচারিণী পিত্রালয়ে, সুতরাং গৃহে সন্ধ্যাদীপ জ্বালাইবার জন্য একা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ। 'নিদাঘে পল্লব শূন্য তরুর মতন' অগ্রজ জায়ার নিঃসংগ জীবনের এই দুর্বিসহ মর্ম বেদনা উপলব্ধি করিয়া বিনায়ক কবিতায় একখানি পত্র গুপ্ত পথে ভারতে প্রেরণ করিলেন। বিনায়ক সাভারকরের হৃদয়ে যে কারুণ্য ও কাঠিন্যের অপূর্ব সমন্বয় পত্রখানি তারই নিদর্শন। পত্রখানির বঙ্গানুবাদ—

'ভগ্নি! আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করুন। শৈশবে মাতৃহীন হইয়াও আপনার অপার স্নেহে কোনদিন মাতার অভাব অনুভব করি নাই। আপনার স্নেহাশিস পত্র পাইয়া সত্যই আনন্দিত এবং নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিতেছি। আর সৌভাগ্যশালী আমি একা নই, আমাদের বংশেরও সৌভাগ্য যে, সে ভগবৎ সেবায় অংশ গ্রহণ করিতে পারিয়াছে। কাননে কত শত কুসুম কলি দেখিতে পাওয়া যায় কোনটি বিকশিত হয়, কোনটি ঝড়িয়া পড়ে কে তার সন্ধান রাখে। কিন্তু গজেন্দ্র যে কুসুমটি চয়ন করিয়া স্বীয় মুক্তি কামনায় দেব চরণে উৎসর্গ করিয়াছিল সেই কুসুমটি কবির ছন্দবিন্যাসে অমরত্ব লাভ করিয়াছে।

'বন্দিনী ভারত-জননী বন্ধন মোচন কামনায় আমাদের বংশ রূপ কুসুম উদ্যানে প্রবেশ করিয়া আমাদের বংশের শ্রেষ্ঠ কুসুমটি চয়ন করিয়াছেন।

'সেই কুসুমবাটিকা ধন্য যাহার কুসুম রাজি দেবার্চনায় অর্পিত হইয়াছে।

আমাদের বংশজাত প্রতিটি কুসুম এইরূপে দেব চরণে অর্পিত হউক ইহাই আমি মনে প্রাণে কামনা করি। যে উদ্যান দেব সেবার জন্য নিত্য কুসুম সরবরাহ করিয়া থাকে, তাহা নিত্য কুসুমিত। মাতা আপনি পুনরায় সহাস্য বদনে এই কুসুম কাননে প্রবেশ করুন এবং অবশিষ্ট কুসুমরাজি আহরণ করিয়া নবরাত্রির মহোৎসবের জন্য মাল্য রচনা করুন। নব রাত্রির মালিকা গাঁথা হইলে—নব রাত্রির আনন্দ উৎসব সুসম্পন্ন হইলে মহাশক্তি কালী আবির্ভূতা হইয়া তাঁহার উপাসককে অভয় দান করিবেন।

'ভগ্নি! আপনি শক্তির নির্ঝরিণী স্বরূপিণী আপনি আমার শক্তি ও প্রেরণার আধার। আপনি যেই মহৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন তাহা পরিপূর্ণ করিতেই হইবে।

'ঐ দেখুন, একদিকে বিগত অতিতের ঋষি, প্রাজ্ঞ এবং বীর পুরুষদের অমর আত্মা অপরদিকে অনাগত ভবিষ্যৎ উৎসুক নয়নে আপনাকে অবলোকন করিতেছে।

'প্রার্থনা করি, মহাশক্তি যেন আমাদিগকে শক্তি সামর্থ ও প্রেরণা দান করেন, দেবতার আশীর্বাদে আমরা যেন আমাদের জীবন ব্রত সাফল্য মণ্ডিত করিতে পারি।'

মুক্তি সংগ্রামের প্রস্তুতির বিভিন্ন কর্মে ব্যাপৃত থাকিলেও বীর সাভারকর যথাকালে (১৯০৯ সালে) ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তাঁহাকে বারে যোগদান করিবার অনুমতি দিলেন না, অধিকন্তু দেওয়ানী আদালতে অভিযুক্ত করিলেন। ভারতীয় এবং ইউরোপীয় পুলিশ সত্য মিথ্যায় নানা প্রকার সাক্ষ্য প্রমাণ উত্থাপন করিল। এই মামলার জন্য নিখিল বিশ্বের প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞগণ এবং চিন্তা নায়কগণ ব্রিটীশ সরকারকে তিরস্কার ও ধিক্কার করিলেন। ফৌজদারী বিচার্য বিষয় দেওয়ানী আদালতে অন্যায় ভাবে হইতে থাকায় ইংরাজ পরিচালিত প্রগতিবাদী পত্রিকা সরকারের এই মানসিক দুর্বলতার কঠোর সমালোচনা করিয়া তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিল। অবশেষে রাজ সরকার মামলা প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইলেন এবং রাজদ্রোহ মূলক যে কোন প্রকার কায্য হইতে বিরত থাকিবার প্রতিশ্রুতি দিলে সরকার পক্ষ তাঁহাকে বারে যোগদান করিবার অনুমতি দিতে প্রস্তুত আছেন বলিয়া জানাইলেন। বীর সাভারকর এই প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়া দৃঢ়তা সহকারে বলিলেন যে, অনুরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া তাঁহার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন, কারণ সরকার পক্ষ যদি তাঁহার অনুরূপ কোন কায্যকলাপের প্রমাণ পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রকাশ্য বিচারালয়ে অভিযুক্ত করিয়া যথাযোগ্য দণ্ড বিধান করিতে পারেন। ভারত জননীর বীর সন্তানের এই দৃঢ়তায় ব্রিটিশ সরকার উভয় সংকটে পরিলেন, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহাকে 'বারে' যোগদান করিবার অনুমতিও দিলেন না, এবং বুদ্ধি-জীবীদের নামের তালিকা হইতেও তাঁহার নাম বাদ দিলেন না।

শাসক ও শাসিতের এই মর্যাদার লড়াইয়ের দিনে ১৯০৯ সালে ১লা জুলাই নির্মল প্রভাতে সংবাদ পত্র অপ্রত্যাশিত এক হত্যাকাণ্ডের বার্তা লণ্ডন বাসীর প্রতিগৃহে প্রচার করিল। দেখিতে দেখিতে উক্ত পত্রিকমর সমস্ত সংখ্যা নিঃশেষ হইয়া গেল। ট্রামে, পার্কে, পথপার্শ্বে, ঘরে বাইরে, চঞ্চল মনুষের মুখে একই আলোচনা; জনৈক ভারতীয় তরুণের গুলির আঘাতে মিঃ কার্জন উইলী নিহত হইয়াছেন। কেন এই হত্যাকাণ্ড? কোন্ অভাব অভিযোগে ধর্মভীরু নিরীহ ভারতবাসী এই হিংস্রপথ অবলম্বন করিল। নানা প্রকার জল্পনা কল্পনায় দিবা অবসান হইল। সন্ধ্যাকালে সংবাদ পত্রের বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হইল,—মিঃ উইলীর হত্যাকারী মিঃ মদনলাল ধিংড়া ভারতীয় বিপ্লবী বীর সাভারকর পরিচালিত অভিনব ভারত সংঘের এবং ভারত ভবন এর প্রাক্তন সদস্য ও 'এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান'গণ

পরিচালিত প্রমোদ সমিতির বর্তমান সদস্য। ইউরোপ এবং কন্টিনেন্টের অধিকাংশ পত্রিকা প্রায় সপ্তাহকাল ধরিয়া এই হত্যা কাণ্ডের আলোচনায় পূর্ণ ছিল। উক্ত হত্যাকাণ্ড ভিত্তি করিয়া ভারতীয় বিপ্লব সমিতির গুপ্ত তথ্য প্রকাশিত হইয়া পড়িবে এই আশঙ্কায় ইউরোপবাসী অধীর উৎকণ্ঠায় প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ভারতীয় জন নায়ক গণও এই হত্যার ব্যাপারে অতিশয় বিচলিত হইলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, বিপিন চন্দ্র পাল. আগা খাঁ প্রভৃতি এই হত্যার তীব্র নিন্দা করিলেন। শ্রীধিংড়ার পিতা এই হত্যাকারীদের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা জ্ঞাপন করিয়া হত্যাকাণ্ডের নায়ক শ্রীধিংড়াকে স্বীয় পুত্র রূপে পরিচয় দিতে লজ্জিত বলিয়া লণ্ডনে তারবার্তা প্রেরণ করেন।

লণ্ডন প্রবাসী ভারতীয় জননায়কগণ ৫ই জুলাই ক্যাক্সটন হলে (Caxton ball) প্রতিবাদ সভায় সমবেত হইলেন। সভাকক্ষ ভারতীয় এবং ইঙ্গ ভারতীয় গোয়েন্দা দলে ও শ্রোতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বিপ্লবীগণও শ্রীধিংড়ার প্রতি কোন প্রকার হীন মন্তব্য করিলে সভা পণ্ড করিবার দৃঢ় সংকল্প লইয়া সভায় উপস্থিত হইলেন। বক্তার পর বক্তা করুণ ভাষায় এই হত্যার জন্য মর্মবেদনা প্রকাশ করিলেন এবং রাজানুগত্য স্বীকার করিলেন। অবশেষে এই হত্যাপরাধে লিপ্ত থাকার দরুণ ব্যক্তিগত ভাবে শ্রীধিংড়াকে এবং সমষ্টিগত ভাবে তাঁহার দলকে নিন্দা করিয়া একটি প্রস্তাব জন সমর্থন না লইয়াই সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া সভাপতি মহাশয় ঘোষণা করিলেন। তৎক্ষণাৎ সভাকক্ষের এক কোন হইতে দৃঢ়তা ব্যঞ্জক দৃপ্ত কণ্ঠে প্রতিবাদ হইল— "না সর্ব সম্মতি ক্রমে না।" প্রতিবাদকারীর কণ্ঠ ক্ষীণ তর করিয়া সভাপতি মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "নিশ্চয় না।" মিঃ আগা খাঁ এবং ভগবান গিরি সরোষে গর্জিয়া উঠিলেন, "কে-কে—প্রতিবাদ করে, কোথায় সে" শত শত বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্র প্রতিবাদকারীর কণ্ঠস্বর অনুসরণ করিল। ইত্যবসরে সভাকক্ষের এক কোন হইতে একটি কৃশকায় তেজস্বী যুবক উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং নির্ভীক ভাবে বলিলেন, 'এই যে আমি। আমার নাম বিনায়ক রাও দামোদর সাভারকর।'

সভাকক্ষে হই হই রই রই কাণ্ড বাঁধিয়া গেল। উত্তেজিত জনতা বলিয়া উঠিল, শয়তানটাকে লাথি মারিয়া তাড়াও। ইহাদের মধ্যে ভগবান গিরির কণ্ঠই ছিল উচ্চতর। কিন্তু যাঁহার জন্য এত উত্তেজনা ও আক্রোশ তিনি শান্ত ধীর স্থির অটল অচল এবং পুনরায় দৃপ্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'এই ঘৃণ্য প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি, সুতরাং সর্ব সম্মতি ক্রমে গৃহীত হয় নাই।' ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানের সংবাদ অনুসারে ক্ষীণকায় খর্বাকৃতি এই যুবকটিকে লক্ষ্য করিয়া উত্তেজিত জনতা কটুক্তি করিতে করিতে ধাবিত হইল এবং জনৈক ইউরেশিয়ান যুবক প্রচণ্ড মুষ্টাঘাতে প্রতিবাদকারী সাভারকরের চশমা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। রক্তরঞ্জিত মুখে তিনি পুনরায় বলিয়া উঠিলেন,—"একজনও যখন এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতেছে তখন সর্ব সম্মতি ক্রমে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না।"

প্রিয় নেতার রক্তাক্ত কলেবর দেখিয়া অনুগামীরাও ধৈর্যহীন ও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন।

তাহাদের মধ্যে একজন আক্রমণকারীকে লক্ষ্য করিয়া রিভলভার উদ্যত করিলেন। বীর সাভারকর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সকলকেই লক্ষ্য করিতেছিলেন। ইঙ্গিত তিনি তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। কিন্তু অপর একটি ভারতীয় যুবক ক্ষিপ্রগতিতে আসিয়া আঘাতকারী ইউরেশিয়ান যুবকটিকে লাঠির এক আঘাতে ধরাশায়ী করিলেন। অমনি সভাস্থলে মহাহুলুস্থুলু পড়িয়া গেল—বিপ্লবীর কাণ্ড হয়ত এখনই বোমা বিদীর্ণ হইবে কিম্বা আগ্নেয় অস্ত্র ধূম উদ্‌গীরণ করিয়া সদ্য যমের খাদ্য যোগাইবে। এই কাল্পনিক আশঙ্কায় কেহ টেবিলের নীচে লুকাইল, কেহ খোলা জানালা দিয়া নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লইল। একমাত্র সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী প্রতিবাদকারীর প্রতি এই হীন আক্রমণের প্রতিবাদ করিয়া ধীরে ধীরে সভাকক্ষ ত্যাগ করিলেন। সভা হল নিস্তব্ধ।

প্রায় এক ঘন্টাকাল পুলিশ কর্তৃক অবরুদ্ধ থাকিয়া বীর সাভারকর মুক্তি পাইলেন এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষ জানিতে চাহিলেন যে আঘাতকারীর প্রতি তাঁহার কোন অভিযোগ আছে কিনা। বীর সাভারকর মৃদু হাস্যে উত্তর করিলেন, আক্রমণকারী তার উপযুক্ত পুরষ্কার পাইয়াছে, সুতরাং ইহার অধিক আর বিশেষ কিছুই করিবার নাই।

বীর সাভারকর পুলিশের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সর্বপ্রথমেই 'টাইমস্' পত্রিকায় একখানি পত্র লিখিলেন,—মিঃ ধিংড়া নামে পরিচিত যে যুবক মিঃ কার্জন উইলীর হত্যাকারী বলিয়া ধৃত হইয়াছেন, এখনও তিনি বিচারালয়ে অভিযুক্ত হন নাই। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে তিনি দোষী কিনা প্রচুর সন্দেহ আছে; আর সত্যই যদি তিনি দোষী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি সজ্ঞানে করিয়াছেন কিনা এবং ঐ হত্যার অন্তরালে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অথবা ব্যক্তিগত স্বার্থ আছে কিনা তাহাও বিচার্য। বিচারাধীন আসামীর বিচার কায্য চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি হইবার পূর্বেই তাহাকে জনসভায় দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনে কণ্ঠরোধ করা অমানুষিক অত্যাচার বলিয়াই তিনি মনে করেন। কোন জনসভায় জনমত গ্রহণ না করিয়াই কোন প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত বলিয়া সিদ্ধান্ত করাও সভাপতির ধৃষ্টতা ও মূঢ়তা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সভাপরিচালক মণ্ডলীর শোক সূচক মন্তব্য ও ঘৃণা সূচক উক্তি তাঁহাদের মানসিক দুর্বলতারই পরিচায়ক। পরিশেষে তিনি কঠোর মন্তব্য করিলেন যে, ভারতীয় কর্তৃক শ্বেতাঙ্গ নিহত হইয়াছে। শ্বেতাঙ্গ জাতি যখন বিচারালয়ে মীমাংসার প্রতীক্ষা করিতেছেন তখন ভারতীয়গণের এই আচরণ সভ্যজগতে কাপুরুষের ভীরুতা বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে।

বীর সাভারকরের এই যুক্তি পূর্ণ পত্রখানি টাইমস্ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল এবং কয়েক সপ্তাহ যাবৎ রাজনৈতিক মহলে পত্রখানি প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। কয়েকখানি বিশিষ্ট পত্রিকাও এই যুক্তি সমর্থন করিয়াছিল।

বীর সাভারকরের আঘাতকারী যুবকটি সভায় স্বীয় আচরণ সমর্থন করিয়া এবং ইংরাজ জাতির প্রসিদ্ধ মুষ্টাঘাতের জন্য গৌরব বোধ করিয়া একখানি পত্র প্রকাশ করিলেন কিন্তু অচিরেই ইহার প্রত্যুত্তরে অপর একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়া এই উদ্ধত যুবককে স্মরণ

কলাইয়া দিল যে, ভারতের সরল ডাণ্ডায় ঠাণ্ডা হইয়া রক্তাক্ত কলেবরে ব্রিটিশের প্রসিদ্ধ মুসাফাজ কিরূপে ধূলায় লুটাইয়া পড়িয়াছিল।

শ্রীমদনলাল ধৃত হইবার সময় পুলিশ একখানি পত্র হস্তগত করে। পত্রখানি প্রকাশ করাইবার জন্য শ্রীধিংড়া বার বার দাবী জ্ঞাপন করেন। কিন্তু সেই দাবী উপেক্ষিত হয়। অবশেষে অকস্মাৎ আশ্চর্য জনকভাবে পুলিশের হাত হইতে পত্রখানি উধাও হইয়া যায় এবং আহ্বান নামে পুস্তকাকারে সঙ্গোপনে ইউরোপ, ভারত, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে বিতরিত হয়। সংবাদপত্রের শ্বেতকায় কোন মালিকই পত্রখানি প্রকাশ করিতে সম্মত হন নাই। অবশেষে ভারতীয় বিপ্লবীগণের সমর্থক জনৈক আইরিশ যুবক উদার নৈতিকদলের প্রভাবশালী পত্রিকা ডেলী নিউজে সম্পাদকগণের অজ্ঞাতসারে প্রকাশ করিলেন। পত্রখানি সর্বত্রই আগ্রহ সহকারে পঠিত হইল। এমন কি মন্ত্রী মহলেও পত্রখানি বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছিল। উদার নৈতিকদলের অধিনায়ক মিঃ লয়েড্ জর্জ্জ ও মন্ত্রী চার্চিল পত্রখানির সাহিত্যিক প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, ইহা পৃথিবীর দেশাত্মবোধক সাহিত্যের মধ্যে শীর্ষ স্থানীয়। এমনকি তাঁহারা শ্রীধিংড়াকে রোম দেশীয় অসীম সাহসিক স্বদেশ ভক্ত বীর পুরুষদের সঙ্গেও তুলনা করিয়াছিলেন। মিঃ হাইণ্ডম্যান 'জাষ্টিস্' নামক পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে, যদিও তিনি শ্রীধিংড়ার হিংস্র কায্য সমর্থন করেন না, তথাপি নিঃসন্দেহে বলিতে পারেন ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে মিঃ ধিংড়ার অভিযোগ বর্ণে বর্ণে সত্য।

কোন সুশিক্ষিত ব্যক্তি সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিকে স্বজ্ঞানে ধীর চিত্তে কি রূপ মর্ম বেদনাবিভূত হইয়া অত্যাচারী শাসকের উৎপীড়ন হইতে নিষ্কৃতির জন্য দেশ মাতার আহ্বানে কাহাকেও নিহত করিতে পারে তারই জাজ্বল্যমান নিদর্শন, পত্রখানি। কোন্ গুপ্ত রহস্যবলে পত্রখানি পুলিশের নিকট হইতে উধাও হইল লণ্ডনের সুবিচক্ষণ গোয়েন্দাগণ সেই রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে পারিলেন না, তবে তাহারা ইহাই অনুমান করিলেন যে, উক্তপত্রের অনুলিপি অভিনব ভারতের কোন সদস্যের নিকট ছিল তাহাই তাহারা পুস্তকাকারে প্রচার করে এবং পুলিশের হস্তগত পত্রখানি যে কোন উপায়ে নষ্ট করিয়া ফেলে।

২২শে জুলাই বীর সাভারকর ব্রীক্সটন কারাগারে শ্রীধিংড়ার সহিত সাক্ষাৎ করেন। উক্ত সাক্ষাৎকার এবং জনশ্রুতি এইরূপ সমস্যার উদ্ভব করিয়াছিল যে, পরোক্ষ ভাবে বীর সাভারকরও এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত হইয়া পড়িলেন।

যথারীতি মদন লালের বিচার আরম্ভ হইল। তাঁহার কয়েকজন বিশিষ্ট ইংরাজ বন্ধু তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া তিনি যেন বলেন যে, উন্মত্ত অবস্থায় অজ্ঞাতসারে ইহা করিয়াছেন।

'বল বীর চির উন্নত মম শির'।

মরণ বিজয়ী মদনলাল ধর্মাধিকরণের সম্মুখে শঙ্কাহীন চিত্তে বলিলেন যে, তিনি কোন প্রকার আত্মপক্ষ সমর্থনে ইচ্ছুক নহেন, কারণ তিনি যাহাকে হত্যা করিয়াছেন তাহাকে বিন্দু মাত্র দয়া দেখান নাই, সুতরাং তিনিও কাহারও নিকট দয়া ভিখারী নহেন। স্বাধীনতা প্রয়াসী

ভারতবাসীর প্রতি মিঃ উইলী যে নির্ম্মম অত্যাচার করিয়াছেন সেই প্রতিশোধ লইবার জন্যই তিনি তাহাকে হত্যা করিয়াছেন। শ্রীধিংড়ার নির্ভীকতায় বিচারকগণও মুগ্ধ হইলেন। অবশেষে মৃত্যুদণ্ডই যখন প্রয়োগ করা হইল তখন মৃত্যুঞ্জয়ীবীর মুক্ত কণ্ঠে বিচারক মণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, 'আমি হিন্দু। আমার ধমনীর প্রতিবিন্দু রক্ত হিন্দুত্বে পরিপূর্ণ। মহান উদ্দেশ্যে মৃত্যুপথ যাত্রী আমি—শেষ পথের শেষ সীমারেখায় দাঁড়াইয়া আজ আমি বিশ্বপিতার নিকট সর্বান্তকরণে এই প্রার্থনাই করি যেন পুনরায় হিন্দুস্থানে জন্মগ্রহণ করি এবং হিন্দুস্থানের কল্যাণের জন্য এই রূপে জীবন উৎসর্গ করিতে পারি।'

'মরণ রে,
তুঁহু মম শ্যাম সমান'

১৯০৯ অব্দের ১৭ই আগষ্ট এই দেশহিতব্রতী হাসিমুখে ফাঁসীর রজ্জু জয়মাল্য রূপে বরণ করিলেন। এই বরণীয় দিবসে অভিনব ভারতের সদস্যগণ ব্রত উপবাস পালন করিলেন এবং শহীদের শব হিন্দু মতে সৎকার করিবার জন্য দাবী জানাইলেন। তাঁহাদের এই দাবী উপেক্ষা করিয়া কারাপ্রাঙ্গনেই শেষকৃত্য সমাধান করা হইল।

লণ্ডনে দাঁড়াইয়া ভারতের প্রাক্তন রাজ প্রতিনিধির বুকে গুলী করিবার উদ্দেশ্য একজন ইংরাজকে হত্যা করা নয়, ইহার উদ্দেশ্য ছিল গভীর ও ব্যাপক—ভারতের নবজাগ্রত ক্ষাত্র শক্তির কথা সরবে প্রকাশ করা, ভারতের তরুণ বিপ্লবীরা যে আর নিদ্রাভিভূত নহেন তাহাই ঘোষণা করা।

'স্বাধীনতা-হীনতায়
কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়,
দাসত্ব শৃংখল বল
কে পড়িবে পায় হে, কে পড়িবে পায়।'

মিঃ কার্জন উইলিকে হত্যার পর হইতে লণ্ডন নগরী গোয়েন্দা পুলিশে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। রাস্তার প্রত্যেক মোড়ে প্রত্যেক ভারতবাসীকে বিশেষ করিয়া 'ভারত-ভবনের' সদস্য গণকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তল্লাসী করিয়া দেখিত। ক্রমশঃ যাতায়াত বিরক্তজনক ও কষ্টকর হইয়া উঠিল, একবার জনৈক সাংবাদিক বীর সাভারকরকে প্রশ্ন করিলেন, গোয়েন্দাগণ ছায়ার মত আপনাকে অনুসরণ করে, ইহা আপনার পক্ষে নিশ্চয় বিরক্তকর, মিঃ সাভারকর'।

সাভারকর বলিলেন, 'আমার বাসভবনের সম্মুখে তাহারা যেরূপভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, তাহাতে যদি তাহাদের কোন কষ্ট না হয়, তাহা হইলে আমারও কোন আপত্তির কারণ নাই।'

দিবস রজনী সর্বদা রৌদ্র, কুজ্ঝটিকা, শিলা-বৃষ্টির মধ্যে একই বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া অপলক নেত্রে 'দাঁড়াইয়া অকারণ' চাহিয়া থাকিবার দৃশ্য পথিক মাত্রেরই করুণা সঞ্চার করিত। অবশেষে পুলিশের এই অনুগমন, অনুসন্ধান, এবং উপস্থিতির ফলে ভারতীয় গণের বাসস্থান সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল, কারণ তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিয়া কেহই পুলিশী শনির কোপানলে দগ্ধ হইতে রাজী ছিল না। ভারতীয় বিপ্লবীগণের দুর্দশাই চরমে

উঠিয়াছিল। তাঁহাদের কায্যকলাপ লক্ষ্য করিবার সুবিধা হইবে মনে করিয়া সরকার 'ভারত-ভবন' বন্ধ করিয়া দিলেন। বিপ্লবী সাভারকর বলেন যে, 'ভারত ভবন' বন্ধ করিবার বহু পূর্বেই তাঁহাদের কায্যকলাপ ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছিল, এমন কী প্রত্যেক ভারতীয় বিপ্লবীর প্রত্যেকটি বাসস্থানই 'ভারত-ভবনে' পরিণত হইয়াছিল। সরকার 'ভারত-ভবন' বন্ধ করিয়া দিলেও কর্মীগণের কর্ম তৎপরতা বন্ধ করিতে পারেন নাই। সাভারকর মণ্ডলী নিয়মিত রূপে গুপ্ত মন্ত্রণা সভায় মিলিত হইতেন এবং গুপ্ত পথে ভারতবর্ষে প্রচার কায্য চালাইতেও ব্যর্থ হন নাই। 'হে ভারতীয় নায়কগণ', 'হে ভারতীয় নৃপতি বৃন্দ' ইত্যাদি শীর্ষক প্রচার পত্র তাঁহারা গুপ্ত পথেই প্রেরণ করিতেন এবং ভারতের কর্মীগণ তাহা সর্বত্র বিতরণ করিতেন। এই সব প্রচার পত্র বা পুস্তিকায় তাঁহারা ঘোষণা করিতেন, ভারতবর্ষ নিশ্চয় স্বাধীন হইবে। সর্বভারতীয় একমাত্র ভাষা ও লিখন প্রণালী থাকিবে, সেই ভাষা হইবে হিন্দি এবং অক্ষর হইবে দেবনাগরী। ভারতবর্ষ নিশ্চয় অখণ্ড থাকিবে। ভারতবর্ষে নিশ্চয় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। এইসব প্রচার পত্রিকায় লেখকের নাম না থাকিলেও উহা যে বীর সাভারকরেরই লিখিত তাহাতে কাহারো সন্দেহ থাকিত না।

এত প্রতিবন্ধক এবং দুর্ভোগের মধ্যেও অভিনব ভারতের কর্মীগণ ১৯০৯ সালে ২৪শে অক্টোবর বিজয়াদশমীর আনন্দোৎসবের আয়োজন করেন এবং গান্ধীজীর সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভায় মিলিত হইলেন। উক্ত জনসভায় বীর সাভারকর তাঁহার স্বভাব সুলভ তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে সমকালীন পরিস্থিতি বর্ণনা করিয়া বিজয়ার তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করেন।

'ভারত-ভবন' বন্ধ করিয়া দেওয়ার পর হইতেই ভারতের মুক্তি সংগ্রামী এই তরুণদিগকে যেইরূপ দুরবস্থায় কালাতিপাত করিত হইতে তাহা সত্যই বর্ণনাতীত। এক দিনের একটি ঘটনা উল্লেখ করিলেই পাঠক তাহা কিঞ্চিৎ অনুমান করিতে পারিবেন। একদিন বিপ্লবী সাভারকর ক্রমান্বয়ে দুইটি পান্থনিবাসে আশ্রয় সংগ্রহ করিলেন কিন্তু পান্থনিবাসের মালিক উভয় স্থান হইতে তাঁহাকে পুলিশের ভয়ে বিতাড়িত করিল। স্থান হইতে স্থানান্তরে বৃথা অন্বেষণে দিন কাটিয়া গেল। সন্ধ্যা পার হইল। বহু চেষ্টায় তৃতীয় পান্থনিবাসে স্থান সংগ্রহ করিয়া সবেমাত্র শ্রান্ত, ক্লান্ত দেহে আরাম কেদারায় উপবেশন করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন এমন সময় উক্ত পান্থনিবাসের মালিক আসিয়া সবিনয়ে নিবেদন করিলেন, "ঐ দেখুন আপনি আসিবার সঙ্গে সঙ্গে আমার পান্থ নিবাসের পূর্ব পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ চারিদিকে পুলিশ আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। ইহাতে আমার অন্যান্য ভাড়াটিয়াগণ বিশেষ ভীত ও বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন, সুতরাং দুঃখের সঙ্গে অনুরোধ করিতেছি, আপনি এখনই অন্যত্র স্থান গ্রহণ করুণ।" রাজ-রাজেশ্বরী ভারত জননীর প্রবাসী সন্তান তৎক্ষণাৎ সামান্য আসবাব পত্রাদি লইয়া নূতন উদ্যমে নূতন আশ্রয়ের সন্ধানে বহির্গত হইলেন। অবশেষে এক মহাপ্রাণা জার্মান মহিলা তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন।

কঠোর পরিশ্রমের ফলে ক্রমশঃ সাভারকরের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। চিকিৎসকের উপদেশ ও বন্ধুগণের অনুরোধে কিছুকাল বিশ্রামের জন্য তিনি ব্রাইটনে গমন করেন। ব্রাইটনে সাগর দর্শনে তাঁহার কবিপ্রাণ আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিত। এই সাগর সৈকতে রচিত

কবিতাবলীতে তাঁহার তৎকালীন মানসিক অবস্থা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

ব্রাইটনেও তাঁহার স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি হইল না। অধিকন্তু ব্রংকাইটিস্ ও আমাশায় আক্রান্ত হইলেন। চিকিৎসকগণের উপদেশানুসারে তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে ওয়েলস্ স্থিত ডাঃ মাথুর নামক জনৈক ভারতীয় চিকিৎসকের স্বাস্থ্য নিবাসে স্থানান্তরিত করিলেন (১৯১০ সালে জানুয়ারী)। অসুস্থতার মধ্যেও বীর সাভারকর কখনো বৃথা সময় নষ্ট করিতেন না। 'বন্দেমাতরম্' 'তলোয়ার' প্রভৃতি বিপ্লববাদী পত্রিকার জন্য নিয়মিত রূপে প্রবন্ধ রচনা করিতেন।

'অভিনব ভারত'-এর কর্মীদিগকে প্রবাসে যেমন দুর্ভোগ সহ্য করিতে হইয়াছিল স্বদেশেও তাঁহাদের আত্মীয় পরিজনবর্গকেও তেমনি অবর্ণনীয় দুর্দশা ভোগ করিতে হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে সাভারকর পরিবারকেই চরম দুঃখ ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। এমন কী কোন ভিক্ষুক পর্য্যন্ত সাভারকরগৃহে নির্বিঘ্নে যাইতে পারিত না। কারণ গুপ্তচর ভিক্ষুককেও নানা প্রশ্নে ও অনুসন্ধানে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। বীর সাভারকরের শ্বশুর জাভার ষ্টেটের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইল। অপরাপর আত্মীয় স্বজনগণ যাহারা কোন প্রকার সরকারী বা আধা সরকারী চাকুরী করিতেন তাহাদিগকেও নানা অজুহাতে কর্মচ্যুত হইতে হইয়াছিল।

মিঃ জ্যাকসন ও মিঃ কার্জন উইলির হত্যার পর ইংরাজ পরিচালিত পত্রিকাগুলি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বিবিধ মন্তব্য ও প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া প্রকারান্তরে বীর সাভারকরকেই দোষী সাব্যস্ত করিতে লাগিল। কোন কোন পত্রিকা প্রকাশ্য ভাবেই বীর সাভারকরের নাম উল্লেখ করিয়া রাজ সরকারের নিকট জানিতে চাহিলেন যে, একের পর এক নরহত্যা করিয়া, দেশব্যাপী অরাজকতার সৃষ্টি করিয়া, জন সাধারণকে রাজশক্তির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া এবং শাসনদণ্ড অবজ্ঞা করিয়া স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিবার কি ক্ষমতা বা অধিকার তাঁহার আছে। ভাগ্যচক্রের নিষ্ঠুর আর্বতন উপলব্ধি করিয়া তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে ফ্রান্সে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সাভারকর কোন প্রকার নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। ফ্রান্সস্থিত 'অভিনব ভারত'-এর কর্মীগণ পুনঃ পুনঃ তারবার্তা প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন এবং নিরাপদে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য একজন বিচক্ষণ ও বিশ্বস্ত কর্মীও প্রেরণ করিলেন। অবশেষে স্বাস্থ্যের জন্য এবং 'অভিনব ভারত'-এর কায্য সুচারু রূপে পরিচালন করিবার জন্যও নিরাপদ আশ্রয় একান্ত প্রয়োজন মনে করিয়া ফ্রান্স গমনে সম্মত হইলেন। 'অভিনব ভারত'-এ র কর্মীগণ এক গুপ্তসভায় তাঁহাদের প্রিয় অধিনায়কের বহুমুখী প্রতিভা নিরভিমান নিরলস, নির্ভীক কায্যকুশলতা, অপূর্ব সংগঠন শক্তি, অদ্বিতীয় দেশপ্রীতি, স্বাধীকার অর্জনের তীব্র আকাঙ্খা, চারিত্রিক মাধুর্য এবং বিবিধ নৈপুণ্য বর্ণনা করিয়া একের পর এক সকলেই অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করিলেন। লণ্ডনে গোপন বৈঠকে ইহাই বীর সাভারকরের শেষ উপস্থিতি। অনুগামী ও বন্ধুগণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফ্রান্স অভিমুখে যাত্রা করিলেন ১৯১০ সালে জানুয়ারীর শেষ দিকে।

বীর সাভারকর যখন যেখানে উপস্থিত থাকিতেন তখন সে স্থানেই তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া বিপ্লবী সংঘ শক্তির অভ্যুদয় হইত। প্যারিসেও ইহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিল না। ক্রমশঃ তথাকার ক্ষুদ্র কর্মক্ষেত্রও তাঁহার অতৃপ্তিকর হইয়া উঠিল। লণ্ডনে ফিরিয়া যাওয়া তিনি স্থির করিলেন।

এই সময় নাসিকের কালেক্টর মিঃ জ্যাক্‌সন হত্যার আসামীদের বিচার কায্য চলিতেছিল। এই বিচারের ফলাফল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বাসী সকলেই বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিতে ছিলেন। তাহাদের দৃঢ় ধারণা ছিল যে এইসব আসামীদের দ্বারাই ভারত সরকার বিপ্লব সমিতির গুপ্ত তথ্য আবিষ্কার করিতে পারিবেন। স্বীকার উক্তির জন্য ভারত সরকার এই সব আসামীদিগকে কি কঠোর নির্যাতনই না করিয়া ছিলেন। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত এই বীর সেনানীরাও স্বাতন্ত্র্য 'লক্ষ্মী কি জয়' ধ্বনিতে সরকারের বহু আকাঙ্খিত প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন।

বীর সাভারকর সংবাদ পত্রে এই সব সংবাদ অবগত হইয়া বিশেষ চিন্তিত ও বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন, বন্ধু, সহকর্মী, ভ্রাতা তাঁহারই মন্ত্রণায় ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহারই নির্দেশিত পথে পদক্ষেপ করিয়া কারা অন্তরালে নিশ্চিত মৃত্যুর অপেক্ষায় প্রহর গণিতেছে; আর তিনি নায়ক শিক্ষাদাতা পথ প্রদর্শক হইয়া নিরাপদে সুখে বিচরণ করিবেন, ইহা মানবতার কলঙ্ক। সুতরাং ভারতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের সম দুঃখ ভার গ্রহণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। ইহাতে তাঁহার বন্ধুগণ প্রবল আপত্তি জানাইলেন এবং নিরাপদ স্থানে অবস্থান করিয়া তাঁহাদিগকে পরিচালন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। পণ্ডিত শ্যামজীও বলিলেন, 'তুমি নায়ক, সাধারণ সৈনিকের সহিত সংগ্রাম করা তোমার অনুচিত, তাহাদিগকে পরিচালন করাই তোমার কর্ত্তব্য।' বীর সাভারকর শ্যামজীর প্রতিবাদ করিয়া বলেন, 'যদি সকলেই শিবিরে বসিয়া থাকি, তাহা হইলে সংগ্রাম করিবে কে? আর আমার এই নিরাপত্তাকে আত্মগোপনকারীর ভীরুতা রূপে গ্রহণ করিয়া সহকর্মীগণ নিরুৎসাহ হইবে। আমার প্রিয় অনুগামীদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমাকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, সত্যই তাহাদিগকে পরিচালন করিবার আমার কোন যোগ্যতা আছে কি না।'

ভারতে পদার্পণ করা মাত্রই যে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ ছিল না, কারণ ভারত সরকার তাঁহার ভারত প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। ভারত সরকারের মত ব্রিটিশ সরকারও তাঁহার বিরুদ্ধে কোন গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রয়োগ করিয়াছিলেন কিনা তারও নিশ্চয়তা ছিল না। মিঃ কার্জন উইলীকে হত্যার পরও প্রমাণাভাবে তিনি মুক্তই ছিলেন। নাসিকে মিঃ জ্যাকসনের হত্যার সময় সুদূর প্রবাসে অধিকন্তু শ্রীঅনন্ত কানহারের সঙ্গে তাঁহার কোন যোগাযোগের প্রমাণও নাই। এইরূপ পরিস্থিতিতেও যদি তিনি আত্মগোপন করেন তাহা হইলে 'অভিনব ভারত'-এর অন্যান্য কর্মীগণও বিপদ সঙ্কুল লণ্ডন হইতে নিশ্চয় অপর কোন নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লইবেন এবং তাহাতে আপত্তি করিবারও যুক্তিসংগত কোন উপায় থাকিবে না। ইহাতে বৃথাই আতঙ্কের সৃষ্টি হইবে এবং পরিণামে 'অভিনব ভারতর'-ই ক্ষতি সাধন করা হইবে। মনে মনে অনুরূপ নানা চিন্তা করিয়া তিনি লণ্ডনে যাওয়াই স্থির করিলেন।

চিকিৎসকগণের উপদেশানুসারে একদিন যথারীতি প্রাতঃ ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। লণ্ডনে যাইবার আন্তরিক অভিপ্রায়, কিন্তু বন্ধুগণের প্রবল আপত্তি, ইহার মধ্যে কোনটা বাছিয়া লইবেন, বিবেকের নির্দেশিত পথেই চলিবেন, না বন্ধুগণের উপদেশই গ্রহণ করিবেন আপন মনে চিন্তা করিতে করিতে অভ্যস্থপথে এক মনোরম সরোবর তীরে উপনীত হইলেন। সুপ্তিমগ্ন মৃতপ্রায় অচেতন জীব জগতে ভুবনমোহিনী ঊষাদেবী মৃদু হাস্যে ধীর পদক্ষেপে অবতরণ করিতেছে। প্রভাতী পবনে কম্পিত কুসুম স্তবক ঊষাদেবীর অভ্যর্থনা করিতেছে, মধুকর মৃদুগুঞ্জনে বন্দনা গীতি গাহিতেছে। উদীয়মান ভানু সরসী-নীরে সহস্রে প্রতিবিম্বিত হইয়া মৃদু মন্দ তরঙ্গে-ভঙ্গে সারস অঙ্গে লীলারঙ্গে উথলিয়া পড়িতেছে। স্বপন পুরীর নয়ন-মন চিত্ত বিমোহন এই সৌন্দয্যে কবি সাভারকরের সুষমা পিপাসু মন আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিল। সৌন্দর্য্যের এই লীলাভূমিতে দৈহিক সত্ত্বা এবং মানসিক চিন্তা বিস্মৃত হইয়া অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বহুক্ষণ অতিবাহিত করিলেন। সহসা পদতলে ক্রীড়ারত সারস কূজনে যেন সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইলেন, এবং মনের অজ্ঞাতসারে হস্তস্থিত সংবাদ পত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইলেন নাসিকে মিঃ জ্যাকসন হত্যার আসামীদের বিচার শেষ হইয়াছে। অনন্তকানহারে প্রমুখ আসামীগণ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে কিন্তু উক্ত নামের তালিকায় নারায়ণ সাভারকরের নাম দেখিতে না পাইয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়া পুনঃ পুনঃ তালিকা দেখিতে লাগিলেন। সংবাদ পত্রের প্রতি বর্ণ মৃত্যুপথ যাত্রীদের মূর্তরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার এই আরাম প্রিয়তার জন্য যেন ব্যঙ্গ করিতে লাগিল—স্বপ্নপুরীর প্রমোদ উদ্যান মুহূর্তে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হইল। বিবেকের তীব্র কষাঘাতে বিপ্লবী সাভারকরের নির্ভীক হৃদয় কবি মনকে বারংবার ধিক্কার ও তিরষ্কার করিতে লাগিল। অনুতাপে ও অনুশোচনায় তাঁহার চিত্ত বিদগ্ধ হইতে লাগিল। বিদ্রোহী বিপ্লবী সাভারকর ভাবিলেন, আরব্ধ কায্য সুসম্পন্ন করিতেই হইবে। ভারতবর্ষে না হইলেও লণ্ডনে অবশ্যই গমন করিবেন এবং সর্বপ্রকার বিপদের সম্ভাবনা সত্ত্বেও অনুগামীদের পার্শ্বেই দাঁড়াইবেন; ইহাই প্রমাণ করিবেন শুধু অপরকেই মৃত্যুর কবলিত করিতে পারেন না, প্রয়োজন হইলে নিজেও নির্ভীক চিত্তে মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে পারেন। জীবন ব্রত সুসম্পন্ন করিতে পারিবেন কিনা সেই চরম পরীক্ষার দিন উপস্থিত হইয়াছে। অবিচলিত চিত্তে, অকম্পিত পদভরে, অপ্রতিহত গতিতে ছুটিয়া যাইবেন রুদ্ররূপী তীব্র দুঃখ-লাঞ্ছনা পরিবৃত সেই পরীক্ষা মন্দিরে। শত্রু হস্তে ধৃত হইলে বিধিলিপি বলিয়া নতশিরে শত্রুর অধীনতা স্বীকার করিবেন না। বন্ধন ছিন্নভিন্ন করিয়া নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করিবেন। মৃত্যুই যদি অবশ্যম্ভাবি হয়, শত্রুর হস্তে নয়, প্রফুল্ল অন্তরে স্বীয় বাহু বন্ধনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন বদ্ধ করিবেন এবং এমন দৃষ্টান্ত রাখিয়া যাইবেন যাহাতে স্বদেশীয়গণের শোণিত ধারা উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে। সেই মৃত্যু এই সান্ত্বনা বহন করিয়া আনিবে যে, দেশ সেবায় মৃত্যু বরণ করিতে ভীত হইবেন না বলিয়া দেব সন্নিধানে শৈশবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আর পরীক্ষায় যদি উত্তীর্ণ হন তাহা হইলেই অপরকে পরিচালনা করিবার যোগ্যতা অর্জন করিবেন।

[illegible]তের মত বাসস্থানে উপনীত হইয়া সংবাদ পত্র বন্ধুগণের সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া লণ্ডনে যাইবার দৃঢ় অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন এবং যেইরূপ যুক্তি তর্কের অবতারণা করিলেন তাহাতে কেহই কোন প্রতিবাদে সাহসী হইলেন না। বীর সাভারকরের চরিত্র কঠোর—কোমলের এক অত্যাশ্চর্য সমন্বয়। তাঁহার সংস্রবে যিনি একবার আসিতেন এমন কী গোয়েন্দাগণ এবং সাংবাদিকরাও তাঁহার প্রতি প্রীত ও শ্রদ্ধাশীল না হইয়া থাকিতে পারিতেন না, বন্ধু ও অনুগামীগণের কথা বলাই বাহুল্য। প্রিয় নেতার এই অবাঞ্ছিত বিচ্ছেদে বিশেষত এই বিপদ সঙ্কুল পরিস্থিতিতে তাঁহারা সকলেই মর্মাহত হইলেন।

যাত্রাকালে অশ্রুপূর্ণ নয়নে বন্ধুগণ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। ট্রেন যতক্ষণ দৃষ্টি গোচর ছিল ততক্ষণ তাঁহারা স্থান ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

‘যেতে নাহি দিব’ হায়
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।’

বীর সাভারকর ক্রমশঃ প্যারীস অতিক্রম করিয়া ফরাসী রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিলেন এবং ব্রিটিশ সীমানায় প্রবেশ করিলেন। ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করিতে করিতে বীর সাভারকর তাঁহার সঙ্গীকে বলিলেন, ‘দেখুন শীঘ্রই যে আমি ধৃত হইব তাহা ধ্রুব সত্য।’

সঙ্গী প্রশ্ন করিলেন, ‘এইরূপ জানিয়াও আপনি ব্রিটিশ এলাকায় যাইতেছেন কেন?’

বীর সাভারকর প্রত্যুত্তরে বলেন ‘যদি ধৃত হই তাহা হইলে ইহাই প্রমাণিত হইবে যে, যেমন কথা বলি তেমন কাজ করিতে জানি এবং ফলভোগ করিতেও পারি। আত্মগোপনের দ্বারা ভীরুতাকে সাময়িক ভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিতে পারা যায় কিন্তু তাহাতে কোন মহৎ কাজ করা যায় না।’

বীর সাভারকর যে ধৃত হইবেন তাহাতে কোন সন্দেহ ছিল না, কিন্তু পথেই যে ধৃত হইবেন তাহা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। ট্রেন যতই লণ্ডনের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল গোয়েন্দার সতর্কদৃষ্টি ততই প্রখরতর হইতে লাগিল। ভিক্টোরীয়া ষ্টেশনে ট্রেনের গতি রুদ্ধ হইল। বীর সাভারকর দেখিলেন যে, সাধারণ পোষাক পরিহিত একদল গোয়েন্দা তাঁহার কামরার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে এবং অঙ্গুলী সংকেতে তাঁহাকেই নির্দেশ করিয়া বলিতেছে, “ঐ যে মিঃ সাভারকর, ঐ কামরায় আছেন।” বীর সাভারকর অবতরণ করিলেন। মধুচক্রে লোষ্ট্র নিক্ষেপে মধুমক্ষিকা যেমন ক্ষিপ্ত ও চঞ্চল হইয়া উঠে তেমনি ক্ষিপ্ত ও চঞ্চল গুপ্তচরের দল চকিতে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। তিনি তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিয়া তাহাদের পরিচয় জানিতে চাহিলেন এবং তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার আবশ্যক আদেশ পত্র দেখিতে চাহিলেন। ক্ষুধার্ত হিংস্র পশুর মাংস পিণ্ড প্রাপ্তির মত তাহারা তাঁহাকে অতি অভদ্র আচরণে বিশ্রাম কক্ষে লইয়া গেল, এই রূপে বীর সাভারকর ১৯১০ সালে ১৩ই মার্চ ভিক্টোরীয়া ষ্টেশনে বন্দী হইলেন।

এই নাটকীয় গ্রেপ্তার বার্তা বিদ্যুৎগতিতে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। সশস্ত্র প্রহরী বেষ্টিত

কারাকক্ষে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। দুর্ভেদ্য কারা প্রাচীরের অন্তরালে মৃত্যুপথ যাত্রী সহকর্মীগণের জন্য মর্ম বেদনায় এযাবৎ মুক্তবায়ুতে বিচরণ করিলেও শ্বাসরুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। তাঁহাদের মত তিনিও যে বন্দীজীবন যাপন করিতেছেন এই আনন্দে গভীর নিদ্রাসুখ উপভোগ করিলেন, কেবল মাত্র শীত বস্ত্রের স্বল্পতায় এবং ইউরোপের প্রবল শৈত্যে দুই একবার নিদ্রার ব্যাঘাত হইয়াছিল মাত্র।

পরদিন বন্দীবীর বিচারালয়ে উপনীত হইলেন। বিচারালয়ে বিপুল জনসমাবেশ হইয়াছিল। যথারীতি অভিযোগ গঠিত হইল এবং বিচারকায্য সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ব্রিক্সটন কারাগারে অবরুদ্ধ রাখিবার নির্দেশ দেওয়া হইল।

ইউরোপ, আমেরিকা এবং পৃথিবীর অপরাপর দেশের আন্তর্জাতিক আইনজ্ঞ বিচারকগণ আইন ঘটিত জটিল তত্ত্ব সম্বন্ধে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। জার্মান, ফ্রান্স, চীন, আমেরিকা, ঈজিপ্ট, আর্য়ল্যাণ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রে বীর সাভারকরের জীবনী, বিপ্লবীয় রাজনৈতিক মতবাদ, কায্যক্রম এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ ও মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেও পৃথক বৃহৎ গ্রন্থ সংকলন করিতে হয়। কারাবাসকালে "অভিনব ভারত"-এর কর্মী ও অপরাপর বন্ধুগণ নিয়মিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং বন্দীদশা হইতে মুক্তির উপায় উদ্ভাবন বিষয়ে সাভারকর তাঁহাদের সঙ্গে যোগাযোগও স্থাপন করিয়া ছিলেন, অবশ্য সেই প্রয়াস ব্যর্থ হইলেও ব্রিটিশ সরকার কারাগারে সদাসর্তক প্রহরাধীন রাখিয়াও বিপ্লবী সাভারকরকে তাঁহার কায্যকলাপ হইতে সম্পূর্ণ বিরত রাখিতে পারেন নাই, সামান্য প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিয়া ছিলেন মাত্র। নানা স্থান হইতে তিনি কয়েকখানি গুপ্ত পত্রও পাইয়াছিলেন এবং গুপ্তপথেই প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন। বীর সাভারকরের বিচার যে ভারতের বিচারালয়েই হইবে ব্রিটিশ সরকার তাহা একপ্রকার স্থির করিয়াই রাখিয়াছিলেন। লণ্ডনে বিচারের নামে যে প্রহসন হইল তাহা সভ্যজগতের সাধারণ শিষ্টাচার রক্ষা করিয়া স্বীয় কলঙ্ক মোচনের প্রয়াস ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিলাতী আদালতে স্থির হইল ভারতবর্ষেই সাভারকরের বিচার হইবে। "অভিনব ভারত"-এর কর্মীগণ সাভারকরের বিচার পরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং প্রিভিকাউন্সিলেও আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। বীর সাভারকর বুঝিলেন তাঁহাকে ভারতে প্রেরণ করিবার উদ্দেশ্য চিরনির্বাসন অথবা মৃত্যুদণ্ড। তিনি ভারতে যাইতেছেন কিন্তু পরিজনবর্গের কাহারো সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে না। তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় যিনি ব্যাকুল, তিনি হয়ত এই সংবাদও অবগত নহেন। কবি সাভারকরের মানস-নয়নে ভাসিয়া উঠিল পারিবারিক জীবনের এক সকরুণ দৃশ্য—অগ্রজ আন্দামানে, অনুজ কারাগারে, ভ্রাতৃজায়া বিরহ বেদনায়, দারিদ্র্যের কষাঘাতে এবং শাসকের রোষানলে বিদগ্ধ চিত্তে সজল নয়নে অসীমের পানে চাহিয়া আছেন। সাভারকর একখানি পত্র লিখিয়া গুপ্তপথে ভ্রাতৃবধূর নিকট প্রেরণ করিলেন। তিনি জানিতেন ইহাই তাঁহার শেষপত্র, সেই জন্যই পত্রখানির শিরোনাম দিয়াছিলেন, 'শেষ অভিলাষ ও নিদর্শন'। সাভারকর পরিবারের মত একই পরিবারে

সকল মাতার দেশসেবায় স্বেচ্ছায় আত্মদানের দৃষ্টান্ত বিরল। তাঁহাদের এই অপূর্ব আত্মত্যাগের প্রেরণার সন্ধান পাওয়া যায় উক্ত পত্রে। পত্রখানির সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ ঃ-

(এক)

"তখন বৈশাখ মাস। ঊর্দ্ধে অসংখ্য নক্ষত্র শোভিত অনন্ত গগন, নিম্নে চন্দ্রালোক উদ্ভাসিত ধরাতল। জল সিঞ্চনে ক্ষুদ্র 'জৈ' লতিকা কুসুমিত, তার স্নিগ্ধগন্ধে গৃহ প্রাঙ্গণ ভরপুর।"

গ্রীষ্মকালীন অবকাশে সমবয়সী সুহৃদ এবং আত্মীয় বন্ধুগণে আমাদের গৃহ আনন্দে মুখরিত। ভাবিকালের শৌর্যও প্রতীভাদীপ্ত সেই তরুণগণের আলাপ আলোচনা মহোচ্চ ভাবেরই অভিব্যক্তি ছিল। শহরবাসীগণ ইহাকে সাদরে ধর্মসভা বলিয়া অভিহিত করিতেন।

আমরা সারিবদ্ধ ভাবে আহারে বসিয়া ছিলাম। কখনো সঙ্গীত, কখনো চিত্তাকর্ষক আলাপন, কখনো বা গভীর আলোচনায় মত্ত ছিলাম। আপনি আমাদিগকে রসনা তৃপ্তিকর বিবিধ আহার্য পরিবেশন করিতেছিলেন। আমাদের সেই আনন্দমুখর দিন এখনও আমার বেশ স্মরণ হইতেছে।

আমরা কখনো অযোধ্যার রাজপুত্রের বনগমন, কখনো বা ইটালীর মুক্তিকামী বীর যোদ্ধাদের বীরত্ব কাহিনী আলোচনা করিতে ছিলাম। তানোজীর অসীম সাহসিক কায্যাবলী এবং চিতোরের অমর কাহিনী আলোচনা করিতে করিতে ভারতের পরাধীনতার কারণ যখন অনুসন্ধান করিতে ছিলাম, তখন আমরা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই। মাতার বন্ধন মোচন কামনায় আমরা উদ্দীপ্ত এবং আত্মহারা হইয়া উঠিলাম।

সেই আনন্দময় দিনগুলি, সেই নির্মল চন্দ্রালোক, সেই প্রিয় সমাবেশ, সেই রোমাঞ্চকর আকাঙ্খা, অদম্য উদ্যম, অনমনীয় সঙ্কল্প, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, সর্বোপরি নির্যাতন সহনশীলতার কঠোর ব্রত গ্রহণ এখনো আমার স্মরণ হইতেছে। শৈশবে নির্মল চিত্তের সুদৃঢ় সঙ্কল্প এখনও আমাকে অনুপ্রাণিত করিতেছে।

সেই অতীত স্মৃতি কি আপনার স্মরণ আছে? মহাশক্তির নিকট শত শত যুবকের স্বেচ্ছা প্রণোদিত আত্ম নিবেদণের সেই কঠোর প্রতিজ্ঞা কি আপনি স্মরণ করিতে পারেন? বাজীর মত রণক্ষেত্রে ধরাশায়ী হইবার তরুণগণের ভীষণ পণ এবং চিতোরের বীরাঙ্গনাগণের স্মরণীয় ব্রত উদ্‌যাপনের মত তরুণীগণের সেই কঠোর প্রতিজ্ঞা কি আপনার মনে পড়ে?

আমরা ভ্রান্ত ধারণায় কিম্বা অন্ধ অনুকরণে ত্যাগের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হই নাই। ন্যায়শাস্ত্র, ইতিহাস এবং মানবতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া আমরা এই মহাসত্যই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, যাহার প্রাণ আছে তাহাকেই ইহা হারাইতে হইবে। আমরা আমাদের মহান কর্ত্তব্য বাছিয়া লইয়াছি এবং সর্বান্তকরণে তাহাই পালন করিব। মনে যখন সাধু সঙ্কল্প উদয় হইল তখন কর্মে ব্রতী হইয়াছি, এখন আপনাকে আমাদের বর্ত্তমান সম্বন্ধে অভিহিত করিতেছি—অদ্যাপি দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হয় নাই, তথাপি আমরা বহুদূর অগ্রসর হইয়াছি, সত্যই ইহা অপার আনন্দদায়ক এবং আশাপ্রদ।

(দুই)

সমগ্র দেশ এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জাগিয়া উঠিয়াছে, স্বদেশ জননী ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া কৃপাণ ধারণ করিয়াছেন; সহস্র সহস্র উপাসক মন্দিরের দিকে ধাবিত হইয়াছে এবং বেদীও লেলিহান অনল শিখায় পরিবৃত।

যে দেব সমীপে কঠোর প্রতিজ্ঞায় সত্য আবদ্ধ হইয়াছে, তার সেই মহামন্ত্র সাধনে পরীক্ষার দিন সমুপস্থিত। সর্বপ্রথমে সেই প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি প্রদান পূর্বক অমরতালাভ করিতে কে প্রস্তুত?

শ্রীরাম তাঁহার অনুগামীদিগকে অনুরূপ আহ্বান জানাইলে, আমাদের পরিজনগণই সর্বপ্রথমে অগ্রসর হইলেন। হে মহীয়সী ভগ্নি! স্বেচ্ছা প্রাণোদিতা হইয়া এই প্রার্থনাই করেন, জগদীশ আমরা এই স্থানে অপেক্ষা করিতেছি; আমাদিগকে সর্বপ্রথমে লেলিহান অগ্নিকুণ্ডে উৎসর্গ করিয়া আমাদের মানব জীবন সার্থক কর।

মহৎ কারণে মৃত্যু বরণ করিয়াও আমরা আমাদের কায্য সমাধান করিবার সঙ্কল্প রক্ষা করিয়াছি। এই দেখুন আমরা অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়াছি।

মুক্তি সংগ্রামে জীবন বিসর্জন দিয়াও জননীকে মুক্ত করিবার অঙ্গীকার আমরা পালন করিয়াছি। আমাদের সান্ত্বনা আমাদের উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হইয়াছে; অগ্নিদগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হইবার শক্তি তিনিই আমাদিগকে দিয়াছেন। আমরা আমাদের উদ্দেশ্য পালন করিয়াছি। ইহাই ছিল আমাদের সকলের লক্ষ্য।

(তিন)

হে মাতঃ, আমাদের চিন্তাধারা, অভিপ্রায় এবং বক্তব্য আপনার নিকট প্রকাশ করিলাম। আমার হৃদয় তন্ত্রী আপনার নিকটই ধ্বনিত হইল। আমার লেখনী আপনার নিকটই শব্দ বিন্যাস করিল।

হে দেবি, আমার স্বাস্থ্য ও সম্পদ একমাত্র তোমার বেদীতলেই উৎসর্গ করিয়াছি। আমার প্রত্যাবর্তন আকাঙ্খায় দীর্ঘকাল ধরিয়া তরুণী ভার্য্যার প্রতীক্ষা, কিম্বা প্রিয়পুত্রের সহাস্য বদন, অনশনক্লিষ্টা অসহায়া ভ্রাতৃবধূর মর্মবেদনা সেই মহৎ সংকল্প হইতে আমাকে বিভ্রান্ত করিতে পারে নাই। আমার অগ্রজ অসীম সাহসী, সঙ্কল্পে স্থির এবং স্নেহ পরায়ণ, তিনিও তোমার বেদীকায় আহুত হইয়াছেন। অনুজ সেও তাঁহাকেই অনুসরণ করিয়াছে। হে মাতঃ, এখন আমিও এইখানে তোমার যজ্ঞবেদীতে প্রাণবেদীতে প্রাণদানে প্রস্তুত আছি। ইহাতেই বা কি—যদি আমরা তিন ভ্রাতার পরিবর্তে সাত ভ্রাতা থাকিতাম সাতজনই তোমার উদ্দেশ্য সাধনে আত্মসমর্পণ করিতাম।

তোমার উদ্দেশ্য পবিত্র। তোমার উদ্দেশ্য দেব অভিপ্রায় বলিয়াই বিশ্বাস করি এবং সেই উদ্দেশ্য সাধন দেবারাধনা বলিয়াই শ্রদ্ধা করি।

ত্রিশ-কোটি তাহার সন্তান। সেই সন্তানদের মধ্যে যাহারা এই মহোচ্চভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আত্মোৎসর্গ করিবে তাহারাই মৃত্যু রহিত হইবে। হে ভগিনি, যদিও আমাদের বংশ বৃক্ষটি অনুরূপে নিষ্পত্র হয় তথাপি ইহার মূল সুগভীর প্রসারিত হইয়া অনন্তকাল কুসুমিত হইবে।

(চার)

আর যদি ইহা কখনো মুকুলিত না হয় অথবা পরিদৃশ্যমান অপরাপর বিনাশশীল পদার্থের মত অণুপরমাণুতে বিলুপ্ত হইয়া যায়, ক্ষতিই বা কি? অন্যায়ের ধ্বংস স্তূপে ন্যায় সৌধ নির্মাণের সংকল্প আমরা রক্ষা করিয়াছি—ত্যাগে আমাদের অধিকার, সেই অধিকার আমরা ক্ষুণ্ণ করি নাই। ইহাই যথেষ্ট। আমাদের নিকট ত্যাগইত সফলতা।

আমাদের এই অর্ঘদানে বিশ্বনিয়ামক যদি প্রীত হন এবং শুভাশীষ দান করেন, তাহা আপনারই প্রাপ্য।

স্নেহ পরায়না বৌদি, আমাদের বংশগত ভাবধারা এইরূপে চিন্তা করেন, অনুসন্ধান করেন এবং প্রতিপালন করেন। নীহার-কর্দমে গিরিরাজ কন্যা উমার কঠোর তপস্যা এবং চিতোর বালিকাদের সহাস্য বদনে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি আপনার আদর্শ। আপনি বীরের সহধর্মচারিণী, বীরাঙ্গনা। হিন্দুসমাজের কমল- কোমল প্রাণাগণও যেই শক্তি ও সৎসাহসের অধিকারিণী তাহা যে এখনো ক্ষীণতর বা নিষ্প্রভ হইয়া যায় নাই তাহা প্রমাণ করিতে আপনি অবশ্যই সক্ষম।

ইহাই আপনার নিকট আমার শেষ কথা, শেষ অভিপ্রায় এবং শেষ নিদর্শন। বিদায়—বিদায়—বৌদি,—বিদায়; আমার প্রিয়তমা পত্নীকে আমার অকৃত্রিম ভালবাসা জানাইয়া বলিবেন যে অন্ধ বিশ্বাসে ভ্রান্ত অনুকরণে, এই পথে পদক্ষেপ করি নাই। তর্কশাস্ত্র, ইতিহাস এবং মানবতত্ত্ব উত্তমরূপে বিশ্লেষণ করিয়া এই সত্যই উপলব্ধি করিয়াছি যে, এই বিশাল বিশ্বে আমরা মৃত্যুপথযাত্রী মাত্র। দুঃখ-কষ্ট-নির্যাতন-নিগ্রহ-নিপীড়ণ সহনশীলতা বাছিয়া লইয়াছি এবং নির্ভীক হৃদয়ে চির উন্নত শিরে তাহাই বহন করিয়াছি।"

ব্রিটিশ সরকার ভারত জননীর এই বিপ্লবী সন্তানকে করায়ত্ত করিয়া নিখিল বিশ্বের প্রশংসা অর্জনে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল। বীর সাভারকরের প্যারীস হইতে ইউরোপে প্রত্যাবর্তন ভিত্তি করিয়া স্বকল্পিত নানা উপাখ্যানের সৃষ্টি করিল। কেহ বলিল, আর্থিক অনটন, কেহ বলিল লণ্ডন স্থিত তাম্রকেশী-শুভ্র-অংগ পিংগল-নয়না প্রণয়িনীর আকর্ষণে লণ্ডনে আসিতে ছিলেন। কিন্তু গোয়েন্দা বিভাগ সকলের উপর টেক্কা মারিয়া প্রচার করিল যে, তাহারাই সাভারকরের বিশ্বস্ত বন্ধুর নামে মিথ্যা পত্র লেখিয়া আনয়নে সমর্থ হইয়াছেন। পণ্ডিত শ্যামজীও 'টাইমস্' পত্রিকায় কঠোর মন্তব্য ও সমালোচনা প্রকাশ করিয়া এই সব মিথ্যা প্রচারের যথোপযুক্ত উত্তর দিলেন।

(পাঁচ)

'বিদেশী তুমি মোরে আর কি দেখাও ভয়,
দেহ তোমার অধীন বটে মন ত স্বাধীন রয়।
হাত বাঁধবে, পা বাঁধবে ধরে না হয় জেলে দিবে—
মন কি ফিরাতে পারবে এত শক্তি ময়।'

-মুকুন্দ দাস

'মরিয়া না মরে রাম, এ কেমন বৈরী' ত্রিভুবন বিজয়ী রাবণ দেবতাদিগকে গৃহভৃত্য নিযুক্ত রাখিয়াও শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে নিগৃহীতই হন নাই, নিহতও হইয়াছিলেন। ব্রিটিশ সরকার উদয়-অস্তহীন সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া জলে স্থলে নভেঃ একাধিপত্য বিস্তার করিয়া তাহারই শাসনাধীন ভারতের এই খর্বাকৃতি ক্ষীণকায় যুবককে লইয়া বড়ই বিব্রত হইলেন। বীর সাভারকর যতদিন মুক্ত ছিলেন, ততদিন দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না এবং গ্রেপ্তার করিয়াও আর এক নূতন দুশ্চিন্তায় পড়িলেন।

বীর সাভারকরকে কোন পথে এবং কিরূপে ভারতে প্রেরণ করিবেন ইহাই এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করিয়া ফ্রান্সের ভিতর দিয়া—মার্সেলিস্ পোতাশ্রয় হইয়া ভারতে আসিবার সহজ পথ, কিন্তু এই পথে অগ্রসর হইতে ব্রিটিশ সিংহ সাহসী হইল না। কারণ বীর সাভারকর রাজনৈতিক বন্দী, সুতরাং ফরাসী অধিকৃত অঞ্চলে আসিলে ''অভিনব ভারত''-এর কর্মীগণ, বিশেষতঃ পণ্ডিত শ্যামজী, ফরাসী সরকারকে 'হেবিয়াস কোর্পাস' প্রয়োগে প্রভাবান্বিত করিতে পারেন, এই আশঙ্কায় উক্ত পথ পরিত্যক্ত হইল এবং অনেক চিন্তার পর ইহাই স্থির হইল যে, যথাসম্ভব বৈদেশিক সংশ্রব পরিহার করিয়া বিস্কো উপসাগর হইতে বরাবর ভারত অভিমুখে যাত্রা করিবে।

এই উদ্দ্যেশে 'মেরিয়া' নামক যাত্রী বাহী জাহাজখানি রণতরীতে পরিণত করা হইল। আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সর্বাপেক্ষা দুর্দ্ধর্ষ ও বিচক্ষণ কর্মচারিগণের রক্ষণা-বেক্ষণে এবং তাহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য ভারত হইতে আনিত একদল বিশেষ রক্ষী বাহিনীর প্রহরাধীনে বিশ্ব বিশ্রুত বিপ্লবী সাভারকরকে ভারত অভিমুখে প্রেরণ করিল ১৯১০ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ২৬ বৎসর, ২২ বৎসর বয়সে তিনি লণ্ডন গমন করেন। মাত্র এই চারি বৎসরে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর মনে কিরূপ সন্ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে ভারতে প্রেরণের সতর্কতা—অতি সতর্কতা হইতেই বুঝিতে পারা যায় এবং সাভারকরের ব্যবহারের জন্য বিশেষরূপে নির্মিত উক্ত জাহাজের শৌচাগার হইতে ঐ সতর্কতা খানিকটা অনুমান করা যায়। শৌচাগারের ভিতরের দেওয়ালে এবং বাহিরের বারান্দায় দর্পণ এইরূপ ভাবে সংরক্ষিত ছিল যে ভিতরের দৃশ্য বাহিরের দর্পনে প্রতিফলিত হইত। বলা বাহুল্য মাত্র যে, সাভারকর শৌচাগারে গমন করিলে বাহিরের দর্পণে সান্ত্রী প্রহরারত থাকিত। ডাকিয়া আনিতে বলিলে কি প্রকারে বাঁধিয়া আনিতে হয় তাহা এই সৈনিক পুরুষেরা ভাল ভাবেই জানিত এবং ইহাও তাঁহারা বিলক্ষণ জানিত যে, তাহাদের এই বন্দী অতিশয় দুর্দমনীয় এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান—যে কোন মুহূর্তে মহাবিপর্যয় ঘটাইতে পারেন, সুতরাং তাহারাও চব্বিশ ঘন্টা প্রয়োজনের অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করিয়া স্বীয় কর্তব্য পালনে ক্রটি করিল না। ব্রিক্সটন কারাগার হইতে আসিবার দিন বীর সাভারকর ইউরোপীয় এবং ভারতীয় কয়েকজন বন্ধুর কয়েকখানা মর্মস্পর্শী পত্র পাইলেন। কারাকক্ষ হইতে বহির্গত হইবার ঠিক অব্যবহিত পূর্ব মুহূর্তে কারাকর্তৃপক্ষের অগোচরে পত্রের উত্তর ফরাসীতে পাঠাইয়া দিলেন। ব্রিটিশ-প্রাজ্ঞ বিজ্ঞ কূটনীতিজ্ঞগণ এবং আন্তর্জাতিক

শান্তি রক্ষক গোয়েন্দা দিগকে এই ক্ষীণকায় খর্বাকৃতি ভারতীয় তরুণ বিপ্লবীর উপস্থিত বুদ্ধির নিকট যে সর্বদা পরাভব হইতে হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

'ক্লৈব্যং মাস্মগম পার্থ।'

বীর সাভারকর জাহাজে আরোহণ করিবার পর হইতেই মুক্তির উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। বন্দীদশাকে বিধি-লিপি বলিয়া গ্রহণ করিতে, কিম্বা শত্রুর মৃত্যুদণ্ড অসহায় বালকের মত মাথা পাতিয়া লইতে তাঁহার বিপ্লবীমন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তিনি স্থির করিলেন, সৈনিক দিগকে নির্বোধ প্রতিপন্ন করিয়া মুক্ত হইবেন অন্যথায় আত্মহত্যা করিয়া স্বাধীন ভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবেন। বিপ্লবী বীর সাভারকর ভাবিতে লাগিলেন, ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় বিপ্লবীকে—"অভিনব ভারত"-এর অধিনায়ক-কে মুষিকের মত অতি সহজেই ধরিয়া ফেলিয়াছে, এই কলঙ্ক মুক্ত হইতে হইবে। প্রমাণ করিতে হইবে, ভারতীয় বিপ্লবীকে ধরা সহজ, কিন্তু ধরিয়া রাখা সাধ্যাতীত। দুর্জয় সাহসে ভারতীয় বিপ্লবী হইবে বিশ্বের বিস্ময়কর উদাহরণ। স্বকীয় কায্যকলাপে ভারতীয় বিপ্লবী জগতের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিবে, কিন্তু কি প্রকারে তাহা সম্ভব? ব্রিক্সটন কারাগারে আবদ্ধ থাকাকালে বহু উপায় উদ্ভাবন করা হইয়াছিল, কোনটাই সফল হয় নাই। তখন সহায়ক ছিল, অর্থ ছিল, এখন তার কোনটাই নাই, এমন কি, কাহারো সঙ্গে মুখের কথাটি পর্যন্ত বলিবার কোন উপায় নাই; আছে শুধু ছায়ার মত পায়ে পায়ে সান্ত্রী, চারিদিকে নিমেষে প্রাণ সংহারক আগ্নেয় অস্ত্র, হাতে পায়ে বাঁধা লোহার শিকল, আর সামনে পিছনে অনন্ত জল প্রবাহ—নিরাপদ আশ্রয় দুর্লভ।

এইরূপ পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির মধ্যেও বীর সাভারকর সকলের অজ্ঞাতসারে দুইবার আত্মহত্যা করিতে প্রয়াসী হইয়া ছিলেন, কিন্তু আবার ভাবিলেন—মৃত্যু সে ত তুচ্ছাদপি তুচ্ছ—বাঁচিতে হইবে জীবন ব্রত সফল করিতে হইবে, ভারত মাতার বন্ধন মোচন করিতে হইবে। বিপ্লবীর অসাধ্য কিছু নয়—দুর্লভ কিছু নয়। বিপ্লবের বিপদ সঙ্কুল দুর্গম পথেই যখন বহির্গত তখন ইহার শেষপ্রান্তে উপনীত হইতে হইবে। এইরূপ ভাবতরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে উচ্ছলিত মনে পড়িতেছিল মার্সেলিস্ বন্দরের কথাই। কোন প্রকারে উক্ত বন্দরে পৌঁছিতে পারিলে বাঁধন ছিঁড়িয়া জীবন সাধনা সার্থক করিতে পারিবেন, ইহাই ছিল তাঁহার দৃঢ় ধারণা। কিন্তু মার্সেলিসে পৌঁছিবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না।

অকস্মাৎ জাহাজখানির যান্ত্রিক বিকৃতি ঘটিল, সুতরাং পূর্বনির্দ্ধারিত পথ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল এবং ক্রমশঃ জিব্রালটার অতিক্রম করিয়া মার্সেলিস্ পোতাশ্রয়ে গতিরুদ্ধ হইল। বিপ্লবী সাভারকর ইহাতে আনন্দিতই হইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, নিশ্চয় তাঁহার কোন ফ্রান্সস্থিত বন্ধু তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য উপস্থিত থাকিবেন। কিন্তু ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ থাকিয়া দৃষ্টিশক্তি যতদূর পরিচালিত করিতে পারিলেন কোথাও কোন পরিচিত ব্যক্তি দেখিতে পাইলেন না। অধিকন্তু, তাঁহার প্রতি সতর্কতা আরো কঠোরতর হইল।

ক্রমশঃ রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিল, আর কয়েক ঘন্টা পরেই জাহাজ বন্দর ছাড়িবে,

মুক্তিলাভের কোন উপায় থাকিবে না; সুতরাং নিশার আঁধার থাকিতেই মুক্তি লাভের জন্য তিনি উদ্যোগী হইলেন। তাঁহার বিদ্রোহী মন ডাকিয়া বলিল, এখনই অন্যথায় আর কখনো নয়। কিন্তু পুনরায় ভাবিলেন বিফল হইলে এই নিষ্ঠুর সৈনিকের হাতে আরো লাঞ্ছিত হইতে হইবে এবং তাঁহার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ আইনত আরো বলবৎই হইবে। এ যাবৎ তিনি এইরূপ সতর্কতা ও কৌশলের সঙ্গে কায্য করিয়াছেন যে, তাঁহার বিরুদ্ধে কোন **প্রত্যক্ষ** অভিযোগ নাই। এমন কি ভারতীয় পুলিশ তাঁহার সহকর্মীগণের স্বীকার–উক্তিতেও তাঁহার বিরুদ্ধে যেই সব তথ্য উদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহাতেও যদি কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, তাহা সাত বৎসর কারাদণ্ড বা অনুরূপ দণ্ডই বিধান যোগ্য। কিন্তু দুর্জয় সাহসে নির্ভর করিয়া যদি আত্মগোপনে সচেষ্ট হন তাহা হইলে চরম দণ্ডেই দণ্ডিত হইবেন। সুতরাং, স্বীয় ব্যর্থতা রাজদরবারে নির্মমতায় পরিণত হইবে। আর এই সৈনিকেরা যদি গুলি করে, ক্ষতিই বা কি? ইহাইত বিপ্লবীর কাম্য। আর যদি সফলতা লাভ করেন, কিম্বা আংশিকভাবেও কৃতকায্য হন তাহা হইলে বিশ্ববাসী বুঝিতে পারিবে যে, ভারতীয় বিপ্লবী হীনবল নয়, নির্বোধ নয়। চেষ্টা ও উদ্যমের দ্বারাই ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। সুতরাং এখনই অন্যথায় আর কখনো নয়। ('Now or never')

বিপ্লবী সাভারকর তাঁহার স্বভাব সুলভ মৃদু হাস্যে প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোমরা কি আমাকে শৌচাগারে যেতে সাহায্য করবে?'

প্রহরী সম্মত হইল।

কিন্তু বীর সাভারকর বিস্ময়াপন্নভাবে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'সে কি— তোমরা কি তোমাদের উপর ওয়ালাকে জানাবে না? তার অনুমতি নিবে না?'

উর্দ্ধতন কর্মকর্তার অনুমতিক্রমে তাহারা তাঁহাকে শৌচাগারে পৌঁছাইয়া দিল। সাভারকর চিন্তা করিতে লাগিলেন—এখন উপায়—কিন্তু কোন উপায় তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না। মুক্তির ব্যাকুল বাসনা, নিস্কৃতির তীব্র আকাঙ্খা, বেদনাভরা প্রাণের আবেগ বক্ষপিঞ্জরে গুমরাইয়া উঠিল স্বাধীন ফরাসী রাজ্যের মৃত্তিকা স্পর্শ করিবার জন—স্বাধীন ফরাসী দেশের মুক্ত বায়ুতে হৃদয়ের জ্বালা নিবারণ করিতে কিন্তু কোন পথ খুঁজিয়া পাইলেন না। সহসা তাঁহার চোখে পড়িল ছাদে বায়ু চলাচলের জন্য একটি ছিদ্র তার পার্শ্বে একটি হুক। তিনি অনুমান করিলেন ঐ ছিদ্রমধ্যে দেহ প্রবেশ হইতেপারে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলেন প্রহরীরা কেহ সামুদ্রিক সৌন্দর্য দেখিতেছে, কেহ বা দর্পণে মুখশ্রী অবলোকন করিতেছে। তিনি চকিতে পরিহিত 'স্লিপিং ড্রেস' খুলিয়া ভিতরের দর্পণ ঢাকিয়া ফেলিলেন এবং অপর একটি পোষাক হুকের সঙ্গে বিলম্বিত করিয়া তারই অবলম্বনে উপরে উঠিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না, বুক কাঁপিয়া উঠিল—হাত পা যেন শক্তিহীন হইয়া পড়িল। মুহূর্তমধ্যে এই ভীরুতা—এই চিত্ত দৌর্বল্য পরিহার করিয়া পুনরায় সচেষ্ট হইলেন—এইবার ছিদ্রের মুখে আসিলেন বহুকষ্টে ছিদ্রপথে দেহের উপর অংশ টানিয়া বাহির করিলেন কিন্তু নিম্ন অংশ আটকাইয়া যাওয়ার 'প্যান্ট' খুলিয়া ফেলিলেন এবং ছাদের উপরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, নিমেষে চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া অসীম সাহসে নির্ভর করিয়া **সমুদ্রের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।**

'তোর শিকল আমায় বিকল করবে না।
তোর মারে মরম মরবে না।'

ক্ষণ অতীত হইল। প্রহরী দ্বারে আঘাত হানিল। গম্ভীর কণ্ঠে হাঁকিল দরজা খোল। কিন্তু কেহ নাহি দিল সাড়া। প্রহরীর সন্দেহ হওয়ায় পদাঘাতে দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। যাহা দেখিল বিশ্বাস করিতে পারিল না। ভৌতিক কাণ্ড বলিয়া মনে হইল। প্রহরী ভয়ার্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই চীৎকারে অন্যান্য কর্মচারীরা ছুটিয়া আসিল। জাহাজের বিপদ সংকেত ঘন্টা বাজানো হইল। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিতে পাইল বিপ্লবী সাভারকর কখনো উত্তাল তরঙ্গ শীর্ষে উত্থিত হইয়া কখনো বা তরংগদ্বয়ের মধ্যবর্তী নিম্নদেশে নিমজ্জিত হইয়া চলিয়াছেন ফরাসী উপকূলে। সৈনিকদের মধ্যে কাহারও সাহস হইল না যে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আসামী ধরিয়া আনে সুতরাং পলায়নপর বন্দীকে লক্ষ্য করিয়া সৈনিক তার অভ্যর্থ হাতের গুলী নিক্ষেপ করিল। সেই শব্দ শুনিয়া বীর সাভারকর ডুব সাতার দিয়া দৃষ্টির অগোচরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্মচারী এবং ভারতীয় সৈনিকগণ 'লাইফ বোটের সাহায্যে তীরে অবতরণ করিয়া বিপ্লবী সাভারকরকে অনুসরণ করিতে লাগিল, বীর সাভারকরও উপকূলে উপস্থিত হইয়া ফরাসী দেশীয় আইনের আশ্রয় লাভের জন্য 'ডক ওয়াল' স্পর্শ করিলেন। কারণ 'ডকওয়াল' স্পর্শকরা তীরভূমিতে অবস্থানের সমতুল্য। নাসিকে অবস্থান কালে গুপ্ত সমিতির প্রত্যেক সদস্যকেই পর্বত আরোহণ শিক্ষালাভ করিতে হইত। সুতরাং তিনিও দ্রুত পর্বতারোহণে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। মার্সেলিসের 'ডকওয়াল' যেমন উঁচু তেমনি খাড়া। 'ডকওয়ালে' আহোরণ করিতে তাঁহার বিশেষ কষ্ট সাধ্যই হইল। কিছুদূর উঠিতেছেন আর গড়াইয়া পড়িতেছেন, এইরূপ ভাবে অবশেষে উপরে উঠিতে সমর্থ হইলেন। স্বাধীন জাতির বাসভূমিতে দাঁড়াইয়া মুক্ত বায়ু সেবন করিয়া তিনি ক্লান্তিদূর করিতে লাগিলেন। রাশিয়ান বিপ্লবীর অসীম সাহসিক কায্যকলাপ তাঁহার স্মরণ হইল এবং তিনিও যে অনুরূপ কায্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন তার জন্য আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন কিন্তু অধিক্ষণ এই আনন্দ অনুভব করিতে পারিলেন না। তিনি দেখিতে পাইলেন, তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া ইংরাজ সৈনিকগণ ছুটিয়া আসিতেছে—আর চিৎকার করিতেছে,—'চোর—চোর পালাচ্ছে ধরে দেও ধরে দেও।' বীর সাভারকর পরিষ্কার বুঝিলেন আইনের সূক্ষ্মতত্ত্ব নিরাপদ নহে এবং ক্রুদ্ধ সৈনিকগণ ফরাসী দেশীয় আইন লংঘন করিতে বিন্দুমাত্র ইতঃস্তত করিবে না। পশ্চাৎ ধাবিত উদ্ধত সৈনিকগণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইবে কিন্তু ভাবিবার অবকাশ নাই সন্তরণে এবং ডক আরোহনে দেহক্লান্ত অবসন্ন কিন্তু বিশ্রামের এতটুকু সময় নাই। মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া ফরাসী পুলিশের সন্ধানে তিনিও সন্মুখে দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন। চোখের সামনে ট্রাম, বাস তাহাতে আরোহণ করিয়া নিমেষে অন্তর্ধান করিতে পারেন কিন্তু একটি কানাকড়িও সঙ্গে নাই। সুতরাং প্রাণপনে দৌড়াইতেছেন আর চিৎকার করিতেছেন—পেনি—পেনি—একটি পেনি, কে আছ বন্ধু কে আছ দরদী একটি মাত্র একটি পেনি দিয়ে বিপন্নকে সাহায্য কর, রক্ষা কর.......।

অন্ধকারের অন্তরালে পোতাশ্রয়ের অদূরে 'অভিনব ভারত'-এর দুই জন কর্মী ট্যাক্সী লইয়া সন্ধানী দৃষ্টিতে অপেক্ষা করিতে ছিলেন প্রিয় নেতার দর্শন আশায়। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন সাভারকরের মত ধীশক্তি সম্পন্ন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান বিপ্লবী নিশ্চয় কোন প্রকারে তীরে অবতরণ করিতে সমর্থ হইবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সীতে উঠাইয়া উধাও হইবেন। তাঁহারা কিন্তু কিছুই জানিতেপারিলেন না। নির্মম নিয়তির ইহা অপেক্ষা আর নিষ্ঠুর পরিহাস কি হইতে পারে? সত্যই প্রতিনিয়ত নিয়তি চক্রবৎ পরিবর্ত্ততে।

ছিদ্রের ভিতর দিয়া যাহাতে সহজে গলাইয়া আসিতে পারেন তার জন্য তিনি পরিধেয় সমস্ত পোষাক খুলিয়া ফেলিয়াছিলেন, সুতরাং অন্তর-বাস মাত্র পরিহিত অবস্থায় তিনি দৌড়াইতে ছিলেন। তাঁহার সর্বাংগে তখনো কাদা মাটি লাগিয়াছিল। স্বপনপুরীর অধিবাসী কেহ দ্রুত পদে কর্মস্থলে চলিয়াছে; কেহ প্রভাতী বায়ু সেবনে বহির্গত হইয়াছে, এই দৃশ্য দেখিয়া তাহারা হতভম্ব হইল, কেহ বা কৌতূহল অনুভব করিল। তাহারা ভাবিয়াছিল হয়ত জাহাজের কোন খালাসী পলাইতেছে আর সৈনিকগণ পশ্চাৎ ধাবন করিতেছে (অনুরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিত)। আর কয়েকগজ মাত্র ব্যবধান, সৈনিকেরা ধরিয়া ফেলিল প্রায়— সাভারকর চেঁচাইতেছেন পুলিশ—পুলিশ কোথায় পুলিশ আর তীব্রবেগে ছুটিতেছেন। ধাবমান সৈনিকেরাও চেঁচাইতেছে চোর—চোর—ধরে দাও চোর। এইরূপে বন্য পশুবৎ বিতাড়িত হইয়া বহুদূর অগ্রসর হইলেন। সহসা একজন ফরাসী পুলিশ দেখিতে পাইয়া তিনি তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ফরাসী ভাষায় বলিলেন, 'আমি পলাতক আসামী কিম্বা খালাসী নই। আমি একজন ভারতীয় বিপ্লবী। ঐ দেখ, ইংরাজ সৈনিকগণ অন্যায় ভাবে তোমাদের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে বলপূর্বক ধরিয়া লইতে আসিতেছে। তোমাদের আইনের মর্য্যাদা লংঘন করিয়া তোমাদের রাজশক্তিকে অবজ্ঞা করিতেছে। এই অন্যায় তুমি উপেক্ষা করিবে? তুমি ফরাসী হইয়া ইংরাজের এই অপমান নিজ দেশে দাঁড়াইয়া চক্ষু বুজিয়া সহ্য করিবে? তোমার কর্ত্তব্য তাহারা যাহাতে আমাকে তোমাদের আইন তাচ্ছিল্য করিয়া লইয়া যাইতে না পারে তাহাতে বাধা দেওয়া। তোমাদের কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আমাকে উপস্থিত কর, তিনি আমার বিচার করিবেন।'

ইত্যবসরে ইংরাজ সৈনিকগণও তথায় আসিয়া পৌছিল এবং তাহাদের আসামীকে ছাড়িয়া দিবার দাবী জানাইল। ফরাসী পুলিশ তাহাতে আপত্তি করিল। কিন্তু 'ধন দিলে কিনা মিলে হ'য়ে ধনেশ্বর।' ইংরাজ সৈনিকগণ ফরাসী পুলিশের হাতে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা তুলিয়া দিল। তাহা পাইয়া সে মনের আনন্দে ধীরে ধীরে স্থান ত্যাগ করিল। সহায় সম্পদহীন ভারতীয় বিপ্লবীকে ইংরাজ 'কমেগুার' জাহাজে যাইবার জন্য আদেশ করিলেন। অবশেষে ১২ জন সৈনিক বলপূর্বক ধরিয়া তাঁহাকে টানিতে টানিতে পোতাশ্রয়ের দিকে লইয়া চলিল। সাভারকর তাহাতেও যথাশক্তি বাধা দিলেন। এইরূপ ধস্তাধস্তি করিয়া পথ চলিতে চলিতে অকস্মাৎ জনৈক সৈনিক পশ্চাৎ দিক্ হইতে তাঁহার মাথায় এক ঘুষি মারিল। এই নিদারুণ ব্যর্থতায়—এই আঘাতে তিনি সামান্য পবন ভরে বেতসের মত নত হইয়া পড়িলেন না। চলিতে চলিতে হঠাৎ আচমকা টানে সৈনিকদের কবল মুক্ত হইয়া আঘাতকারীর ঘাড়ের

উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে ভুতলশায়ী করিলেন এবং মাটিতে মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে বলিলেন, 'তোমাদের দু-চারি জনকে না মারিয়া আমি মরিব না। আমি মারতেও জানি এবং মরতেও পারি।'

'সিংহ শাবক ক্ষুদ্র হ'লেও
মদ-বিমলিন হাতীরে হানে
শক্তি মানের প্রকৃতি ইহাই
বিক্রম কভু বয়স মানে?'

বলাবাহুল্য মাত্র যে, পথে তাহারা তাঁহাকে আর কোন প্রকারে উৎপীড়ন করিতে সাহসী হইল না। কারণ হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ সেনাগণ বুঝিয়াছিল যে, তাহাদের এই ক্ষীণকায় খর্বাকৃতি বন্দী মৃত্যুর পূর্বে অন্তত দুইচারি জনের প্রাণ সংহারে সমর্থ। সদ্য ব্রংকাইটিস্ রোগ ভোগ করিয়া উঠিয়াছেন, তদুপরি সাঁতারকাটা, উচ্চ-'ডকওয়ালে' উঠা, দীর্ঘপথ দৌড়ান এবং ধস্তাধস্তির ফলে জাহাজে পৌঁছিয়া অবসন্ন, অচৈতন্য হইলেন। পৌঁছান মাত্রই তাড়াতাড়ি নংগর খুলিয়া সিড়ি উঠাইয়া জাহাজ ছাড়িয়া দিল।

সাভারকর যখন সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইলেন তখন দেখিলেন তিনি ক্ষুদ্র একটি প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ, হাত পা শিকলে বাঁধা, চারিদিকের দেওয়ালে দোদুল্যমান কোষমুক্ত অসি। বিপ্লবী সাভারকর বুঝিলেন এখন হইতে ঘোরতর লাঞ্ছনার জন্যই তাঁহাকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সামরিক কর্মচারীগণ এইরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে হেয় ও নির্বোধ প্রতিপন্ন হওয়ায় তাঁহার প্রতি অতিশয় রুঢ়-ক্রুর-নির্দয়-নিষ্ঠুর অত্যাচার উৎপীড়ন আরম্ভ করিল এবং অহরহ অধিকতর নিষ্ঠুরতার ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিল। মাত্র চারি ফিট পরিমিত ক্ষুদ্র কক্ষই তাহার ভ্রমণ, উপবেশন এবং শয়নের জন্য নির্দ্ধারিত হইল। শক্তিশালী বৈদ্যুতিক আলোতে ঐ ক্ষুদ্র কক্ষ সর্বদা উত্তপ্ত। বাহিরে সমুদ্রের শীতল বাতাস আর ভিতরে অসহ্য গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত। স্নানাগারেও সৈনিকগণ তাঁহার লৌহ শৃংখলিত হস্তদৃঢ়ভাবে ধারন করিয়া রাখিত।

রাত্রিকাল। সমুদ্রের বুকের উপর জাহাজ ছুটিয়া চলিয়াছে। অর্দ্ধ শায়িত অবস্থায় বিপ্লবী সাভারকর মুদ্রিত নয়নে ভাবিতেছেন ভারতের মুক্তি সংগ্রামে আমি একজন সৈনিক, শেষ রক্ত বিন্দু দিয়াও আমি সংগ্রাম করিব। জননীকে বন্ধন মুক্ত করিব। এমন সময় শুনিতে পাইলেন একজন শ্বেতাঙ্গ সৈনিক তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে, 'এই সাভারকর জাতটা কি পাজি।' ইহা শুনিয়া বীর সাভারকর ধীরে চক্ষু মেলিয়া একবার তাকাইলেন মাত্র, কিছুই বলিলেন না। সাভারকরকে নিরুত্তর দেখিয়া উক্ত সৈনিক পুনরায় বলিতে লাগিল আরো কঠোর শাস্তি দেওয়া দরকার। বীর সাভারকর এইবার উঠিয়া বসিলেন এবং তাঁহার স্বভাব সুলভ মধুর কণ্ঠে বলিলেন, 'তোমরা দিন রাত্রি ভয় দেখাও কাহাকে? তোমাদের সঙ্গে আমার তুলনা করিও না। তোমাদের সংসার স্ত্রী পুত্র সকলেই আছে, তোমরা দুনিয়াটাকে ভোগ করিতেই চাও। আমার ঐ সব বালাই নাই। তোমরা মরিতে ভয় পাও আর মৃত্যু

আমার খেলার সঙ্গী। সুতরাং আমার উপর খড়্গহস্ত হওয়ার পূর্বে তোমাদের নিজেদের জীবন সম্বন্ধে একবার ভাবিয়া দেখিও।' উক্ত সৈনিক বলিতে লাগিল—না-না-রাগ করিবেন না। আমি তেমন কিছু বলি নাই। দয়া করিয়া একবার ভাবিয়া দেখুন পূর্বে আমরা আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করি নাই। আমাদের মনিবের নিকট আপনি যে ভাবে আমাদিগকে অকর্মণ্য ও অনুপযুক্ত প্রতিপন্ন করিয়াছেন তাহাতে যদি আমাদের চাক্‌রী যায় ছা পোষা সংসারে কি বিপদে পড়িব বলিতে পারেন। আপনি কি আমাদের মুখের খাবার নষ্ট করেন নাই।' বীর সাভারকর বলিলেন, 'তোমাদের যেমন স্ত্রী পুত্র আছেন, আমারও ত তেমনি প্রিয়জন আছেন। তাহারাও ত আমার দিকে চাহিয়া আছেন। তোমরা আমাকে শাস্তি দিবে, আর আমি কি মুক্তি লাভের চেষ্টা করিব না। তোমরা তোমাদের কর্ত্তব্য করিতেছ আমিও আমার কাজ করিয়াছি তাহাতে রাগ করিবার গালাগালি দিবার কি আছে? আমি ত তোমাদের সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার করিতেছি না।'

ইহার পর হইতে তাহারা খানিকটা সদয় ব্যবহার আরম্ভ করিল। কোষ মুক্ত অসি এবং উচ্চ শক্তি সম্পন্ন আলো অপসারণ করিল।

অবলীলাক্রমে উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গ করিয়া উদ্দাম গতিতে জাহাজ ছুটিয়া চলিয়াছে ভারতের দিকে। যখন এডেন বন্দরের সমীপে উপস্থিত হইয়াছে তখন ভীষণ ঝটিকা প্রবাহে বারিধিতরঙ্গ ভয়াল ভয়ঙ্কর রুদ্রমূর্তী ধারণ করিয়া আকাশ স্পর্শ করিবার জন্য আস্ফালন করিতে লাগিল। গগনস্পর্শী তরঙ্গশীর্ষে বাষ্পীয় পোত প্রলয় নৃত্যে মাতোয়ারা হইয়া উঠিল। তাণ্ডব নৃত্যপরায়ণ বারীন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বিদ্রোহী সাভারকরের বিক্ষুব্ধমন বলিতে লাগিল—হে প্রভঞ্জন বৈরী, একদিন ওয়েল্‌সের সাগর সৈকতে উপবেশন করিয়া তোমার নিকট সকাতরে প্রার্থনা করিয়াছিলাম আমাকে স্বদেশে লইয়া যাও, তোমার বাহুপ্রবাহে আমাকে পৌঁছাইয়া দেও স্নেহময়ী জননীর কোলে। আজ আবার প্রার্থনা করি, শত্রুর এই আবেষ্টন হইতে—এই উত্তপ্ত কক্ষ হইতে—শত্রুর ভ্রূকুটি হইতে ছিনাইয়া লইয়া যাও, ডুবাইয়া দেও তোমার চিরশীতল অনন্ত অভ্যন্তরে। পরাজয়ের গ্লানি শিরে তুলিয়া দিয়া জননীর কোলে লইয়া যাইও না। অসহায় বন্দীকে শত্রুর হস্তে সমর্পণ করিও না, দয়াহীন শত্রুর নির্ম্মমতা পূর্ণ করিতে দিও না।'

(ছয়)

'বিচার শালার খেলা ঘরে আর,
না রহিব অবরুদ্ধ।'
—রবীন্দ্রনাথ

১৯১০ সালে ২২ শে জুলাই জাহাজ বোম্বাই বন্দরে পৌঁছিল। স্বর্গাদপী গরিয়সী জননী জন্মভূমির কোলে ফিরিয়া আসিবার জন্য যেই বীর পুরুষ উৎকণ্ঠিত ছিলেন। অবশেষে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। 'অভিনব ভারত'-এর সর্বাধিনায়ক অবতরণ করিলেন এক অভিনব পরিস্থিতির মধ্যে। মুখ মণ্ডল কৃষ্ণ আবরণে আবৃত, হস্তপদ শৃংখলিত, উভয় পার্শ্বে সারিবদ্ধ সশস্ত্র শ্বেতাঙ্গ প্রহরী পথে। জাহাজ পৌঁছান মাত্র বীর সাভারকর তীর ভূমিতে আনিত

হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে মোটর গাড়ীতে আরোহণ করান হইল। উক্ত গাড়ীখানি তাঁহার জন্যই বিশেষ সতর্কতা ও যত্ন সহকারে চর্মাবৃত করা হইয়াছিল। মোটর গাড়ী হইতে বিশেষরূপে সুরক্ষিত এবং উত্তমরূপে আবৃত রেল গাড়ীতে, রেলগাড়ী হইতে পুনরায় মোটর গাড়ীতে আরোহিত হইলেন। বলা বাহুল্য মাত্র যে, উক্ত মোটরগাড়ীখানিও পূর্বের মতই চর্মাবৃত ও সুরক্ষিত ছিল। এইরূপে তিনি অত্যুচ্চ সুদৃঢ় প্রাচীর পরিবৃত কারাগারে উপনীত হইলেন। এ যাবৎ পথ ও গন্তব্য স্থান উপলব্ধি করিতে পারেন নাই কিন্তু কারাগারে পদক্ষেপ করিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার প্রিয় নাসিকের কারাগারেই অবরুদ্ধ আছেন। সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত এবং বিচক্ষণ সার্জেন্টদের হস্তে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছিল। এবং তাহারাও তাহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। সর্বপ্রকার সতকর্তা ব্যর্থ করিয়া নাসিকে কারা জীবনের প্রথম রজনী অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সাভারকর তাঁহার ক্ষুদ্র কারা কক্ষে একটুকরা কাগজ কুড়াইয়া পাইলেন, তাহাতে লিখিত ছিল— আপনি ভারতে আসিয়া পৌঁছিবার পূর্বেই মার্সেলিসে আপনার বীরত্ব ব্যঞ্জক কায্যকলাপের বার্তা আমরা অবগত হইয়াছি এবং ফরাসী সরকারও ভারত সরকারের নিকট আপনার প্রত্যর্পণ দাবী করিয়াছেন।

ক্ষুদ্র একটুকরা কাগজের সংক্ষিপ্ত এই সংবাদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই ঘটনায় ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে সাভারকরের বিপ্লবীদল ইউরোপে এবং ভারতে পারস্পরিক যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কিরূপ দক্ষতা এবং গোপনীয়তা সহকারে কায্য করিত। এই সংবাদে বীর সাভারকরও যৎকিঞ্চিৎ আশান্বিত হইলেন এই ভাবিয়া যে মার্সেলিসে তাঁহার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নাই এবং ফরাসী আদালতে যে আত্মপক্ষ সমথর্ন করিতে সমর্থ হইবেন এই রূপ ক্ষীণ আশাও অন্তরে পোষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভারতবাসীর স্বাধীনতা অর্জনের দাবী যে বিশ্বদরবারে উত্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাহাতেই অধিকতর আনন্দ অনুভব করিলেন। প্রকৃতপক্ষে মার্সেলিসে বীর সাভারকরের রোমাঞ্চকর কায্যকলাপে পৃথিবী ব্যাপী এক অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল।

ম্যাডাম কামা, শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা প্রমুখ ভারতীয় বিপ্লবীগণ আপ্রাণ চেষ্টা করিলেন যাহাতে ফরাসী আদালতে সাভারকরের বিচারকায্য সম্পন্ন হয়। প্যারিসে আন্তর্জাতিক সোসিয়েলিষ্ট দলের অধিনায়ক অধ্যাপক জোরে (Jures), জার্মানীর সোসিয়েলিষ্ট পার্টির নায়ক এবং 'ফরভেয়ার্তস্' পত্রিকার সম্পাদক হ্যার অগষ্ট বেবল, হালের সোসিয়েলিষ্ট পত্রিকা ফোলক ব্লাটের সম্পাদক হ্যার হাইডেম্যানের সঙ্গে এবং লণ্ডন সোসিয়েলিষ্ট দলের নায়ক মিঃ গয়ে এ, আলড্রেড্ প্রভৃতি জন-নায়কদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিয়া এই প্রবাসী বিপ্লবীগণ তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করিলেন। বিশ্বের খ্যাতিমান আন্তর্জাতিক আইনজ্ঞগণ এই আন্দোলনের ধারা এবং আইন ঘটিত দ্বন্দ্বের পরিণতি অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিতে ছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশীয় প্রগতিশীল পত্রিকাসমূহে ভারতীয় বিপ্লবী সাভারকরের ব্যাপার ধারাবাহিক রূপে আলোচিত হইতে লাগিল এবং ফরাসী সরকারের মানসিক দুর্বলতার ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়া ফরাসী জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিল। বিভিন্ন পত্রিকায়

আলোচিত ও প্রকাশিত সেই তীব্র মন্তব্য ও তীক্ষ্ণ সমালোচনা প্রকাশ করিতে হইলে পৃথক বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিতে হয়। সুতরাং দুই-এক খানি পত্রিকা হইতে সামান্য অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইল।

মহান কাল মার্কসের পৌত্র এম্ জান ল্যাংগোয়েট্ সাভারকরের এই নির্ভীকতা কাজের দ্বারা দৃষ্টান্ত স্থাপন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

লণ্ডন হইতে প্রকাশিত 'দি হের‍্যাল্ড অব রিভোল্ট(The herold of revolt) পত্রিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, '........ফরাসী বিচারালয়েই মিঃ সাভারকরের বিচার হওয়া বিধেয়, কারণ মিঃ সাভারকর রাজনৈতিক বিপ্লবী এবং ফরাসী উপকূলে অবতরণ করায় আন্তর্জাতিক নিয়মানুযায়ী ব্রিটীশ সরকার মিঃ সাভারকরের প্রতি কোন আধিপত্যই দাবী করিতে পারেন না এবং ফরাসী পুলিশও তাঁহাকে ব্রিটীশ সৈনিকের হস্তে সমর্পন করিয়া **অমার্জনীয়** অপরাধ করিয়াছে।........'

লণ্ডনের সমাজতন্ত্রবাদীরা-দি সাভারকর রিলিজ কমিটি নামে একটি সমিতিও গঠন করিয়াছিলেন। উক্ত সমিতির উদ্বোধন প্রসঙ্গে ঘোষণা করা হইল,........... 'মিঃ সাভারকরের অবিলম্বে মুক্তির জন্য এই সমিতি গঠিত হইল। মিঃ সাভারকর আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা পুলিশের দ্বারাই প্রতারিত হইয়াছেন এবং তাঁহার **একমাত্র অপরাধ তিনি ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটীশ প্রভুত্ব বিলোপ করিতে বদ্ধপরিকর**। আমাদের এই উদ্দেশ্য সাফল্য মণ্ডিত করিবার জন্য যাহারা আর্থিক সাহায্য কিম্বা অন্য কোন প্রকার সাহায্য করিতে উৎসুক তাহাদিগকে উক্ত সমিতির সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।'

গ্লাসগো হইতে প্রকাশিত 'দি ওয়ার্ড' নামক পত্রিকার সম্পাদক মিঃ গয়ে এ, আলড্রেড্ এই উদ্দেশ্য একখানি পুস্তিকাও প্রকাশ করেন। উক্ত পুস্তিকার একটি অনুচ্ছেদ ঃ-

'বন্ধুগণ, ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ ভিক্টোরীয়া ষ্টেশনে ভারত সরকারের নির্দেশে ধৃত মিঃ বিনায়ক রাও দামোদর সাভারকর বার এট ল'র পক্ষ হইতে এই আবেদন জানাইতেছি। মিঃ সাভারকরের দুই ভ্রাতা পূর্বেই ভারত সরকার কর্তৃক ধৃত হইয়াছেন। একজন যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন এবং অনুরূপ দণ্ডের জন্য অপর ভ্রাতাও কারাগারে অপেক্ষা করিতেছেন। Bo street police court, divisonal court and court of appeal এ ইংরাজ জাতির মোকদমা পরিচালনের কায্যধারা অন্যায়ের দ্বারাই প্রভাবান্বিত। ব্রিটীশ সরকার কর্তৃক মিঃ সাভারকরকে ভারতে প্রেরণ এইরূপ অসৎ উদ্দেশ্যেই প্রণোদিত। অভিযুক্ত ব্যক্তি রাজদ্রোহী এবং নরহত্যার সহযোগিতায় অভিযুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু বিচারালয়ে ইহাই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, নর হত্যায় সহযোগিতা করিবার বা প্ররোচনা করিবার কোন প্রমাণ নাই এবং রাজদ্রোহের বিচারের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ভারতে প্রেরণ অতিশয় অশোভনীয় পক্ষান্তরে এইরূপ বিতর্কেরও সৃষ্টি হইয়াছে যে, রাজদ্রোহ-মূলক বক্তৃতা হিন্দুস্থানে দেওয়া হইয়াছে সুতরাং হিন্দুস্থানেই ইহা বিচার্য। প্রধান বিচারপতি অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন কিন্তু অন্যতম বিচারপতি মিঃ কোলরিজ মিঃ সাভারকরকে ভারতে প্রেরণ করিতে বিরোধী ছিলেন। বলাবাহুল্য মাত্র যে, তাঁহার অভিমত কায্যকর হয় নাই।'

লা হ্যমানিটি (La Hamanity) প্রভৃতি ফরাসী দেশীয় পত্রিকা এবং বিশিষ্ট নাগরিকগণ দিনের পর দিন তাহাদের সরকারের নিকট দাবী জ্ঞাপন করিতে লাগিল যেন ফরাসী আদালতেই বীর সাভারকরের বিচারকায্য সুসম্পন্ন হয়।

কারাপ্রাচীরের অন্তরালে থাকিয়াও বিপ্লবী সাভারকর এই সব সংবাদ গুপ্তপথে অবগত হইতেন। ফরাসী আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তিনি উৎকণ্ঠিত ছিলেন না। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে ভিত্তি করিয়া বিশ্ববাসীর হৃদয়ে যে আলোড়নের সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন তাহাতেই সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইলেন।

ফরাসী সরকারও সাভারকর ব্যাপারে মহাবিভ্রাটে পড়িলেন। জার্মানীর সঙ্গে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কায় তাহারা এই ঘটনায় ইংরাজের সঙ্গে তিক্ততার সৃষ্টি করিতে সাহসী হইলেন না। শ্যাম রাখি না কুল রাখি, অবস্থায় ফরাসী সরকার 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' নীতিই অবলম্বন করিলেন। আন্তর্জাতিক হেগ্‌বিচার সভায় মীমাংসার ভার ন্যস্ত করিলেন।

পাঁচজন বিচারপতি লইয়া বিচার সভা গঠিত হইয়াছিল। পাঁচ দিন ধরিয়া বিচার কায্য চলিয়াছিল। ফরাসী সরকারের আইনজ্ঞগণ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া ধর্মাধিকরণগণ সমক্ষে তাঁহাদের বক্তব্য বুঝাইয়া দিলেন। প্রতিবাদী পক্ষে ইংল্যাণ্ডের প্রতিথযশা আইনজ্ঞগণও জবাব দিলেন।

দীর্ঘকালের ঐতিহ্য এবং জাতীয় মর্য্যাদা লংঘন করায় বিভিন্ন দেশীয় প্রগতিবাদী পত্রিকা ফরাসী সরকারও ব্রিটীশ সরকারের ব্যঙ্গ চিত্র প্রকাশ করিয়া ঠাট্টা বিদ্রুপ করিল। ম্যাৎসিনী, গ্যারিবলদি প্রভৃতি বিপ্লবীদের সঙ্গে তুলনা করিয়া বিপ্লবী সাভারকরের ছবি প্রকাশ করিল এবং ভারতের স্বাধীনতা দাবী কি ভাবে দাবাইয়া রাখিয়াছে তাহা প্রকাশ করিল।

বলাবাহুল্য মাত্র যে, হেগ-বিচারালয়ে ইংরাজেরই প্রাধান্য ছিল। আন্তর্জাতিক ধর্মাধিকরণগণের বিচারে ফরাসী পুলিশও ইংরাজ সৈনিকগণের কাহারো কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড কাহারো বা পদবোনতি হইল। কিন্তু মূল আসামী বীর সাভারকরের বিচার ভার ন্যস্ত হইল ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত এক ট্রাইবিউনালের উপর। উক্ত ট্রাইবিউনাল অনুসারে **রাজনৈতিক বন্দীর বিচার জুরী ব্যতীত হইবে এবং পুনর্বিচারের আবেদন করা চলিবে না** ইহাই স্থির হইল।

আন্তর্জাতিক বিচার সভায় পক্ষপাত মূলক বিচারে বিশ্ববাসী বিস্ময়ে অভিভূত হইল। বিভিন্ন সংবাদ পত্রে তীব্র সমালোচনাও প্রকাশিত হইল। জার্মানীর 'ফসিসে সাইটুং' পত্রিকা আন্তর্জাতিক ন্যায়াধীশগণের অন্যায় আচরণ, ব্রিটীশ সরকারের একাধিপত্য এবং ফরাসী সরকারের ক্লৈব্যের জ্বালাময়ী ভাষায় সমালোচনা করিল। 'হেরাল্ড অব রিভোল্ট' পত্রিকা সুদীর্ঘ প্রবন্ধে প্রনিধান যোগ্য যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়া ভারত-সরকার ও ব্রিটিশ সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। 'দি ওয়ার্ড' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ আলড্রাড অনুরূপ সমালোচনা এবং ভারতবাসীর স্বাধীনতা আকাঙ্খার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করায় রাজবিদ্রোহের অপরাধে আদালতে দণ্ডিত হইলেন। দণ্ডদাতা দণ্ড প্রদান প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন—মিঃ আলড্রাড আপনি যদিও তরুণ তথাপি আপনি ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী এবং

নির্বোধ, আপনার কায্যকলাপ সাধারণের আশাতিরিক্ত। উক্ত বিচারালয় কর্তৃক আপনি দ্বাদশমাস প্রথম শ্রেণীর আসামীরূপে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন।'

মিঃ আলড্রাড ভারতের স্বাধীনতা দাবী সমর্থন করায় তাঁহারই স্বদেশীয় এবং স্বজাতীয়গণের বিচারে কারাদণ্ড ভোগ করেন। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ণ না হইতে এই দণ্ডদাতারাই ভারতবাসীর হস্তে শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে বাধ্য হইলেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ক্ষমতা হস্তান্তর দিবসে মিঃ আলড্রাড্ 'দি ওয়ার্ড' পত্রিকায় নির্যাতিত বীর সাভারকরের কর্মবহুল জীবনী আলোচনা করিয়া সাভারকর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেন। মিঃ আলড্রাড্ এই উদ্দেশ্যে বীর সাভারকরের নিকট একখানি পত্র লেখেন। উক্ত পত্রোত্তরের বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সাভারকর সদন
শিবাজী পার্ক (বোম্বাই)
৮।২।৪৭

প্রিয় মিঃ আলড্রাড,

অধ্যাপক ডি, কে, কার্ভের পত্রে অবগত হইলাম আপনি এখনো আমাকে বিস্মৃত হন নাই। আন্দামান হইতে মুক্তি লাভের পর আমার কায্যকলাপ জানিতে চাহিয়াছেন। সম্প্রতি আমি সাংঘাতিকরূপে অসুস্থ হইয়াছিলাম। গত দুই বৎসর সম্পূর্ণরূপে শয্যাশায়ী থাকিয়া আপাততঃ ক্রমশঃ আরোগ্যলাভ করিতেছি কিন্তু এখনো কোন কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেছি না। আমার অতীত জীবনের ঘটনাবলী বিস্মৃতির অতলগর্ভে নিমজ্জিত। বোম্বাই লেজিস্লেটিভ এসেম্বলীর সদস্য মিঃ এ, এস, এল কাণ্ডারীকর এম, এ, এল, এল, বি'র ইদানিং ইংরাজীতে প্রকাশিত আমার জীবন চরিত আপনাকে একখণ্ড পাঠাইব। আমার মনে হয় তাহাতে আপনি বিস্তৃতরূপে অবগত হইতে পারিবেন।

আপনি যে আমাকে এখনো ভুলিতে পারেন নাই তজ্জন্য আমি আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি এবং আপনার এই আন্তরিকতার জন্য আমিও আনন্দ উপভোগ করিতেছি। ইংল্যাণ্ডে আমাকে বন্দী করা এবং আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্বন্ধে আপনি যেই সব মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন পুনরায় যে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন আশা করি তাহার একখণ্ড পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। আপনি ইউরোপবাসী হইয়াও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সমর্থন করিয়া কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন। আপনার মত মহানুভব ব্যক্তির জন্য ভারতবাসী চিরকালই গৌরব অনুভব করিবে। আমি যদি কখনো আত্মচরিত রচনা করি তাহাতে আপনার মহানুভবতা উল্লেখ করিব, অপরে যদি আমার জীবন চরিত সংকলন করে তাহাকেও অনুরোধ করিব। আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করিবেন।

বশংবদ—
ভি, ডি, সাভারকর।

ক্ষমতাশালীর ক্ষমতার অপপ্রয়োগে আন্তর্জাতিক বিচারে সাভারকর পাইয়াছেন অবিচার,

সহ্য করিয়াছেন নির্যাতন। পরাধীনতায় অত্যাচার নিত্যসহচর। সাভারকর স্বয়ং রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদালাভে বঞ্চিত হইলেন কিন্তু তাঁহার ব্যাপার লইয়া আন্তর্জাতিক বিচারে বিধানে রচিত হইয়াছে 'সাভারকর অধ্যায়', তাহাতে সকল দেশের রাজনৈতিক বিপ্লবীগণ স্বীকৃতি পাইয়াছেন নিখিল বিশ্বের রাষ্ট্রিক মর্যাদা।

'স্বর্ণ করে নিজরূপে অপরে শোভিত
বংশী করে নিজ স্বরে অপরে মোহিত

সাভারকর সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বিশেষ আইন জানিতে হইলে বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য ঃ- The Principles of International Law by T. G. Lawrance, M.A., L. L.D. Bentwitch, Cases in International Law. American Journal of International Law vol. V, Pitt Corbett's leading Cases 4th Edn etc.

আন্তর্জাতিক বিচারসভা যে **ব্যাভিচার-সভা** তাহা প্রতিপন্ন করিলেন মিঃ কৌলার। হেগে আন্তর্জাতিক নবনির্মিত সুবৃহৎ বিচার ভবনের দ্বারোদঘাটন উৎসব বিশেষ সমারোহে অনুষ্ঠিত হয় ১৯১৪ সালে ১লা জানুয়ারী। রাশিয়ার সর্বশেষ জার দ্বিতীয় নিকোলাউস আন্তর্জাতিক শান্তি ও মৈত্রী প্রচারে অগ্রণী ছিলেন সুতরাং পৌরোহিত্য করিবার জন্য তাঁহাকেই আহ্বান করা হইল। জার্মানীর অধ্যাপক কৌলার সেই সময়ে আন্তর্জাতিক আইনে সর্বাপেক্ষা বিশারদ ছিলেন বলিয়া ঐ স্মরণীয় উৎসবে উদ্বোধনী ভাষণ দেওয়ার জন্য তাঁহাকে আমন্ত্রণ করা হইল।

বহু নরপতি, রাষ্ট্র নিয়ামক, জ্ঞানী ও গুণীজনের মধ্যে সভামঞ্চে সুউচ্চ আসনে উপবেশন করিলেন জার, পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত নিম্ন আসন অলংকৃত করিলেন অধ্যাপক কৌলার।

যথারীতি ঘণ্টানিনাদ, ঐক্যতান বাদন, স্বস্তিবচন পাঠ-প্রভৃতি মাঙ্গলিক ক্রিয়া-কলাপের পর অধ্যাপক কৌলার দণ্ডায়মান হইলেন। এবং তাঁহার লিখিত উদ্বোধনী ভাষণ পাঠ করিলেন। অভিভাষণের নাম দিলেন 'সাভারকর ব্যাপার' (The Savarkar Affairs)। শ্রোতৃমণ্ডলী একাগ্রচিত্তে অভিভাষণ পাঠ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অধ্যাপক কৌলার গুরুগম্ভীর কণ্ঠে পরিষ্কার উচ্চারণে বিশ্লেষণ করিতে লাগিলেন সাভারকর-মামলার প্রতিটি ধারা উপাধারার সূক্ষ্মতত্ত্ব। বিচারকালে কিভাবে কোন কোন ধারা উপধারা উপেক্ষা করা হইয়াছে, ফরাসীদেশীয় আইনের মর্যাদা বিচারকগণ কিভাবে তাচ্ছিল্য করিয়াছেন, কতবড় ঘৃণ্য বিচারে দেশভক্ত ভারতীয় স্যার সাভারকর আন্তর্জাতিক বিধানে রাজনৈতিক অপরাধীর আশ্রয় বঞ্চিত হইয়াছেন, অধ্যাপক কৌলার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণনা করিলেন। ইহার পূর্বে পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন রাজ্যে ঐতিহাসিক ঘটনায় যেভাবে আশ্রয়দানের রীতি স্বীকৃতি পাইয়াছে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীর ভাগ্যে তাহা কেন ফলিল না কৌলার তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন।

পরিশেষে অধ্যাপক কৌলার বজ্রকণ্ঠে সাভারকরের এই বিচারকে অন্যায়, অসঙ্গত, যুক্তিহীন বিচার এমন কি আন্তর্জাতিক আইনের নামে ব্যাভিচার বলিয়া অভিহিত করিলেন। এইরূপ বিচার প্রহসনের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া বিরাট বিচার-ভবন নির্মাণ করা এবং

তার দ্বার উদঘাটনে মহোৎসব করা নিতান্তই পরিহাসকর প্রচেষ্টা। 'ফরভেয়ার্তস্' পত্রিকার প্রকাশিত সংবাদে অধ্যাপক কৌলারের অভিভাষণ পাঠকালে শ্রোতৃমণ্ডলী লজ্জায় মাথা হেট্ করিয়াছিলেন। অভিভাষণ পাঠ সমাপ্ত হইলে মনে হইল নবনির্মিত সৌধ, শ্রোতা, দর্শক এবং অনুষ্ঠাতাসহ চুড়মার হইয়া গিয়াছে।

বিশ্বজনগণের অজস্র নিন্দা, তীব্র সমালোচনা সমস্তই নীরবে ফরাসী সরকার সহ্য করিলেন। ব্রিটীশ সরকার শুনিয়াও যেন কিছু শুনিতে পাইলেন না। ভারত সরকার বীর সাভরকরকে উত্তমরূপে আবৃত গাড়ীতে কঠোর সশস্ত্র প্রহরাধীনে বোম্বাই সর্বোচ্চ বিচারালয়ে বিশেষ ট্রাইবিউনালের সম্মুখে উপস্থিতকরিলেন বিচারের জন্য। বীর সাভারকর কাঠগড়ায় আরোহণ করিতেছেন এমন সময় উচ্ছ্বসিত কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাইলেন, 'স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্মী কি-জয়'। বিস্ময়ে সাভারকর দর্শকদের বসিবার স্থানে তাকাইলেন কিন্তু কাহাকেও তথায় দেখিতে পাইলেন না, কারণ সরকারী নির্দেশে জনগণের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, বারান্দায়ও তিনি কোন জনপ্রাণী দেখিলেন না। পুনরায় সেই জয়ধ্বনি শ্রুত হইল—'স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্মী কি জয়'। অবশেষে তিনি দেখিতে পাইলেন, কাঠগড়ার সোপানের নিম্নে ৩০/৪০ জন উৎসুক যুবক তাঁহারই অনুগামী তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছেন। বিপ্লবী সাভারকর শত শত জনসভায় অগণিত পুষ্পমাল্যে বিভূষিত হইয়াছেন, সহস্র সহস্র করতালি ধ্বনিতে মুহুর্মুহুঃ অভিনন্দিত হইয়াছেন, যদিও তিনি এই সকলের জন্য কোন কালে লালায়িত ছিলেন না; তথাপি এই মৃত্যুপথ যাত্রীগণ যেইরূপভাবে তাঁহার অন্তকরণ স্পর্শ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন পূর্বে আর কেহ সেইরূপ সমর্থ হন নাই। স্বদেশের মুক্তি কামনায় দুশ্চয় তপস্যরত নিপীড়িত নির্যাতিত অনুগামী বন্ধু-সহকর্মী এবং ভ্রাতার সংস্পর্শে আসিয়া তিনি গৌরব ও আনন্দ অনুভব করিলেন। আদালতের কায্য আরম্ভ হইবার পূর্বে ভারতীয় বিপ্লবের জনক সাভারকরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আদালত হইতে একখানি পৃথক চেয়ার দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু বীর সাভারকর আদালত প্রদত্ত এই পৃথকআসন প্রত্যাখান করিয়া বলিলেন যে, তিনি বন্ধুগণের সঙ্গে একত্রে কাঠগড়ায় থাকিয়াই অধিকতর আনন্দ অনুভব করিবেন।

সাভারকরের বিরুদ্ধে গঠিত পাঁচটি অভিযোগ পঠিত হইল ঃ—

১) মহামান্য সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা অথবা জনসাধারণকে সম্রাটের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা।

২) ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১২১ ক' ধারা লঙ্ঘন করিয়া ভারতবর্ষ হইতে অথবা ভারতের অংশ বিশেষ হইতে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করা।

৩) ১৯০৮ খৃঃ অব্দে লণ্ডনে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া বা প্রস্তুত করিয়া নাসিকের কালেকটর মিঃ এ, এম, টি জ্যাক্সনকে হত্যায় সহায়তা করা এবং ১৯০৯ অব্দে ২১শে ডিসেম্বর নাসিকে উক্ত হত্যাকাণ্ড সংঘটন করা।

৪) ১৯০৮ খৃ অব্দে লণ্ডনে অস্ত্রশস্ত্র বিতরণ করিয়া বা অনুরূপ ভাবে মহামান্য সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা।

৫) ১৯০৬ খৃঃ অব্দে নাসিকে, পুণায় এবং ১৯০৮ হইতে ১৯০৯ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত লণ্ডনে বিদ্রোহ মূলক বক্তৃতা করা।

যথা নিয়মে আদালতের কার্য্য আরম্ভ হইল। বীর সাভারকর নির্ভীক চিত্তে বলিলেন যে, তিনি নির্দোষ, তথাপি একান্তই তাঁহাকে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে হয় ফরাসী আদালতেই করিবেন; কারণ ভারতবর্ষে তিনি ইংরাজ প্রভুত্ব স্বীকার করেন না সুতরাং ব্রিটীশ আদালতে কোন প্রকার আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি সম্মত নহেন।

ধর্মের নামে শপথ করিয়া শাসন ভার প্রাপ্ত কর্মচারী ও গোয়েন্দা পুলিশ একের পর একজন করিয়া ধর্মাধীকরণের সম্মুখে সত্য মিথ্যায় অতিরঞ্জিত স্বকল্পিত নানা তথ্য প্রকাশ করিল এবং একের পর এক সাক্ষী দাঁড় করাইয়া শেখানো বুলি অনর্গল বর্ণনা করাইল। দিনের পর দিন একই রীতি অনুষ্ঠিত হইল। জীবন-মৃত্যু সমন্বিত ইতিহাস বিখ্যাত মামলায় যার ফলাফল জানিবার জন্য সমগ্র জগৎ আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছে, আইনজ্ঞগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে— স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্ভীক নায়ক তাহাতে সম্পূর্ণ উদাসীন। তিনি কখনো সহকর্মীগণের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের সওয়াল জবাবের জন্য নোট লইতেছেন, কখনো তাঁহাদিগকে উপদেশ দিতেছেন, যাহাদের মনোবল ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তাঁহাদিগকে উপদেশ দিতেছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ তাচ্ছিল্য সহকারে শ্রবণ করিতেছেন, এবং এই সকল অভিযোগের বিরুদ্ধে তাহার কোন বক্তব্য আছে কিনা জিজ্ঞাসিত হইয়া অভিযোগের ভয়াবহ পরিণাম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকিয়াও একই কথা দৃঢ়তা সহকারে বলিতেছেন,—ইংরাজ প্রভুত্ব স্বীকার করি না, সুতরাং ইংরাজের আদালতে আইনের আশ্রয় লইতে ঘৃণা বোধ করি।

মরণ-বিজয়ী এই বীর সেনানীরা মৃত্যুগহ্বর-দ্বারে উপনীত হইয়াও অধিকাংশ সময় রাজ-নীতি চর্চা, এবং বিভিন্ন জাতির বিপ্লবীয় ইতিহাস আলোচনায় রত থাকিতেন। তাঁহারা যে আদালতের আসামী এবং কারাবাসী সময় সময় তাহাও ভুলিয়া যাইতেন, মনে করিতেন ছাত্রাবাসে অবস্থান করিয়া পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতেছেন। কায্যতঃ তাঁহারা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, মৃত্যুদণ্ড হইলে প্রথম বিভাগ, দ্বীপান্তর হইলে দ্বিতীয় বিভাগে এবং কারাবাস হইলে তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইবেন।

আজ বহু আকাঙ্খিত পরীক্ষার ফল বাহির হইবার দিন। পরীক্ষার্থীর মতই তাঁহারা উৎকণ্ঠিত—কর্মজীবনের সফলতা কিম্বা ব্যর্থতা জানিবার জন্য। বিচারকীয় সুদীর্ঘ মন্তব্যের কয়েকটি অনুচ্ছেদ্—

"...............উল্লিখিত সাক্ষ্য প্রমাণাদিতে ইহাই চূড়ান্ত ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, মিঃ বিনায়ক রাও দামোদর সাভারকর মহারাষ্ট্র, বাংলা, এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বোমা প্রস্তুত করিবার কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে বৈপ্লবিকদলও গঠন করিয়াছিলেন। এই সব বৈপ্লবিকদের এমন কি তরুণীরাও সর্তকতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুত করিত। গুপ্ত সমিতির তরুণ তরুণীরা শাসক শ্রেণীর দৃষ্টির অগোচরে-অবস্থান করিয়া হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত থাকিত। বিপ্লব সমিতির যেইসব কর্মীদের বিচার কার্যের ভার আমাদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে তাঁহাদের কায্যক্ষেত্র নাসিক, বোম্বাই, পুণা, ঔরাঙ্গাবাদ,

পেন (Pen), জেওলা (Jeola) দাক্ষিণাত্যের নানা স্থানে অবস্থিত। এই সব বিপ্লবাত্মক কার্য্যকলাপ মিঃ বিনায়ক রাও দামোদর সাভারকরই পরিচালন করিতেন।

"১৯০১ খৃঃ অব্দে গণেশ রাও দামোদর সাভারকর ও বিনায়ক রাও দামোদর সাভারকর নাসিকের তরুণ সম্প্রদায় বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের তরুণ দিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া 'মিত্র মেলা' স্থাপন করেন। তাহার শিবাজী, রামদাস, প্রতাপ সিং, ম্যাজিনীর জীবনী আলোচনা করিতেন। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অস্ত্রশস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া ভারত সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য পুস্তিকা প্রচার, স্বদেশীগান, ও বক্তৃতার দ্বারা জনমত সক্রিয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

'ক্রমশঃ মিঃ বিনায়ক দামোদর সাভারকর মিত্র মেলার নায়ক রূপে বিশেষ প্রভাবশালী হইয়া উঠেন। জনসভায় বক্তৃতা করিয়া ভারতে ও বহির্ভারতে শাসকের বিরুদ্ধে জনগণকে বিক্ষুব্ধ করিয়াছিলেন; এমন কি অস্ত্র ধারণ করিবার জন্যও প্ররোচিত করিয়াছিলেন। শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মার প্রদত্ত বৃত্তি লাভ করিয়া লণ্ডনে আইন অধ্যায়ন করিতে যাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভারতে বৈপ্লবিক কার্য্য পরিচালন করা। ইউরোপীয় গোয়েন্দা পুলিশের বিবরণী এবং অপরাপার সাক্ষ্যে ইহাই প্রমাণিত হয়।

'অভিনব ভারত'-এর অভিযুক্ত কর্মীগণের স্বীকারউক্তিতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, তাহাদের কার্য্যকলাপ এইরূপ নিপুণতা ও সতর্কতার সহিত সম্পাদিত হইতে যে, মিঃ জ্যাক্সনের হত্যার পূর্বে গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশও তাহাদিগকে সন্দেহ করিতে পারে নাই। মিঃ গণেশ সাভারকরের নির্বাসনের অনতিকাল পরেই অভিযুক্ত আসামী কাশীকরের নিকট যেই দলিলপত্রাদি পুলিশের হস্তগত হয় তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে 'অভিনব ভারত'-এর কার্য্যকলাপ ব্যাপকভাবে সুনিয়ন্ত্রিত হইত এবং এই বিপ্লবীদল ম্যাৎসিনর বৈপ্লবিক নীতি ও পন্থাই অনুসরণ করিতেন।

"মিঃ গণেশ দামোদর সাভারকরের গৃহ খানা তল্লাসী করিয়া সেই সব মূল্যবান দলিল পত্রাদি এবং মিঃ বিনায়ক সাভারকরের লিখিত পত্রাদি পুলিশের হস্তগত হয় তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে মিঃ বিনায়ক সাভারকর শুল্ক বিভাগ ও গোয়েন্দা বিভাগের সর্বপ্রকার সতর্কতা এবং অনুসন্ধান ব্যর্থ করিয়া ইউরোপ হইতে ভারতে প্রচুর সংখ্যক পিস্তল ও রিভলভার প্রেরণ করেন। বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিপ্লবীয় কার্যে তাহার প্রয়োগ পদ্ধতি শিক্ষা দিয়া কয়েকজন কর্মী ভারতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাহার গৃহে বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী সমন্বিত পুস্তিকাও পাওয়া গিয়াছে। উক্ত পুস্তিকার অনুলিপি কলিকাতায় **মাণিকতলার** বাগানবাড়ীতে পুলিশ অনুসন্ধানের ফলে হস্তগত করিয়াছে।

মিঃ বিনায়ক সাভারকর প্যারিসে ভারতীয় এনারকিষ্ট পার্টির ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে আসিয়াছিলেন। 'অভিনব ভারত'-এর সদস্য চ্যানজেরী রাও ধৃত হইবার সময় পুলিশ কতকগুলি পুস্তিকা হস্তগত করে। উক্ত পুস্তিকাগুলি মিঃ বিনায়ক সাভারকরই ফরাসী হইতে প্রত্যাবর্তনকালে তাহাকে দিয়াছেন বলিয়া স্বীকৃতি পাওয়া গিয়াছে। 'বন্দেমাতরম্' শিরোনামে উক্ত পুস্তিকায় মিঃ কার্জন উইলীর হত্যাকারী মদনলাল ধিংড়ার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা

করা হইয়াছিল। ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে গুপ্ত হত্যা বিশেষরূপে সমর্থন করা হইয়াছিল; এবং অনুরূপ গুপ্তহত্যার সর্বভারতীয় ব্যাপক পরিকল্পনা যে ছিল তাহার প্রমাণও উক্ত পুস্তিকায় পাওয়া যায়। কানাইলাল দত্ত, ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকীর পথই স্বাধীনতালাভের পথ—ঐ পথেই অগ্রসর হইতে হইবে—এইরূপ গুপ্ত হত্যাই আমলাতন্ত্র ধ্বংস করিবার এবং জনমত উদ্বুদ্ধ করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং তাহা যে মিঃ বিনায়ক সাভারকরের লিখিত তাহাতে কোন সন্দেহের কারণ নাই।

'বিভিন্ন তথ্য ও সাক্ষ্যে ইহাই চূড়ান্তরূপে প্রমাণিত হয় যে, মিঃ বিনায়ক রাও দামোদর সাভারকর ভারতীয় ফৌজদারীদণ্ড বিধির ১২১ এর 'ক' ধারা অনুযায়ী অপরাধী সুতরাং বিনায়ক সাভারকর উক্ত বিচারলয় কর্তৃক **যাবজ্জীবন নির্বাসনদণ্ডে** দণ্ডিত হইলেন এবং তাঁহার **সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি রার্জসরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত** করা হইল।'

দণ্ডাদেশ শুনিয়া বিপ্লবী সাভারকর মারাঠী ভাষায় একটি স্তোত্র আবৃত্তি করিয়া স্বদেশ জননীকে বন্দনা করিলেন এবং জীবনে আর কখনো যাহাদের সঙ্গে মিলিত হইবার সম্ভাবনা নাই তাহা দিগকে 'টুপী' খুলিয়া বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন। সমবেত কণ্ঠে 'স্বাতন্ত্র্যলক্ষ্মী' কী জয় ধ্বনিতে বিচার ভবন মুখরিত হইয়া উঠিল। আদালত পুলিশ তাঁহাদিগকে নির্বাক করিবার জন্য ধাবিত হইল-'আপ্‌লোক আসামী হ্যায়—কয়েদী হ্যায়—হল্লামাৎ কি জিয়ে।'

অপরাপর আসামীগণ কেহ দ্বীপান্তর দণ্ডে, কেহ বা কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। যখনই তাঁহাদের প্রতি দণ্ড প্রয়োগ করা হইত তখনই তাঁহারা 'স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্মী' কী জয় ধ্বনিতে আদালত গৃহ কাঁপাইয়া তুলিতেন আর 'মারো পাকারো' রবে পুলিশ ধাবিত হইত।

বিশ্ব-বিখ্যাত বিপ্লবী সাভারকরকে যাবজ্জীবন নির্বাসিত করিয়াও ভারত সরকার রাজদণ্ড নিরাপদ মনে করিলেন না। পুনরায় তাঁহাকে মিঃ জ্যাকসন হত্যার অভিযোগে আদালতে অভিযুক্ত করিলেন। সকলেই ভাবিয়াছিল দ্বিতীয় বার অভিযুক্ত করিবার উদ্দেশ্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা, কিন্তু বিপ্লবী সাভারকর পূর্বের মতই আত্মপক্ষ সমর্থনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিলেন 'আমি ইংরাজ প্রভুত্ব স্বীকার করি না।' মামলার অন্যতম আসামী চতুর্ভুজ রাজসাক্ষী হইয়া প্যারিস হইতে কিরূপে ব্রাউনিং পিস্তলের বাক্স ভারতে আনিয়াছিল তাহা বর্ণনা করিল এবং এই ব্যাপারে সে বীর সাভারকরের নাম প্রকাশ করিল।

ইউরোপ প্রবাসী 'অভিনব ভারত'-এর কর্মীগণ বিশেষতঃ ম্যাডাম কামা এই সংবাদে বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়িলেন। সাভারকর যাহাতে আরো অধিকতর বিপন্ন না হইয়া পড়েন সেইজন্য কামা ব্রিটীশ কন্সাল জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন যে, রাজ সাক্ষী চতুর্ভুজ মিথ্যা কথা বলিয়াছে। সাভারকর ঐ ব্রাউনিং পিস্তল সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না। কামাই ঐ পিস্তলগুলি ভারতে লইয়া যাইবার জন্য চতুর্ভুজকে দিয়াছিলেন। কন্সাল জেনারেল তাঁহার এই উক্তি যথারীতি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ব্যাপার লইয়া ব্রিটীশ সরকার কিংবা ভারত সরকার কেহই কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। সম্ভবত সাভারকর ব্যাপারে 'নাকানিচোবানি' খাইয়া নূতন আর একটা কিছু করিতে সাহস হয় নাই।

১৯১০ খৃঃ অব্দের ২৪শে ডিসেম্বর উক্ত মামলার ফল প্রকাশিত হইল। ন্যায়াধীশ

দণ্ডের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিলেন,—'মিঃ সাভারকর, আপনি পুনরায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। ভারত সরকার দয়া পরবশ হইয়া আপনাকে ১৯৬০ খৃঃ অব্দে ২৪শে ডিসেম্বর মুক্তি প্রদান করিবেন।'

বীর সাভারকর তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'আরো পঞ্চাশ বৎসর ভারতে ইংরাজ প্রভুত্ব থাকিবে না সুতরাং ১৯৬০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত আমাকে কারা জীবন যাপন করিতে হইবে না। রক্ত, মাংসে গড়া একজন মানুষকে একাধিক্রমে ৫০ বৎসর নির্বাসিত করিবার কথা—

'যে শুনে সে শিহরি উঠি
রসনা কাটি কানে দেয় হাত'

এই দণ্ডাদেশের ফলে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় বীর সাভারকরের বি, এ, ডিগ্রী প্রত্যাহার করিয়া লয়।

দীর্ঘকাল ধরিয়া বিভিন্ন সংবাদ পত্রে সাভারকর ব্যাপারই ছিল আলোচ্য বিষয়। 'লা-লিবারটারী' নামক বিপ্লববাদী পত্রিকায় ১৯১২ খৃঃ অব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর সংখ্যায় নিম্নে অনুলেকিত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল—

'সর্ব সাধারণ অবগত আছেন যে, সুপ্রসিদ্ধ হিন্দু বিপ্লবী বীর সাভারকর সুদীর্ঘ ৫০ বৎসর দ্বীপান্তরদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। ভারতের নূতন সম্রাট অকপটে ঘোষণা করিয়াছেন যে, লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন করিয়াই তিনি রাজকীয় অপরাধে দণ্ডিত আসামী দিগকে মুক্তিপ্রদান করিবেন। কিন্তু বীর সাভারকর ভারতসম্রাট পঞ্চমজর্জের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অপরাধে দণ্ডিত হইলেও উক্ত রাজানুকম্পা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। বর্তমানে তিনি আন্দামানে কারারুদ্ধ আছেন এবং ১৯৬০ খৃঃ অব্দের ২৪শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তাঁহাকে কারা প্রাচীরের অন্তরালে নির্বাসিত জীবন-যাপন করিতে হইবে। আমাদের সহযোগী 'হ্যারাল্ড্ অব রিভোল্ট' পত্রিকায় বীর সাভারকরের যেইরূপ ভাবে মুক্তি দাবী করিতেছেন আমারও সেইরূপ ভাবে ভারত সরকার ও ফরাসী সরকারের নিকট দাবী জানাইতেছি। বিশেষতঃ শেষোক্ত সরকার এই ব্যাপারে কুখ্যাতিই অর্জন করিয়াছেন।'

এই দণ্ডাদেশের ৩৭ বৎসর পূর্ণ না হইতেছে ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, ভাগ্য বিপর্য্যয়ে হউক, বিধি বিড়ম্বনায় হউক কিংবা বীর বিপ্লবীদের প্রচণ্ড আঘাতের ফলেই ১৯৪৭ খৃঃ অব্দে ইংরাজ শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে বাধ্য হইলেন। জয়তু সাভারকর।

(সাত)

সশস্ত্র প্রহরী বেষ্টিত হইয়া ১৯১১ খৃঃ অব্দের ৪ঠা জুলাই বিপ্লবী সাভারকর আন্দামানে উপনীত হইলেন। ১৮৫৭ সালে সিপাহী যুদ্ধের পর হইতে ভারতের মুক্তিকামী বীর যোদ্ধাদিগকে উক্ত দ্বীপে অন্তরীণ রাখা হইত। দুশ্চর তপস্যারত দেশ প্রাণ বীর পুরুষদের স্মৃতি বিজড়িত সলিল পরিবৃত ভূখণ্ডে পদার্পণ করিয়া বীর সাভারকর নীরবে স্বদেশ ভক্ত বীর পুরুষদিগকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন।

বিখ্যাত 'সেলুলার' বন্দীনিবাসের নির্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিতেছেন এমন সময় মিঃ বেরী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মিঃ বেরী অত্যন্ত রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করিলেন, 'আপনিই না মার্সেলিস্ হইতে পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিলেন?'

বীর সাভারকর গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন, 'সে চেষ্টা করিয়াছিলাম বৈকি কিন্তু তাহাতে আপনার কি প্রয়োজন।'

নবাগতের সঙ্গে অপরাপর বন্দীদের যে স্বাতন্ত্র্য আছে প্রথম আলাপেই মিঃ বেরী তাহা বুঝিতে পারিলেন।

পরের দিন সকালে কয়েকজন ইউরোপীয় ভদ্রলোক বীর সাভারকরকে দেখিবার জন্য মিঃ বেরীর সঙ্গে কারা কক্ষে আসিলেন। মিঃ বেরী সাভারকরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আপনিইত সংকলন করিয়াছেন এবং সিপাহীদিগকে শহীদ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে।

বীর সাভারকর বলিলেন, এই বিষয়ে আমি অনেক বই পড়িয়াছি।

মিঃ বেরী প্রশ্ন করিলেন, তাহা হইলে এই সব লুণ্ঠনকারী দস্যুদিগকে স্বদেশ ভক্ত বীরপুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিলেন কেন? সিপাহী বিদ্রোহের সময় আমার বাবাও এই সব উচ্ছৃংখল জনতার হাতে ধরা পড়িয়াছিলেন। আমি তাহার কাছে শুনিয়াছি যে, নর-পিশাচ নানা সাহেব এমন কি সম্ভ্রান্তবংশীয়া ইংরাজ মহিলাদিগকেও উৎপীড়ন করিয়াছিলেন।

বীর সাভারকর তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, আপনার বাবা মিথ্যাবাদী। তিনি কি নিজে তাহা দেখিয়াছেন?

মিঃ বেরী বলিলেন, যিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তিনি তাহার নিকটই শুনিয়াছেন।

বীর সাভারকর বলিলেন, লক্ষ্ণৌতে ইংরাজ নরনারী যখন বন্দী হইয়াছিলেন তখন নানাসাহেব যে কানপুরে ছিলেন ইহা **ঐতিহাসিক সত্য** কথা।

মিঃ বেরীর সঙ্গে আগত জনৈক ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন, আপনি এই সব রাজদ্রোহীদিগকে ঘৃণা করেন না?

বীর সাভারকর গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, আমি আমার জাতীয় নেতাদের অপমান সহ্য করতে পারিব না। আপনারা অত্মমর্যাদা রক্ষা করিয়া কথা বলিবেন। তাহাদিগকে হতভম্ব ও নির্বাক দেখিয়া বীর সাভারকর পুনরায় বলিতে লাগিলেন, নানা সাহেব, তাঁতীয়া টোপী, প্রমুখ সংগ্রামী নায়কদিগকে স্বার্থান্বেষী, নরহন্তা, কেন বলিতেছেন তার প্রমাণ দেখাইতে পারিবেন? নানা সাহেব রাজদণ্ড গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন, আর তাঁতীয়া টোপী সুখ্যাতি চাহিয়াছিলেন, আপনারা ইহাই বড় অপরাধ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আপনারা কি জানেন না, ভিক্টর-ইমন রাজ্য শাসন করিতে চাহিয়াছিলেন; ওয়াশিংটনও নেতৃত্বের জন্য, নাম-যশের জন্য লালায়িত ছিলেন। যদি তাহারা **মহানুভবতার** জন্য আপনাদের স্মরণীয় ও বরণীয় হইতে পারেন তাহা হইলে নানা সাহেব, তাঁতীয়া টোপী কি **অপরাধ** করিয়াছেন? মিঃ বেরী আর বাক্যালাপ না করিয়া সঙ্গীগণ সহ চলিয়া গেলেন।

সেলুলার কারাগার দেখিতে বিরাট, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'সেল' বা কক্ষে বিভক্ত। মাঝখানে দাঁড়াইয়া চারিদিগের দেওয়াল স্পর্শ করা যায়। অন্ধকারময় এইরূপ ক্ষুদ্র কক্ষেই বন্দীদিগকে বাস করিতে হইত। আন্দামানের আবাহাওয়াও অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর এবং নিরানন্দময় ছিল। বৎসরে তিনমাস বায়ু অত্যন্ত উত্তপ্ত থাকে এবং নয় মাস এত অধিক বারিপাত হয় যে কখনো কখনো কয়েক সপ্তাহ সূর্য্যালোক দৃষ্টি গোচর হয় না। এইরূপ নৈসর্গিক পরিস্থিতি এবং কারা আবেষ্টনী সাভারকরের দেহে বা মনে কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। কারণ তাঁহার দেহ ক্ষুদ্র কক্ষে আবদ্ধ থাকিলেও কবি মন অনন্তশূন্যে—দিকদিগন্তে—সাগর সৈকতে কুসুম কাননে আনন্দে ঘুরিয়া বেড়াইত এবং সেই আনন্দ লহরী সুললিত ছন্দে উদ্‌গত হইয়া উঠিত, কিন্তু তাহা ব্যক্ত করিবার বা লিপিবদ্ধ করিবার কোন উপায় ছিল না। আলোকের কোন ব্যবস্থা ছিল না এবং কাগজ কলম বন্দীদের পক্ষে স্বপ্ন রাজ্যের সামগ্রী ছিল। সুতরাং কাগজ কলমের অভাবে দেওয়ালেই অঙ্গার, ইটের টুকরা বা নখের সাহায্যে লেখিয়া রাখিতেন ও মুখস্থ করিতেন। এই জন্য তাঁহাকে কোন কক্ষে দীর্ঘ কাল না রাখিয়া ঘন ঘন কক্ষান্তরিত করিত। এই কক্ষ পরিবর্তনে তাঁহার লিখিবার স্থানাভাবই পূরণ করিত। এইসব কবিতা তিনি মুখস্থ করিয়া রাখিতেন। আন্দামান হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আসিবার সময় প্রায় দশ সহস্র কবিতা তিনি কণ্ঠে বহন করিয়া আনেন। তাঁহার স্মৃতি শক্তি বৈদিক ঋষিদের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

আন্দামানে এই বন্দীদিগকে কী কঠোর পরিশ্রমই না করিতে হইত। সর্ষপ তৈল নিষ্কাশন করিবার জন্য বলদের মত কাঠের ঘানিতে বাঁধিয়া দিত এবং এই রূপে সাভারকরকে প্রত্যহ ৮০ পাউণ্ড্ তৈল নিষ্কাশন করিতে হইত। নারিকেল ছিলার রজ্জু প্রস্তুত করিতে হইত তাহাতে অংগুলী ক্ষত-বিক্ষত হইত। পাথর ভাঙ্গিতে হইত। তৎকালে এই বন্দীনিবাসে ভাই পরমানন্দ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত, আশুতোষ লাহিড়ী প্রমুখ অগ্নি যুগের বিপ্লবীরা নির্বাসিত জীবন যাপন করিতেছিলেন। তাঁহাদিগকে পরস্পরের সান্নিধ্য হইতে এমন ভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিত যে তাঁহারা কোন প্রকার আলাপ করিতে পারিতেন না; একমাত্র কক্ষ পরিবর্তনকালে নয়নের নীরব ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করিতেন।

'এত কাছে তবু কত দূরে।'

বীর সাভারকরের অগ্রজ গণেশ রাও দামোদর সাভারকরও এই বন্দীশালায় ছিলেন। দীর্ঘকাল পরে যখন উভয়ে প্রথম সাক্ষাৎ হইল তখন বীর সাভারকর অগ্রজকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কেমন আছেন? তিনি উত্তর করিলেন, তুমি যতদিন মুক্ত ছিলে আমাদের জীবন ব্রত সফল করিতেছ এই আশায় ভালই ছিলাম।

বন্দীজীবনে এই অব্যক্ত দৈহিক পরিশ্রম শিক্ষিত ভদ্র সন্তানগণের পক্ষে যে কত বেদনাদায়ক ছিল তাহা সহজে কল্পনাও করা যায় না।

'কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে।'
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।'

উল্লাসকর দত্তর ভাষায়, 'হিন্দুস্থানে বৃষ যেইরূপ জোয়ালে বাঁধিয়া দেওয়া হয় সেইরূপ

সরিষার তৈলের প্রতি ঘানিতে তিনটি করিয়া নরদেহ বাঁধিয়া দেওয়া হইত। দিনে বারো ঘন্টার মধ্যে মাত্র কয়েক মিনিট আহারের জন্য সময় পাওয়া যাইত, ইহা ভিন্ন সব সময় ঘানির চারিদিকেই দ্রুত পদে ঘুরিতে হইত। যদি কেহ শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন দেহে পড়িয়া যাইত বেত্রাঘাতে জর্জরিত করিয়া গাত্রোত্থানে বাধ্য করিত। যদি কেহ একান্তই উঠিতে না পারিত তাহাকে চলমান ঘানিতে বাঁধিয়া দিত— দেহ—ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত হইয়া যাইত। আমাকেও এই রূপ দুর্ভোগ সহ্য করিতে হইয়াছে, আমি যখন আমার কক্ষে প্রত্যাবর্তন করিতাম তখন মনে হইত সেই দিন ঈশ্বরের অনন্তদয়ায় কোন প্রকারে বাঁচিয়া গিয়াছি। বন্দীনিবাসের নিয়ম অনুসারে অনেকেই ছয়মাস পরে মুক্তি লাভ করিল কিন্তু আমাদের দুঃখ ছিল অনন্তকাল। এইরূপ অমানুষিক অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া ভাবিলাম যদিও আমার ভৌতিক দেহ ইহাদের অধীন, মন আমার অধীন। কারাকর্তৃপক্ষের কিংবা সরকারের এই নিষ্ঠুর অত্যাচার নীরবে সহ্য করিব কেন? আমি অত্যাচারীর নিকট স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ না করিয়া কায্য হইতে বিরত থাকিলাম, তজ্জন্য আমাকে ৩০ বার বেত্রাঘাতের ভীতি প্রদর্শন করা হইল। আমি বলিলাম আমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিতে পার কিংবা তোমাদের যাহা খুশী করিতে পার আমি তোমাদের বর্বরতার নিকট আত্মসমর্পণ করিব না। আমার তখন প্রবল জ্বর, সেই অবস্থায় আমাকে হাতপায়ে বাঁধিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিল। আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল চোখে-মুখে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম এবং অল্পকাল মধ্যেই সংজ্ঞাহীন হইলাম....যখন হুশ হইল সাহায্যের জন্য অসহায় ভাবে চারিদিকে তাকাইলাম, দেখিলাম মিঃ বেরী আসিতেছেন। মিঃ বেরী আসিয়া আমাকে তাঁর সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে (Duel) আহ্বান করিলেন। আমাকে এই অবস্থায় অপরাগ দেখিয়া আমার পক্ষে অপর কাহাকেও আসিতে বলিলেন এবং তিনি নিজেই বীর সাভারকরকে টেলীফোনে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি আসিয়া দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং দেখিলাম সাভারকরই জয়ী হইলেন। আমি প্রখর রৌদ্রে দাঁড়াইয়াছিলাম ক্রমশঃ পুনরায় সংজ্ঞাহীন হইলাম। এই অবস্থায় কতক্ষণ ছিলাম বলিতে পারি না। যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল মনে হইল কেহ যেন আমাকে ঔষধ খাওয়াইতেছে। ইহার পর আমাকে হাসপাতালে পাঠানো হইল।'

এতদ্ব্যতীত বন্দীদিগকে অতিশয় নিকৃষ্ট শ্রেণীর খাদ্য দেওয়া হইত। ম্যালেরীয়া এবং উদরাময় ব্যাধির ছিল একাধিপত্য। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে অনেকেরই মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিত, কেহ বা পরিত্রাণের জন্য আত্মহত্যা করিত। লোক নয়নের অন্তরালে এই মর্মন্তুদ্ নারকীয় যন্ত্রণা জনগণের অজ্ঞাত ছিল। কারায়ত্ত বন্দীদের প্রতি মানবতা বিরোধী, মমতা-বিহীন এই বর্বরতার কথা সাভারকর বিশ্ববাসীর দৃষ্টি গোচর করিতে প্রয়াসী হইলেন। কিন্তু এই প্রয়াস সফল করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার ছিল। প্রথমতঃ কারাকর্তৃপক্ষ সাভারকরের প্রতিই সর্বাপেক্ষা কঠোর দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। বিশষ বিশেষ বিপ্লবীদিগকে চিহ্নিত করিবার জন্য তাঁহাদের গলায় 'ডি-টিকেট' (Danger) ঝুলাইয়া দিত কিন্তু বীর সাভারকরের গলায় ঐ টিকেট ঝুলাইয়া দিয়াও কারাকর্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত ও নির্বিঘ্ন হইতে পারিলেন না। 'ডি'-লৌহ

ফলক' গরম করিয়া বুকে সেঁকিয়া দিয়াছিল। নারায়ণবক্ষে ভৃগু পদ চিহ্ন সম দুঃখকষ্ট নির্যাতন নিপীড়ন সহনশীলতার মূর্ত প্রতীক সাভারকর-বক্ষে শক্তি মদ মত্ত শাসকের নির্মমতার চিহ্ন আমৃত্যু বিদ্যমান ছিল। বন্দীদের প্রতিই যে কঠোরতা অবলম্বন করিত তাহা নহে আন্দামানে পর্যটক বা সাধারণ ভ্রমণকারীদের প্রতিও সরকার সদা সর্তক দৃষ্টি রাখিতেন। লৌহ দৃঢ় আইন বেষ্টনী এবং প্রহরী প্রাচীরের মধ্যে থাকিয়াও বীর সাভারকর সুকৌশলে এই অত্যাচার উৎপীড়নের কথা ভারতে ও বর্হিভারতে প্রেরণ করিতে সমর্থ হইলেন। ইচ্ছা-শক্তি সর্ব শক্তিময়। সাভারকর প্রেরিত এইসব গুপ্ত সংবাদ মুকুট হীন সম্রাট সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী (ইংরাজ কথিত সারেণ্ডার নট ব্যানার্জী) তাঁহার বেংগলী' পত্রিকায়, প্যারীসে পণ্ডিত শ্যাম বর্মা তাঁহার 'বোম' পত্রিকায়, মাদাম কামা 'বন্দেমাতারম্' পত্রিকায়, আলড্রাড্ 'ওর্য়াডি পত্রিকায় প্রকাশ করিলেন এবং হরদয়াল আমেরিকায় 'গদর' পত্রিকায় ঘানিতে নিযুক্ত সাভারকরের ছবি সহ পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করিলেন। ফলে সভ্য জগৎ আর একবার ইংরাজ শাসককে তিরষ্কার করিতে লাগিল। ভারতেও ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। যদিও তখনকার দিনে এখনকার মত এত সংবাদ পত্র ছিল না এবং জনগণও এত রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ছিল না, তথাপি এই সব বিক্ষিপ্ত সংবাদে ভারতবাসী, বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত। আন্দামানের 'গোপন কথা' বাহিরে প্রকাশিত হইবার সংবাদে মিঃ বেরীও অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মত জ্বালিয়া উঠিতেন। 'শালালোক ক্যায়সা সংবাদ পাঠায়া হাম দেখ্ লেউঙ্গা। সব কউ কো হাম ঠাণ্ডা বানানে স্যাকতা হ্যায়' বলিতে বলিতে কখনো সদম্ভ পদ সঞ্চালনে কারাকক্ষ কাঁপাইয়া তুলিতেন এবং সম্মুখে অধঃস্তন কর্মচারী যাহাকে পাইতেন চড় থাপ্পরও মারিতেন। মিঃ বেরীর এই উন্মত্ত অবস্থাকে বন্দীরা বৃশ্চিক দংশনের সঙ্গে তুলনা করিতেন। এইসব সংবাদ কি প্রকারে প্রকাশিত হয় তাহা জানিবার জন্য কারা কর্তৃপক্ষ তাহাদের কয়েকজন অনুগত কারাবাসীও নিয়োগ করিয়াছিল। তাহাদের সেই চেষ্টা সফল না হইলেও সাভারকরকে সন্দেহ করিয়া সাভারকরের প্রতি রুদ্র মূর্তি ধারণ করিল। সাভারকরও দমিবার পাত্র নহেন! তিনিও অত্যাচারীর বিরুদ্ধে মাথা উচু করিয়া দাঁড়াইলেন যেন—

'দংশন-ক্ষত শ্যেন বিহঙ্গ
যুঝে ভুজঙ্গ সনে।'

বীর সাভারকর রাজনৈতিক বন্দীগণের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনে সমর্থ হইলেন। তিনি সকলকে আহ্বান করিলেন—বৃথা মৃত্যবরণ করিও না, যদি মৃত্যুই বরণ করিতে হয় তার পূর্বে তুল্য মূল্য গ্রহণ কর। বন্দীগণ সংঘবদ্ধভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং পুনঃ পুনঃ ধর্মঘট আরম্ভ করিলেন। ইহাতে কারা কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িলেন, অবশেষে ভারত সরকারের তদানিন্তন 'হোম মেম্বার' স্যার রেজিল্যাণ্ড ১৯১৪ সালে ১৬ই নভেম্বর বীর সাভারকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

ফলে আন্দামান কারা ব্যবস্থার সংস্কার করা হয় এবং বীর সাভারকর ও অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি কঠোরতাও যৎকিঞ্চিত শিথিল করা হয়।

বীর সাভারকর তাঁহার স্ত্রী যমুনা দেবীর নিকট বৎসরে মাত্র একখানা পত্র লেখিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। আন্দামানে দেড় বৎসর বন্দী জীবন যাপন করিবার পর যেই পত্রখানি লেখিয়াছিলেন তার সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল।

'উক্ত কারাগারে আসিবার পর হইতে আমি উল্লেখযোগ্য কোন রোগ ভোগ করি নাই। শরীরের ওজন ঠিক রাখিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। আমার শ্যারীরিক ও মানসিক অবস্থা ভালই আছে।........কারাজীবন ভালই হউক আর মন্দই হউক পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির মধ্যে আমার মন সমতা বিধান রক্ষা করিয়া চলিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহা এক আশ্চর্য ব্যাপার বলিয়া মনে হয় যে, সমগ্র মহাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া এখন মাত্র ১২ ফিট অপেক্ষা একটি ক্ষুদ্র কক্ষে গৃহ সুখই অনুভব করিতেছি। পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষণ পূর্বক এই সহনশীলতা মানবচরিত্রের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

সন্ধ্যাকালে অতি অল্পসময় প্রাণায়াম করিয়া যখন শয্যাগ্রহণ করি তখন গভীর নিদ্রাসুখই উপভোগ করি এবং কারাকক্ষে বন্দীর শয্যায় যে শায়িত আছি তাহা প্রত্যুষে জাগরিত হইবার পূর্বে উপলব্ধি করিতে পারি না। প্রভাতে ঘণ্টানিনাদে জাগরিত হই, ইহাতে মনে হয়, আমি যেন উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য কোন উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছি। পূর্বাহ্নে ১০টা পর্যন্ত যন্ত্রচালিতের মত আমার হস্তপদ কঠোর কার্যে লিপ্ত থাকে। কিন্তু কুসুমাকৃষ্ট ভ্রমরের মত আমার মন দুর্বার গতিতে বহির্গত হইয়া বিবিধ বন-উপবন-সাগর সৈকতে-পর্বতমালা শ্যামল শস্য ক্ষেত্র এবং সুনীল গগনে চিত্তকর্ষক সৌন্দর্যের অন্বেষণ করে, ইহাতে আমি কয়েকছত্র কবিতা রচনায় সমর্থ হই। আহারের পর ১২টার সময় পুনরায় নির্দ্ধারিত কর্মেলিপ্ত হই, এবং অপরাহ্ন ৪টার সময় অবকাশ পাই। এইরূপভাবে দৈনিক কায্যপদ্ধতি নির্বাহ হইতেছে.............।'

আন্দামানে নির্বাসিত সাধারণ বন্দীরা নিরক্ষর, দুশ্চরিত্র এবং নিম্নশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। অন্যান্য স্বাধীনদেশের মত ইহাদের চরিত্র সংশোধনের কোনই ব্যবস্থা ছিল না। বীর সাভারকরের মহান হৃদয় বেদনায় ভরপুর হইয়া উঠিল। তিনি তাহাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও চরিত্র সংশোধনের জন্য সচেষ্ট হইলেন। সহৃদয় ব্যবহার, সস্নেহ আলাপ এবং চরিত্র মাধুর্যে এইসব খুনী ডাকাত অল্পসময়ের মধ্যেই সাভারকরের প্রতি আকৃষ্ট হইল। তিনি তাহাদিগকে ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভূগোল মুখে মুখেই শিক্ষা দিতেন। কাগজ কলম বা শ্লেট পেন্সিলের অভাবে নিরক্ষরদিগকে মাটিতেই কাঠকয়লার সাহায্যে লেখাপড়া শিখাইতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম কারাকর্তৃপক্ষ সাভারকরের এই উদ্যম সন্দেহের চক্ষে দেখিলেও সন্দেহ ভঞ্জন হইতে বেশী দেরী হইল না। ঔদ্ধত খুনী ডাকাতেরাও সাভারকরের সংস্পর্শে আসিয়া শান্ত শিষ্ট আচরণ শিখিয়াছে লক্ষ্য করিয়া আবশ্যক কাগজ কলম ও পুস্তকাদি কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহাদের জীবনযাত্রা পদ্ধতি অবিশ্বাস্যরূপেই পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ভারত-মিত্র, প্রতাপ, প্রভাত, সরস্বতী, আর্যগেজেট, কেশরী, বেঙ্গলী প্রভৃতি পত্রিকাও তাহারা পড়িতে পাইত। কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুক্তিলাভ করিবার পর বীর সাভারকর

তাঁহার নকট পত্রালাপে নানা বিষয় জানিতে চাহিয়াও যেন আকাঙ্খার তৃপ্তি হইত না। তিনি লিখতেন, 'তোমার পর পত্রে আমাকে অবশ্যই জানাইবে বর্তমানে আমাদের মাতৃভূমির অবস্থা কিরূপ; উল্লেখযোগ্য কোন স্বদেশী শিল্পপ্রতিষ্ঠান যেমন লোহার কারখানা, নূতন নূতন মিল, ষ্টীমারঘাট গড়িয়া উঠিয়াছে কি না। রিপাবলিক চীনের খবর কি? ভাবিও না যে চীনের এই আন্দোলন একদিনেই গড়িয়া উঠিয়াছে। ১৮৫০ খৃঃ অব্দ হইতেই এই জাগরণের সূত্রপাত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়গণ দাবী পূরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন কিনা, দেশে কোন নূতন আইন বিশেষতঃ মহামতি গোখেলের শিক্ষা বিল পাশ হইয়াছে কিনা জানাইও, লোকমান্য তিলক কখন মুক্তিলাভ করিবেন।'

কারা কর্তৃপক্ষ বন্দীদিগকে কোন পুস্তকাদি দিতেন না। বন্দীগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া আন্দোলন করিবার ফলে বাড়ী হইতে পুস্তক আনিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। নারায়ণ সাভারকর প্রচুর সংখ্যক পুস্তক ডাকযোগে বীর সাভারকরের নিকট পাঠাইতেন। বলা বাহুল্য মাত্র যে কারা কর্তৃপক্ষ তাহাদের মনোমত পুস্তকই বন্দীদের হাতে তুলিয়া দিতেন।

বীর সাভারকর ফরাসীতে তাঁহাদের এক বন্ধুর নিকট একখানি পত্র গুপ্তপথে প্রেরণ করেন। পত্রখানিতে সাভারকর জীবন জিজ্ঞাসার সুরই ধ্বনিত হয়। পত্রখানি দৈবাৎ আসফ আলীর হস্তগত হয়। সেই সময় তিনি লণ্ডনে আইন অধ্যায়ন করিতে ছিলেন। পত্রখানির উৎকর্ষতার মুগ্ধ হইয়া তিনি মূল পত্রখানি রক্ষা করিয়া তার অনুলিপি প্রাপকের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

পত্রখানির অনুবাদ ঃ—

'........আমার ক্ষুদ্র কারাকক্ষ হইতে অনন্ত আকাশের কিয়দংশ দেখিতে পাওয়া যায়। সন্ধ্যে লগ্নে পশ্চিম গগনের বিচিত্রবর্ণ সুষমা মণ্ডিত অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করিতে করিতে আমার মন অপার আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠে, কিন্তু কখনো কখনো মন বহির্জগতের যোগাযোগ বঞ্চিত বলিয়া আত্মভোলা শিশুর মত প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। বিবেক তখন শিশুমনকে জিজ্ঞাসা করে তুমি কাঁদিতেছ কেন? কোন অজ্ঞাত বেদনা তুমি অনুভব করিতেছ ? এই বালসুলভ চিত্ত চাঞ্চল্য কি তোমার উপযুক্ত—তুমি ব্যক্তিগত ভাবে ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইতে চাহিয়াছিলে? যদি তাহাই তোমার কাম্য তুমি স্বার্থান্ধ, কাপুরুষ, ক্ষুদ্রচেতা; কিন্তু বিশ্ব নিয়ন্তা জানেন এবং আমিও জানি তুমি ব্যক্তিগত সুখ ভোগের জন্য কিছুই কামনা কর নাই। নাম-যশ-অর্থ কিছুই তোমার কাম্য নহে। তোমার প্রেয় ও শ্রেয় যাহা অপরের অজ্ঞাত হইতে পারে তাহা আমি জানি—তুমি একমাত্র চাহিয়াছিলে শৃঙ্খলিত ভারতবাসীর মুক্তির জন্য ত্যাগ, দুঃখ ভোগের অধিকার। তোমার জীবনের প্রতি মুহূর্ত, তোমার শক্তির প্রতি অণুপরমণু, তোমার ধমনীর প্রতিবিন্দু রক্ত ক্ষয় হইয়াছে আত্ম নিগ্রহের মধ্যে জাতিকে জাগ্রত করিবার জন্য, সুতরাং কেন এই অনুশোচনা?''

'যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি।' যেইসব পুরাতন মুসলমান বন্দীদের উপর নবাগত হিন্দুবন্দীদের তত্ত্বাবধানের ভর অর্পিত হইত তাহারা বিশেষ পক্ষপাতিত্ব সহকারে হিন্দু

বন্দীদিগকে উৎপীড়ন করিত এবং ইসলাম ধর্মগ্রহণ করিলে তাহাদিগকে প্রচুর সুযোগ সুবিধা করিয়া দিবার প্রলোভন দেখাইত, সেই জন্য অনেকেই ইসলাম ধর্মগ্রহণ করিত। সুদূরে বন্দী-নিবাসে থাকিয়াও স্বধর্ম প্রচারের এই ঐকান্তিক নিষ্ঠা দেখিয়া বীর সাভারকর হিন্দুজাতির সংখ্যা হ্রাসের প্রকৃত কারণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন। কারা কর্তৃপক্ষের নিকট এই দুর্নীতির প্রতিবাদ করিলেন এবং শুদ্ধি আন্দোলন প্রচলন করিলেন। ফলে ইসলাম প্রচারকদের ক্রোধের সঞ্চার হইল সুতরাং তাহারা দাঙ্গা হাঙ্গামা আরম্ভ করিল। ক্ষিপ্ত জনতা গণেশ সাভারকরকে আক্রমণও করিয়াছিল। বীর সাভারকর ইসলামি প্রচার কায্য বন্ধ করিতেই সমর্থ হন নাই, অধিকন্তু ধর্মভ্রষ্ট হিন্দুদিগকে স্বধর্মে দীক্ষিত করিতে সমর্থও হইয়াছিলেন।

১৯১৪ সালে ১ম বিশ্বযুদ্ধে নিম্নশ্রেণীর বন্দীগণ নানপ্রকার গুজব বিশ্বাস করিয়া ব্রিটিশের সুনিশ্চিত পরাজয় স্থির করিয়াছিল সুতরাং মুক্তি আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। যুদ্ধকালে নবাগত মুসলিম বন্দীগণও প্রচার করিতেছিল যে, আমীর সাহেব ভারত আক্রমণ করিবেন এবং ভারতের হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবে। হিন্দু বিপ্লবীগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে এবং জার্মান সৈনিকগণ অবতরণ করিয়া তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিবে, ইত্যাদি নানারূপ প্রবল জনবর প্রচার হইয়া পড়িল।

১৯১১ খৃঃ অব্দে রাজ্যভিষেক উপলক্ষে রাজনৈতিক বন্দী এবং ১ম বিশ্বযুদ্ধ অবসানে সর্বশ্রেণীর বন্দীদের ভণ্ড হ্রাস করা হইয়াছিল। কিন্তু বীর সাভারকর দুইবারই এই বিশেষ রাজানুকম্পা হইতে বঞ্চিত হইলেন।

ভারতের মুক্তি সংগ্রামে সাভারকর ভ্রাতাদের নির্ভীকতা এবং ত্যাগ মণ্ডিত কষ্টসহিষ্ণুতা দেশবাসী বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের মুক্তির জন্য ভারতব্যাপী প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল। বোম্বাইর 'ন্যাশানেল ইণ্ডিয়ান' বীর সাভারকরের মুক্তির জন্য ভারত সরকারের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন জানাইয়াছিলেন। ১৯২০ খৃঃ অব্দে ফেব্রুয়ারীর শেষ দিকে বিঠল ভাই প্যাটেল এবং দাদা সাহেব খাপার্দে ল্যাজিস্ লেটিভ এসম্বলীতে বীর সাভারকরের মুক্ত দাবী করিয়া পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন! গান্ধীজীও 'ইয়ং ইণ্ডিয়াতে' সাভারকর ভ্রাতৃদ্বয়ের মুক্তি সমর্থন করিয়া প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেন। বীর সাভারকরের রোমাঞ্চর কায্যকলাপ যত্রতত্র আলোচ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভারতবাসী সাভারকর সপ্তাহ পালন করিয়া দিকে দিকে দাবী তুলিল—সাভারকরের মুক্তি চাই।' নানা স্থানে সভা ও শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান হইতে লাগিল, রাষ্ট্রীয় সভার প্রত্যেক প্রাদেশিক অধিবেশন এমন কী অখিল ভারত জাতীয় মহাসভার অধিবেশনেও সাভারকরের মুক্তি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। গণস্বাক্ষর পত্রেও মুক্তি দাবী জ্ঞাপন করা হইয়াছিল। উক্ত **গণপত্রে স্বাক্ষর করিবার জন্য পণ্ডিত নেহেরুর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহা ছিড়িয়া ফেলিয়া ছিলেন।** তথাপি যমুনাদাস মেটার প্রচেষ্টায় ৭০ হাজার বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়া ভারত সরকারের নিকট আবেদন জানাইয়াছিলেন সাভারকরের মুক্তির জন্য।

সাভারকর ভ্রাতাদের মুক্তির জন্য ভারতের জনমত যখন জাগ্রত হইয়া উঠিল তখন

কলিকাতা হইতে প্রকাশিত 'ক্যাপিটাল' নামে একখানা ইঙ্গ-ভারতীয় পত্রিকা সাভারকর ভ্রাতৃদ্বয়ের নামে এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশ করিল। উক্ত সংবাদের ফল কথা।

আন্দামান দ্বীপের সঙ্গে ভারতবর্ষ বা ব্রহ্ম দেশের বেতার যোগাযোগ নাই। পোর্ট ব্লেয়ারের সঙ্গে কলিকাতা মাদ্রাজ ও রেঙ্গুণের যোগাযোগ আছে। মহাসমরের পূর্বে সাভারকর ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে সম্ভবত জ্যেষ্ঠভ্রাতা অমায়িক ব্যাবহার ও কার্যকুশলতার গুণে কারা কর্তৃপক্ষের বিশেষ প্রিয় পাত্র হইয়া ওঠেন। সেই জন্য তিনি অপরাপর বন্দীগণ অপেক্ষা অধিক সুযোগ ও স্বাধীনতা প্রাপ্ত হন। অবশেষে তিনি বেতার ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী নিযুক্ত হন। কিন্তু অকৃতজ্ঞ মারাঠা জাতির রাজদ্রোহিতা স্বভাব ধর্ম। সুমাত্রা দ্বীপে জার্মানীর বেতার যন্ত্রের একটি ঘাঁটি আছে, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সাভারকর তথাকার জার্মান নায়ক দিগকে ব্রিটিশের অধিকৃত অরক্ষিত দ্বীপটি দখল করিবার জন্য এই বলিয়া উৎসাহিত করিল যে, যদি তাহারা এই দ্বীপটি দখল করে তাহা হইলে ইহাকে ডুবো জাহাজের ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করিয়া কলিকাতার ব্যবসাবাণিজ্য এবং রেঙ্গুন হইতে ভারতগামী তৈল জাহাজ প্রভৃতি করায়ত্ত করিবার সুবর্ণ সুযোগ সুবিধা হইবে। অধিকন্তু ইহাও স্থির হয় যে, জার্মান জাহাজ অস্ত্রশস্ত্রাদি আমদানি করিয়া সুন্দরবনের গহণ অরণ্যে পৌঁছাইয়া দিবে এবং ভারতীয় বিপ্লবীগণও জার্মানদিগকে সাহায্য করিতে পারিবে। আমেরিকা তখনো যুদ্ধে যোগ দান করে নাই, সুতরাং যুদ্ধরত যে কোন জাতির নিকটই আমেরিকা অস্ত্র বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেছিল। জার্মানী ইউ, এস্, এ-র নিকট হইতে একখানি জাহাজ রাইফেল, বন্দুক ও অপরাপর বিস্ফোরক দ্রব্য এবং যুদ্ধ সরঞ্জাম পূর্ণ করিয়া এবং অপর একখানি জাহাজে ছয়খানি ডুবো জাহাজের বিভিন্ন অংশ ভারত অভিমুখে প্রেরণ করিয়াছিল। আমাদের সৌভাগ্য বশতঃ জাহাজ দুই খানি ভারত মহাসাগরের জলরাজি অতিক্রম করিবার পূর্বেই এই ভীষণ ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হইয়া পড়ে।'

রিসার্চ ডায়েরী

ক্যাপিটেল ২৬মে, ১৯২১

এই সংবাদ প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সাভারকর ভ্রাতৃত্রয়ের সর্বকনিষ্ঠ ডাঃ নারায়ণ রাও সাভারকরের নির্দেশে তাঁহাদের 'সলিসিটার্স' বোম্বাইর প্রসিদ্ধ মেসার্স মতিলাল এণ্ডখের উক্ত পত্রিকার সম্পাদক, প্রকাশক এবং মুদ্রাকরকে এই মর্মে নোটীশ দিলেন যে উক্ত সংবাদের সত্যতা প্রমাণ কিম্বা মিথ্যা সংবাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হউক অন্যথায় আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইবে। উক্ত নোটীশ পাইবামাত্র ক্যাপিটাল অনুরূপ সংবাদ প্রকাশের জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া অন্য একখানি পত্র প্রকাশ করে।

কারা কর্তৃপক্ষের আদিম যুগের এই বর্বরতার বিরুদ্ধে বীর সাভারকর যেমন প্রতিবাদ ও প্রতিকারের জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন, বন্দীগণের নিরক্ষরতা দূরীকরণ, শুদ্ধি ও সংগঠনে ব্রতী ছিলেন তেমনই। অচিরে যাহাদের মুক্তি লাভের সম্ভাবনা ছিল তাহাদের সাহায্যে স্বরচিত কবিতাবলী এবং বিবিধ সংবাদ প্রেরণ করা, ঐ সব সংবাদ সম্বন্ধে কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে সন্দেহ ক্রমে ধৃত হইবার উপক্রম হইলে কি প্রকারে তাহা বিনষ্ট

করিতে হইবে ইত্যাদিও শিক্ষা দিতেন। তাহারা ভারতে আসিয়া ঐ সব সংবাদ ও কবিতা ডাঃ নারায়ণ রাও সাভারকরের নিকট পৌঁছাইয়া দিত।

ক্রমশঃ বীর সাভারকর অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। প্রথমতঃ চিকিৎসার কোন সুব্যবস্থাই হইল না এবং রোগও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই সময় সামান্য দুগ্ধই ছিল একমাত্র পথ্য। অবশেষে হাসপাতালে ভর্তি করানো হইলেও বন্দীজীবনের কঠোরতা বিন্দুমাত্র শিথিল করা হয় নাই। এই সময় তিনি **'মৃত্যুশয্যায়'** শীর্ষক প্রসিদ্ধ কবিতাটি রচনা করেন।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় নির্বাসিত— ভাইপরমানন্দ ১৯২০ খৃঃ অব্দের শেষদিকে আন্দামান হইতে মুক্তিলাভ করেন। তিনি সাভারকরের মুক্তির জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই সময় কর্ণেল ওয়েজউড্ (Col Wedge Wood) নামে ব্রিটীশ পার্লামেন্টের জনৈক প্রভাবশালী সদস্য ভারতে আগমন করেন। সাভারকরের মুক্তির জন্য ভাই পরমানন্দ তাঁহাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেন। উক্ত সদস্য মহোদয়ের ঐকান্তিক হস্তক্ষেপের ফলেই বীর সাভারকরের প্রতি প্রদত্ত 'ডিটিকেট' প্রত্যাহৃত হইয়াছিল ১৯২১ খৃঃ অব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী। ঐ বৎসর মে মাসে সাভারকর ভ্রাতৃদ্বয় আন্দামন হইতে কলিকাতায় আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত হইলেন এবং তথা হইতে গণেশ সাভারকর বিজাপুর জেলে এবং বীর সাভারকর রত্নগিরি জেলে স্থানান্তরিত হইলেন ১৯২১ সালে মে মাসে।

কাগজ কলমের অভাবে কারা প্রাচীরে কয়লা, পেরেক, বা নখের সাহায্যে তিনি আত্মজীবনী (Story of my Transportation) রচনা করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা অসঙ্গত হইবে না যে, কারাগারে বৈদ্যুতিক আলোবাতাসে আরাম কেদারায় বসিয়া এবং প্রয়োজনীয় উপাদান পার্শ্বে রাখিয়া পণ্ডিত নেহেরু রচনা করিয়াছিলেন 'Discovery of India' বীর সাভারকর **'হিন্দুত্ব'** পুস্তকখানিও রত্নগিরি কারাগারেই রচনা করেন। ১৯২৪ সালে জানুয়ারী মাসে শর্তাধীনে রত্নগিরি জেলায় অন্তরীন হন।

রত্নগিরিতে সাভারকরের গতিবিধি সীমাবদ্ধ থাকিলেও অল্পকাল মধ্যেই তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া যে সাবারকর-মণ্ডলী গড়িয়া উঠিয়াছিল তার কার্য্যকলাপ রত্নগিরি জেলা ছাড়াইয়া পার্শ্ববর্তী জেলায়ও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সংগ্রামী সাভারকর সমাজ সংস্কার ও সাহিত্য সেবায় আত্ম নিয়োগ করিলেন। 'আমার শক্তি থাকিলে সমাজ হইতে অস্পৃশ্যতা চূর্ণ করিয়া দূর করিতাম', বলিয়াই তিনি নিষ্ক্রিয় রহিলেন না। সামাজিক অভ্যুত্থান, রাজনৈতিক স্বাধিকার অর্জন এবং আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার জন্য অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে বহুজনসভায় বক্তৃতা করিলেন। জনৈক বিত্তশালীর বদান্যতায় ২,৫০,০০০ টাকা ব্যয় করিয়া শ্রীপতিপাবন মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। মন্দির প্রতিষ্ঠা দিবসে ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলে এক সঙ্গে অঞ্জলি প্রদান করিলেন। তিনি সমাজে পঙ্‌ক্তি ভোজন প্রচলন করিলেন। ইহাতে রক্ষণশীলগণ বিরোধীতা করিতে লাগিল, কিন্তু তাহারা সাভারকরের যুক্তি তর্ক খণ্ডন করিতে পারিল না। নব্য সমাজ সাভারকরের আদর্শই গ্রহণ করিল। তাঁহারা অসঙ্কোচে চণ্ডাল মেথর প্রভৃতির গৃহে পূজা পার্বণে এবং সামাজিক

ক্রিয়াকলাপে অংশ গ্রহণ করিত। বীর সাভারকর অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য এবং অপরিচ্ছন্নতা দূরীকরণে সচেষ্ট হন।

'জাতের নামে বজ্জাতি সব, জাত জ্বালিয়া খেলছে জুয়া
ছুঁলে পরেই জাত যাবে, জাত ছেলের হাতের নয়তো মোয়া
* * * *
জাত নাই আজ, শুধু আছে জাত শেয়ালের হুক্কাহুয়া।'

অতঃপর সাভারকর **শুদ্ধি** আন্দোলনের দ্বারা ধর্মচ্যুত হিন্দুদিগকে পুনরায় স্বীয় ধর্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। ফলে খৃষ্টান ও মুসলমানগণের **ক্রোধের সঞ্চার** হইল। নানা প্রকার ভীতি প্রদর্শন করিয়াই তাহারা ক্ষান্ত হইল না। পথে একদিন সাভারকরকে আক্রমণ ও আহত করিল। হিন্দু তরুণরাও প্রতি আক্রমণ করিয়া সমুচিত শিক্ষা দিয়াছিল এবং আদালতে অভিযুক্ত করিয়া উপযুক্ত পুরস্কার বিতরণ করিয়াছিল। ইহার ফলে ইসলাম সম্প্রদায় গুণ্ডা নীতি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং খৃষ্ট মিশনরীরাও তাহাদের প্রচার যন্ত্র বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতি বন্ধ করিয়া রত্নগিরি জেলা পরিত্যাগ করিয়াছিল। সাভারকর উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানাইলেন, **"স্বধর্ম ত্যাগ করিবার অর্থই হইল জাতীয়তা ত্যাগ করা; জাতীয়তা বিরোধী কায্য অবশ্যই বন্ধ করিতে হইবে। একজন হিন্দু ধর্মান্তরিত হওয়ার অর্থ এক পদক্ষেপ মাতৃ-ভূমি পরপদানত হওয়া।"**

তথা কথিত নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণ এই বীর পুরুষকে মর্তের মূর্ত দেবতা রূপে শ্রদ্ধা করিতেন। তাহারা তাঁহাকে তাহাদের জাতীয় সভার সভাপতিও উপর্যুপরি নির্বাচন করিয়াছিলেন। গান্ধীজীর হরিজন সংগঠন এবং সাভারকরের অস্পৃশ্যতা বর্জন ও শুদ্ধি আন্দোলনের মূখ্য উদ্দেশ্য এক কিন্তু হরিজন আন্দোলনের ফলে **বহু জাতি বিভক্ত** হিন্দু সমাজে আর **একটি জাতির অভ্যুদয় হইল,** যাহারা মনে প্রাণে নিজেকে হিন্দু বলিয়া ভাবিতে পারে নাই। সেইজন্য তাহারা দলীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ধর্মান্তরের ভয় দেখাইত। অবশেষে আম্বেদকরের অঙ্গুলী সংকেতে কয়েক লক্ষ হরিজন বৌদ্ধ নামে অভিহিত হইলেন; কিন্তু সাভারকরের দীক্ষিত হিন্দুগণ 'এক দেহে হল লীন।'

মহাহিন্দুজাতি গঠন করাই বীর সাভারকরের জীবনব্রত। পর্তুগীজ ও ফরাসী অধিকৃত ভারত ভূমির হিন্দু স্বাধীন নেপাল রাজ্যের হিন্দুরা বিশাল ভারতের বিরাট হিন্দু সংখ্যারই অংশ বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার নির্দেশেই রত্নগিরি মহাসভা, নিখিল বিশ্ব হিন্দু আন্দোলন (Pan Hinduisim) প্রবর্তন করেন। মহামান্য নেপালাধিপতিকে হিন্দু মহাসভার সভাপতি হইতেও আমন্ত্রণ জানান, তিনি সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া বাণী প্রেরণ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে 'ভিক্টোরীয়া ক্রশ্' প্রাপ্ত চন্দন সিংকে রত্নগিরিতে নিমন্ত্রণ করিয়া বিপুলভাবে সর্ম্বদ্ধনা জ্ঞাপন করেন। ইহার ফলে ভারত ও নেপালবাসীর মধ্যে **সৌহার্দ্য** গড়িয়া উঠিয়াছিল।

রত্নগিরিতে অবস্থানকালেই সাভারকর কয়েকখানি নাটক রচনা করেন এবং মারাঠা ভাষা ও অক্ষর সংস্কার করেন তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।

হিন্দুমহাসভার অসি লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকার পরিকল্পনা সাভারকর রত্নগিরি হইতেই প্রেরণ করিয়াছিলেন।

ইউরোপে অবস্থানকালেই বীর সাভারকর ঘোষণা করিয়াছিলেন, ভারত নিশ্চই স্বাধীন হইবে, স্বাধীন ভারতে সকলের সমান ভোটাধিকার থাকিবে। একটি মাত্র রাষ্ট্রভাষা থাকিবে তাহা হইবে দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দী। ভারত ধর্ম নিরপেক্ষ থাকিবে। স্বাধীন ভারতে আইন করিয়া সকল হিন্দুর মন্দিরে প্রবেশ অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে আর পরাধীন ভারতেই সাভারকর সকল্ হিন্দুকে এই মর্যাদা দিয়াছেন। বৈদেশিক শাসনমুক্ত ভারতে সর্বভারতীয় রাষ্ট্র পঞ্জিকা গ্রহণে সাভারকরই অগ্রণী। কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, দার্শনিক, চিন্তা নায়ক, বিপ্লবী সাভারকর প্রবুদ্ধ-ভারতের **পথিকৃৎ**।

১৯২৩ খৃঃ অব্দের মে মাসে ৩য় বার্ষিক মহারাষ্ট্র অধিবেশনে বীর সাভারকরের মুক্তিদাবী প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সাভারকর 'রিলিজ কমিটি' গঠিত হয়। উক্ত শিরোনামে একখানি পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়। ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বাই নগরে এক বিরাট জনসভায় পুনরায় তাঁহার মুক্তিদাবী জ্ঞাপন করা হয়।

ডিসেম্বর মাসে বোম্বাইর গভর্ণর স্যার জর্জলয়েড্ সাভারকরের সঙ্গে তাঁহার মুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং কতকগুলি সর্তসাপেক্ষ মুক্তিদানে সম্মত হন। কিন্তু ভগ্ন কাঁচবৎ ঘৃণাভরে শর্তাধীন মুক্তি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। অবশেষে বিবিধ ঘটনা পরম্পরায় বোম্বাইর তৎকালীন অর্থমন্ত্রী যমুনাদাস মেটার আন্তরিক চেষ্টায় ১৯৩৭ সালের ১০ই মে সুদীর্ঘ ২৭ বৎসর নির্বাসিত জীবন যাপন করিবার পর বীর সাভারকর মুক্তি লাভ করিলেন। মহাবিপ্লবী নায়ক রাসবিহারী বসু মহোদয় সাভারকরের এই মুক্তি পুনর্জন্ম বলিয়া জাপান হইতে অভিনন্দন বাণী প্রেরণ করেন। ১০ই মে ১৮৫৭ স্বাধীনতা ঘোষণার দিন। ১০ই মে বিদগ্ধ বন্দী সাভারকরের মুক্তিলাভের দিন। স্মরণীয় বরণীয় ১০ই মে, তোমায় নমস্কার।

(আট)

'আমাদের জাতি নিজেদের বিশেষত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে, সেই জন্যই ভারতের এত দুঃখকষ্ট। সেই জাতীয় বিশেষত্বের যাহাতে বিকাশ হয় তাহাই করিতে হইবে। খাঁটি হিন্দুদেরই এই কায্য করিতে হইবে'। — স্বামী বিবেকানন্দ।

বীর সাভারকর মুক্তিলাভ করিবার পর ভারতীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে যেমন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল তেমনই প্রবল জল্পনা কল্পনা চলিল, তিনি কোন রাজনৈতিক দলে যোগদান করিবেন। কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট, সোসিয়ালিষ্ট, হিন্দু মহাসভা সোৎসাহে তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানাইলেন। তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আদর্শ, উদ্দেশ্য কর্মপদ্ধতি এবং ভারতীয় রাজনীতির উত্থান পতন গতি অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তৎকালে ভারতের বৃহত্তর দুইটি গণপ্রতিষ্ঠান কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভার গোড়া পত্তন সম্বন্ধে প্রসঙ্গত কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম সভাপতি মিঃ এ, ও, হিউম (উমেশচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম সভাপতি)। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার জন্য মিঃ হিউমকে ব্রিটীশ পার্লামেন্টে কৈফিয়ৎ ভাজন হইতে হইয়াছিল এবং তিনি স্বীয় কার্য্য সমর্থ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'It (Indian National Congress) is the Safety Valve of the Birtish empire in India.' এই উক্তি যে কত বড় সত্য তাহা ১৮৮৬ সালে কংগ্রেসের ২য় অধিবেশনে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সভাপতি মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কংগ্রেস কি ব্রিটীশ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ ও বিপ্লবের লীলা কেন্দ্র, (উত্তর হইল না না) না ব্রিটীশ শাসনের ভিত্তিমূলে আর একটি প্রস্তর? (উত্তর হইল হাঁ হাঁ)। কংগ্রেস আবেষ্টনীর এমনই প্রভাব যে দেশবন্ধুর বিপ্লব মনোবৃত্তি পর্য্যন্ত পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল। ১৯২৪ সালে ফরিদপুর অভিভাষণে তিনি বলিয়াছিলেন, আমরা এই প্রতিশ্রুতি দিব যে আমরা বাক্য কার্য্য ও ইঙ্গিতে বিপ্লববাদে উৎসাহ দিব না।'*

মিঃ হিউম স্যার অকল্যাণ্ড্ কলভিনের নিকট একপত্রে লিখিয়াছিলেন, 'ব্যয় সাপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা, অত্যাচারী দুর্নীতি পরায়ণ পুলিশ, কঠোর রাজস্ব সংগ্রহ নীতি এবং অস্ত্র আইন দেশের মধ্যে একটা বিরাট অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়াছিল। সর্বোপরি ব্রিটিশের লুণ্ঠন শোষণ ও উৎপীড়ন হেতু দেশে যে দারুণ দারিদ্র্যের সৃষ্টি হইয়াছিল তদ্দরুণ হতাশা তাড়িত হইয়া জনসাধারণ একটা কিছু করিতে মনস্থ করিয়াছিল, ধর্মগুরু বা মোহান্তগণ বিভিন্ন মঠাধ্যক্ষের নিকট যে সমস্ত নির্দেশলিপি প্রেরণ করিতেছিলেন তাহাতে ইহা স্পষ্ট ছিলযে লর্ড লিটনের সময় দেশব্যাপী একটা বিপ্লব ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছিল। ইতস্ততঃ হাঙ্গামা, অপ্রিয় লোকের হত্যা, ধনীর বাড়ী ডাকাতি, ব্যাঙ্ক ও বাজার লুঠ প্রভৃতি উচ্ছৃঙ্খল কায্যাবলী বিভিন্ন শক্তি সংঘাতে যে কোন দিন জাতীয় বিপ্লবরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। নীলকর আন্দোলনের মত শিক্ষিত লোকে উহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিলে উহা সিপাহী বিদ্রোহের চাইতে ব্রিটীশ শাসনকে অধিকতর বিপন্ন করিতে পারে।' (Life of A. O. Hume by Sir Wedderburn, Page 77–78– বঙ্গানুবাদ)

সিপাহী বিদ্রোহ, সাধু বিদ্রোহ, নীলকর বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, **বাসুদেব বলবন্তরাও ফাড়্কের** ব্রিটীশ বিরোধী সশস্ত্র অভিযান, মিঃ হিউম বিক্ষিপ্ত ঘটনা বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। **এইসব বিদ্রোহ যাহাতে সর্বভারতীয় ব্যাপক বিপ্লবীয় আন্দোলনে পরিণত না হয় তার জন্য দূরদর্শী মিঃ হিউম ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠন করিলেন, ভারতবাসীর উদ্যম শক্তি সাহস ও প্রেরণা ভিন্ন বা ভ্রান্তপথে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য।** ১৮৮৫ হইতে ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত কংগ্রেসের কোন সংগঠন ছিল না। নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট স্থানে একটা অধিবেশন হইত মাত্র, তাহাতে লাটসাহেব প্রমুখ রাজপুরুষগণও উপস্থিত থাকিতেন।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় মিঃ হিউমের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া লোকমান্য তিলক, লালা লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ জননায়কগণ ভারতব্যাপী স্বাদেশীকতার আলোড়ন সৃষ্টি করিলেন। ক্ষুদ্রাকার পৃথিবী ভারতের গগনমণ্ডল মুখরিত হইল 'বন্দেমাতরম্' মুক্তি-মন্ত্রে। ১৯২০—২১ সালে গান্ধীজী কংগ্রেসে যোগদান করিবার পর হইতে কংগ্রেসের

* ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ১ম খণ্ড ১০৯ পৃষ্ঠা।

ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি হইল। ধর্মপ্রসূ ভারত ভূমিতে— ধর্মপ্রাণ হিন্দুজাতি সাদরে গান্ধীজীকে বরণ করিয়া লইল। তাঁহার ত্যাগ মণ্ডিত চরিত্র মাধুর্য, সন্ন্যাসী সদৃশ সহজ জীবন যাপন, এবং পরম সহিষ্ণুতা অতি সহজেই জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ভারতীয় বিপ্লবীরা যে ইংরাজ শাসকের বুকের পাঁজরা কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯০১ সালে গঠিত 'অভিনব ভারত'-এর এবং ১৯০৩ সালে গঠিত 'অনুশীলন' দলের কায্যকলাপে, ১৯০৮ সালে খুদিরামের ফাঁসি, ১৯০৮ সালে বারীন ঘোষের মামলা, ১৯১০ সালে বীর সাভারকরের মামলা, ১৯১৫ সালে বাঘা যতীন অর্থাৎ যতীন্দ্র নাথ মুখার্জীর বুড়ী বালামের তীরে সশস্ত্র সংগ্রামের আহ্বান, ভানসি আয়ার, রাজগুরু, শুকদেব, ভগবৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ প্রমুখ বীর বিপ্লবীদের দুর্দমনীয় নির্ভীকতায়। ইংরাজ বুঝিতে পারিল এই সর্বনাশা সন্ত্রাসবাদীরা প্রসার লাভ করিলে তাহাদের আর অব্যাহতি নাই। গান্ধীজী ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গ মঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া যখন শুনাইলেন যে শান্তিপূর্ণ অহিংসপথে স্বাধীনতা আনিয়া দিবেন তখন ইংরাজ শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। সুচতুর ইংরাজ সুকৌশলে তাঁহার গুরুত্ব ও নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইল; কারণ তাহারা বুঝিল ভারতব্যাপী সন্ত্রাসবাদ ধ্বংস করিবার গান্ধী নীতিই অমোঘ অস্ত্র। গ্রামে গ্রামে, থানায় থানায়, প্রতি জেলায় কংগ্রেস কায্যালয় গড়িয়া উঠিল। মুষ্টিমেয় নিরস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক লইয়া গান্ধীজী যেদিন লবণ আইন অমান্য করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন সেদিন যেন ভারতে ইংরেজ-রাজ্য টলমল করিয়া উঠিল, ইংরাজ এমনই আচরণ করিল। অগনিত পুলিশ ও সৈনিক বাহিনীতে সমুদ্র সৈকত বেষ্টন করিল, যেমন করিয়াছিলেন বীর পুরুরাজ আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ আশঙ্কায়। ইংরাজ শাসক এই আইন অমান্য আন্দোলনে এমনই ভীত বিচলিত ও শংকিত হইয়া উঠিল যেন সুলতান মামুদ, নাদেরশাহ কিংবা আমেদ আবদাল্লা পুনরায় ভারত আক্রমণ করিয়াছেন। ইংরাজ গান্ধীজীকে সসম্ভ্রমে কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়া সংবাদ পত্রে ফলাও করিয়া দিনের পর দিন বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং অনুগত ভক্তের মতো ব্যবহার করিলে লাগিলেন। শ্রীবুদ্ধ ও শ্রীচৈতন্যের দেশবাসী বুঝিল অহিংসাই পরম ধর্ম, গান্ধিজীর মতই -স্বরাজের পথ। সুদূর মারাঠার পর্বত কন্দর হইতে শস্য শ্যামলা বাংলা পর্য্যন্ত যেই বিপ্লবী সংগ্রামী দল গড়িয়া উঠিতেছিল, যাহারা 'অস্ত্র ধারণ কর শত্রুকে জয় কর গীতার এই মহাবাণীতে উদ্বুদ্ধ হইয়া স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রায়াসী ছিলেন তাহাদের বাহু নিস্তেজ হইল। সর্দার প্যাটেলের ভাষায়, 'বহু পূর্বে কেন বিপ্লব হয় নাই, গান্ধিজী উহার জন্য দায়ী। তিনি পুলিশের কায্য করিয়াছিলেন, (He has done the work of the police)।'* গান্ধিজীর আবির্ভাবে বিপ্লবীরা হীনবল হইলেন বটে কিন্তু সর্বভারতীয় গণচেতনার বিকাশ হইল এবং জাতীয় আন্দোলন গড়িয়া উঠিল; দিকে দিকে ধ্বনিত হইল গান্ধিজী কি জয়। অহিংসা বাণী প্রচারের সঙ্গে গান্ধিজী এই সাবধান

* ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ১ম খণ্ড

বাণীও শুনাইলেন, ইংরাজ বন্ধুকে বিব্রত করিও না। ক্ষত্র বৃত্তি জনমনে শিথিল হইলেও কংগ্রেসের দিকেই জাতির দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধিতে ইংরাজ প্রমাদ গণিল। **বিভেদ সৃষ্টি করিয়া শাসন** করিবার নীতিই ইংরেজ গ্রহণ করিল। ফলে মুসলিম **লীগ গঠিত** হইল এবং ইংরাজের আশ্রয় ও প্রশ্রয়ে **লীগ শক্তিশালী** হইয়া উঠিল। ইস্‌লাম বিপন্ন বলিয়া লীগ মুক্তি সংগ্রামে শাসক ইংরাজের সঙ্গে সংগ্রাম না করিয়া প্রতিবেশী **হিন্দুদের উপরই আক্রোশ** মিটাইতে লাগিল। মুসলিম লীগের সন্তোষ বিধানে কংগ্রেসও ক্রমশঃ সর্ব প্রকারে **প্রয়াসী** হইয়া উঠিল; এবং মুসলমানদিগকে কংগ্রেসে আনিবার জন্য কংগ্রেস যত্নের কোন ক্রটি করিল না। সুপ্রসিদ্ধ সংবাদিক ঁহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের ভাষায় (স্বাধীনতার শঙ্খনাদ) 'কংগ্রেসের প্রথমাবধি মুসলমানদিগকে আনিবার চেষ্টা হইয়াছিল। আজ এ কথা বলিলে কোন দোষ হইবে না যে, কোন কোন মুসলমানকে 'পাথেয়' প্রভৃতি দিয়াও আনা হইত। আর এলাহাবাদে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যাহা হইয়াছিল তাহা উল্লেখযোগ্য। ছোট লাট স্যার অকল্যাণ্ড্ কলভিন কোথায়ও জমি দিতে অস্বীকার করিলে পণ্ডিত অযোধ্যানাথ যেমন গোপনে 'লাউদার কাশল' নামক গৃহ তাহার মুসলমান অধিকারীর নিকট ভাড়া লইয়া ছোট লাটের হীন চেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছিলেন, চারুচন্দ্র মিত্র তেমনই একশত মুসলমান এক্কা চালকের প্রত্যেককে একটি নূতন তাজ ও একটি করিয়া টাকা দিয়া মুসলমানের অভাব দুর করিয়াছিলেন।' **মিঃ জিন্না** তথাকথিত এই জাতীয়তাবাদী মুসলমান দিগকে অর্থ প্রলুব্ধ কংগ্রেস শো বয় বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন।

১৮৯৯ সালে এলাহাবাদের 'হিন্দুস্থান রিভিউ'তে দেশ নায়ক লালা লাজপত্ রায় লিখিয়াছিলেন, ...বর্তমান অবস্থায় হিন্দুর কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অভাবে হিন্দু অসুবিধায় পড়িয়াছে। সমগ্র ভারতের হিন্দুগণের একতা, সমৃদ্ধি ও মঙ্গল নির্ভর করে যে সব ব্যাপারে সে সম্পর্কে সম্মিলিত মত প্রকাশ বা কর্ম পন্থানুযায়ী সম্ভাবনা বন্ধ রহিয়াছে।

লালা লাজপত রায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহোদয়কে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, '...........হিন্দু-মুসলমান ঐক্য বিষয়ে আমি অতিশয় উদ্‌বিগ্ন, এই বিষয়ে আমি গভীর ভাবে চিন্তা করিয়াছি। গত ছয় মাসে অধিকাংশ সময় আমি মুসলিম ইতিহাস ও শাস্ত্র অধ্যয়নে অতিবাহিত করিয়াছি। এই ধারণাই আমার বদ্ধমূল হইয়াছে যে ইহা সম্ভবও নয় এবং বাস্তবও নয়, কারণ তাহাদের ধর্মীয় অনুশাসনই ইহার প্রধান অন্তরায়। কোন মুস্‌লিম নেতা কোরাণ উপেক্ষা করিতে পারিবেন কি? মুসলিম নেতাদিগকে আমি সর্বন্তকরণে প্রত্যয় করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু কোরাণ ও হদিসের নির্দেশ কি হইবে? কোন মুসলিম নেতা তাহা অবহেলা করিতে পারে না। আমার মনে হয় আপনার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এই সমস্যার কোন সমাধান করিতে পারে।'

যাঁহাদের অঙ্গুলী সঙ্কেত ভারতের রাজনীতি পরিচালিত হইত, ভারতীয় জনমত

যাঁহাদের পশ্চাৎ ধাবিত ছিল, তাঁহারাই হিন্দু মহাসভার প্রতিষ্ঠাতা। এই প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে মনস্বী রাজনারায়ণ বসু, লালা লাজপত রায়, পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য, প্রভৃতির নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

হারবার্ড (আমেরিকা) বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক মঃ হুাইনার দৃষ্টিতে হিন্দুমহাসভার আদর্শ ও উদ্দেশ্য......... 'প্রথম হিন্দুমহাসভা গঠিত হয় পাঞ্জাবে ১৯০৭ এ। সভার উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র হিন্দু সমাজের স্বার্থ সংরক্ষণ। এই হিন্দুমহাসভাই অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা সংগঠনে অগ্রণী হয়। ১৯১৫ তে উহার প্রথম সাধারণ সম্মেলন হয়। ১৯১৫ তে উহার প্রথম সাধারণ সম্মেলন হয়। মুসলিম লীগের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুমহাসভা উহার বিরোধিতা সুরু করে। মুসলমানদের হিন্দুধর্মে ফিরাইয়া আনা এবং অস্পৃশ্যতা নিবারণ উহার প্রধান কাজ হয়। ১৯২৫ এ হিন্দুমহাসভার সভাপতি ছিলেন লালা লাজপত রায়। * তিনি হিন্দুমহাসভার নিম্ন লিখিত প্রোগ্রাম স্থির করিয়া দেন ঃ

১। দেশের সর্বত্র হিন্দুমহাসভা সংগঠন,

২। দাঙ্গায় যে সব হিন্দু ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তাহাদের সাহায্যের ব্যবস্থা।

৩। যে সব হিন্দুকে বলপূর্বক মুসলমান করা হইয়াছে তাহাদিগকে হিন্দু ধর্মে ফিরাইয়া আনা,

৪। হিন্দু তরুণ-তরুণীদের জন্য ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা

৫। সেবা সমিতি সংগঠন,

৬। হিন্দী প্রচার

৭। মন্দির সংলগ্ন হল এবং প্রাঙ্গনে হিন্দুধর্ম ও সমাজ নীতির আলোচনার জন্য স্থান দিতে মন্দির কর্ত্তৃপক্ষদের অনুরোধ,

৮। হিন্দু পূজাপার্বণ এমন ভাবে অনুষ্ঠান করা যাহাতে হিন্দুদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্দ বৃদ্ধি পায়,

৯। মুসলমান এবং খৃস্টানদের সঙ্গে সৌহার্দ্দ বৃদ্ধি,

১০। সমস্ত রাজনৈতিক তর্কের মধ্যে হিন্দু সমাজের স্বার্থ তুলিয়া ধরা,

১১। শিল্পোন্নতিতে হিন্দুছেলেদের উৎসাহদান,

১২। হিন্দু কৃষি ও শিল্পজীবিদের মধ্যে সৌহার্দ্দ স্থাপন,

১৩। হিন্দু নারীর অবস্থা উন্নয়ন।

"১৯৩১ এ রামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারী প্রকাশিত হইলে হিন্দুমহাসভা তাহার তীব্র প্রতিবাদ জানায়। এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ার ফলেই পাঞ্জাব এবং বাঙ্গালায় মুসলমানেরা অত্যধিক সুবিধা লাভ করে। কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে না গ্রহণ না বর্জ্জন নীতি অবলম্বন করিলে হিন্দুমহাসভা কংগ্রেস হইতে দূরে সরিয়া যায়। গান্ধী এবং কংগ্রেসকে হিন্দুমহাসভা 'মুসলিম তোষণ নীতির' দায়ে অভিযুক্ত করে।

*১৯২৫ সালে অখিল ভারত হিন্দুমহাসভার অধিবেশন কলিকাতায় আহুত হয়, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়।

মহাসভার গোড়ার দিকে উহার নেতারা কংগ্রেসেরও সভ্য থাকিতেন। মহাসভার দুই জননেতা লাল লাজপত্ রায় এবং পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয় কংগ্রেসেরও সভ্য ছিলেন, এমন কি দুইজনে কংগ্রেসের সভাপতিও হইয়াছিলেন। পরে কংগ্রেস সভ্যদের পক্ষে মহাসভার সভ্য থাকা **নিষিদ্ধ** হয়।

'হিন্দু সাম্প্রদায়িক আন্দোলনকে গোঁড়ামির বিকাশ বলিয়া দেখিতে গেলে ভুল করা হইবে, এই গোঁড়ামিকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নেতৃত্বের সঙ্গে তুলনা করিলে তবেই উহা গোঁড়ামি বলিয়া প্রতিভাত হইবে। মহাসভা যখন গঠিত হয় তখন উহার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুত্বের ভিতরে থাকিয়া সংস্কার সাধন। সমাজ সংস্কার বিষয়ে মহাসভার মত প্রগতিশীল নয় বলিয়া উহার সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা পোষণ করিতেন এরূপ বহু গোড়া হিন্দু ছিলেন।

'কংগ্রেস মুখে বলে তাহারা সাম্প্রদায়িকতা মানে না, কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় মুসলমান বলিয়াই মুসলমান রাখিতে হয়। মৌলনা আজাদের স্থলে একজন হিন্দু বা খৃষ্টান নেওয়া চলে না, সেখানে মুসলমান খুঁজিয়া আনিতেই হয়। পার্লামেন্টে বা বিধান সভায় কংগ্রেস প্রার্থী মনোনয়নের সময় মুসলমান বা তাহাদের সম্প্রদায় হিসাবে ভাগ হয়। হিন্দু মহাসভা বলে ভারতবর্ষ হিন্দুর, উহাতে ধর্ম বা সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে মৌলিক অধিকার প্রত্যেকের আছে, কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনায় সম্প্রদায় হিসাবে কাহাকেও অতিরিক্ত সুযোগ দেওয়া হইবে না। উপযুক্ত হইলে ভারত রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কোন মুসলমান হইতে পারিবে না, এমন কথা হিন্দু-মহাসভা বলে না।' (যুগবাণী, ২৭ আষাঢ় ১৩৬৫)

ঐতিহাসিক মুক্তি লাভের পর এক বিরাট জন সভায় সাভারকরকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বিদগ্ধ বন্দী সাভারকর উক্ত সম্বর্দ্ধনা সভায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, 'লণ্ডনে লর্ড সভায় পাকিস্থান পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে এবং মুসলীম লীগের মাধ্যমে তাহা বাস্তবে রূপায়িত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। কংগ্রেসী বন্ধুগণের ত্যাগ, নিষ্ঠা, দেশসেবা সন্দেহের অতীত কিন্তু তাহাদের নীতিটাই ভ্রান্ত এবং এই ভ্রান্তনীতিই ভারতের **বিপর্যয়** ঘটাইবে। কংগ্রেসের মুসলিম তোষণ নীতির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বীর সাভারকর বলিলেন, 'মিলনের জন্য বন্ধুত্বের জন্য উভয়েরই সমান সদইচ্ছা থাকা প্রয়োজন। এক জন নিত্য নূতন দাবী করিবে অন্য জন তাহাই পূরণ করিতে ব্যস্ত থাকিবে, স্বীয় ন্যায্য অধিকার অন্যায় আবদার কারীর সন্তোষ বিধানের জন্য বিসর্জন করিতে হইবে, অন্যথায় দলে আসিবে না এইরূপ ভ্রান্ত নীতি দেশ ও জাতির পক্ষে **বিপজ্জনক**। সাম্প্রদায়িক কার্যে লিপ্তথাকা এবং সাম্প্রদায়িক দাবী স্বীকার করিয়া লওয়া দুই সমান অপরাধ। **হিন্দুর সহিত একত্র হইয়া দেশ ও জাতির কল্যাণকর গঠন মূলক কায্য করিবার ইচ্ছা কি ভারতীয় মুসলমানদের আছে?** বীর সাভারকরের এই প্রশ্নের উত্তর দীর্ঘকালপরে কংগ্রেসের শক্ত মানুষ (Ironman) সর্দার প্যাটেলের মুখেই শ্রুতহইল, 'মুসলিম লীগের সঙ্গে একযোগে কোন গঠন মুলক কার্য্য করা সম্ভব নয়, অন্তর্বর্তী সরকারে তাহাদের সহিত কাজ করিয়া আমার এই ধারণাই হইয়াছে।' (নূতন দিল্লী ১১ই

আগষ্ট ১৯৪৭) দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরেই গান্ধিজীও জাতীয়তাবাদী মুসলমান দিগকে মুসলিম লীগেই যোগদান করিতে এবং রাজনীতি ত্যাগ করিয়া জনসেবায় ব্রতী থাকিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। হিন্দুমুসলমান ঐক্য ব্যাপারে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নিম্ন উদ্ধৃত মন্তব্যটিও বিশেষ ভাবে প্রনিধানযোগ্য। 'আজ দেশের সর্বত্রই সব চেয়ে প্রবলভাবে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, তা হচ্চে হিন্দুমুসলমান মিলন সমস্যা।.........মুসলমান শক্তিমান এবং নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন। তারা জানে হিন্দু দুর্বল। মানব স্বভাব আজ যেমন রয়েছে, তাতে.......অবস্থার দাবী নয়, মনের উদারতা দিয়েই মুসলমান আজ হিন্দুদের সঙ্গে তার সম্বন্ধ নির্ণয় করে নেবে।.....

"হিন্দুমুসলমানের মিলন অসম্ভব করে তুলেছে আর একটি যে প্রধান ব্যাপার তা হচ্ছে এই যে, মুসলমানের ভৌগোলিক সীমাবদ্ধ দেশাত্ম বোধ নেই। মোসলেম জগৎ গঠিত হয়েছিল ধর্মের সৌভ্রাত্র অবলম্বনে আর এই ধর্মের বন্ধনই দুনিয়ার এক প্রান্তের মুসলমানের সঙ্গে অপর প্রান্তের মুসলমামের মিলন সুদৃঢ় করে তুলেছে।

"আমি অনেক মুসলমান নেতাকে স্পষ্ট ভাষায় জিজ্ঞাসা করেছি যে আফ্‌গান বা অপর কোন মুসলমান শক্তি যদি ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, তা হলে হিন্দুদের সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, সে আক্রমণ প্রতিহত করতে তারা প্রস্তুত কিনা। জবাব তাঁরা যা দিয়েছেন তাতে আমি নিশ্চিত হতে পারিনি।........(আনন্দবাজার পত্রিকা অতীতের পৃষ্ঠা থেকে, ১৯শে ভাদ্র ১৩৬৭)

ভারতের অখণ্ড সত্ত্বা সংরক্ষণ এবং ঐক্যবদ্ধ মহা হিন্দুজাতি গঠন প্রয়াসে রাষ্ট্রিক সত্যদ্রষ্টা সাভারকর হিন্দুমহাসভার পতাকাই দৃঢ় হস্তে ধারণ করিলেন।

বিপ্লবী সাবারকর যৌবনের উদ্যম দুর্ভেদ্য কারা প্রাচীরের অন্তরালে নিঃশেষ করিয়া পৌঢ় বয়সে আসি চিহ্নিত গৈরিক পতাকা হস্তে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানাইলেন, 'যদি মুসলমানগণ আসেন তাহাদের হাতে হাত মিলাইব, যদি না আসেন বাদ দিব, যদি বাধা দেন তাহা অগ্রাহ্য করিয়া আমরা হিন্দুরা স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রসর হইব।'

হিন্দু কে?

পুরাকালে সিন্ধু তীরবাসী আর্যগণ হিন্দু নামে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু বর্তমান কালে হিন্দু বলিতে আর তাহাই বোধগম্য হয় না, কারণ এখন বহু মানব গোষ্ঠীর বাস। যুগ নায়ক স্বামী বিবেকানন্দের মতে, প্রাচীন হিন্দু শব্দের পরিবর্তে আমরা একটি মাত্র শব্দ ব্যবহার করিতে পারি তাহা বৈদান্তিক—যেহেতু বৌদ্ধ-জৈন-শিখ-আর্য সমাজী-শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব সকলেই বেদান্তবাদী। হিন্দু জাতীয়তাবাদের মহাভাষ্যকার সাভারকর বলেন, **যে ব্যক্তি সিন্ধু নদ হইতে সমুদ্র পর্যন্ত ভারত ভূমিকে পিতৃ-ভূমি ও পুণ্য ভূমিরূপে শ্রদ্ধা করেন সেই হিন্দু।'**

'আসিন্ধু সিন্ধু পর্যন্ত যস্য ভারত ভূমিকা
পিতৃভূঃ পুণ্য ভূমিশ্চৈব স বৈ হিন্দুরিতি স্মৃতঃ।'

সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পে চিত্ত কলুষিত হওয়ার পূর্বে ভারতীয় মুসলমানগণও যে কি

অভিমত পোষণ করিতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় মুসলিম লীগ নায়কগণের কথিত পাকিস্থান মতবাদের জনক স্যার সৈয়াদ আহাম্মদ সাহেবের উক্তিতে, 'হিন্দু শব্দটি আপনারা যে অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন, আমার বিবেচনায় তাহা সঠিক অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন, আর বিবেচনায় তাহা সঠিক অর্থ নয়। পক্ষান্তরে ভারতের প্রত্যেকটি অধিবাসী আপনাকে হিন্দু আখ্যায় অভিহিত করিবার অধিকারী।' (সফর নামা পাঞ্জাব, ১৩৯ পৃঃ—স্যার সৈয়দ আহম্মদ।)

কংগ্রেসের মুসলিম তোষণ নীতি এবং ভারতীয় কমিউনিষ্টগণের জাতিয়তা বিহীন আন্তর্জাতিকতাপ্রীতির ফলে হিন্দুর জাতীয় জীবন **বিপন্ন** দেখিয়া বীর সাভারকর বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, 'আমি হিন্দুস্থানকে ভালবাসি বলিয়াই মানবতাকে ভালবাসি, আমি আমার জাতিরক্ষার জন্য সংগ্রাম করিব, কারণ জাতীয়তাই মানবতা ও বিশ্বমানবতার লক্ষ্যে উপস্থিত হইবার **অবশ্যম্ভাবী পথ**।' ইহা বাস্তব সত্য-যে, যে জাতি নিজেকে জানে না, নিজের বিশিষ্টতার স্পন্দন অনুভব করে না, অতীত সম্বন্ধে গৌরব বোধ নাই, ভবিষ্যৎ বিষয়ে সচেতন নহে এবং জাতীয় জীবন সম্প্রসারণ বিমুখ সে জাতি আত্মবিলোপকারী মৃত্যুপথ যাত্রী। জগতের প্রত্যেক বলিষ্ঠ জাতি জাতীয় সত্তায় শক্তিশালী বলিয়াই বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতার বুনিয়াদ। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মহামতি স্ট্যালীন যিনি বিশ্বমৈত্রী ও বিশ্বশান্তি স্থাপনে অগ্রণী ছিলেন কিন্তু বিপদকালে হের হিটলারের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন তাঁহাকেও স্বাদেশিক যুদ্ধ এবং জাতীয়তার উপরই বিশেষ রূপে জোর দিতে হইয়াছিল। আন্তর্জাতিক সাম্যবাদ রক্ষার জন্যই এই সংগ্রাম এমন উক্তি তিনি করেন নাই, এমন কি মিত্র পক্ষের মিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আন্তর্জাতিক সাম্যবাদীয় সংস্থা বিলোপ করিয়া দিয়াছিলেন।

ভারতীয় ঋষিরা এই লোকশিক্ষাই দিয়াছে,—'হে বিশ্ববাসী মৃত্যু রহিতের পুত্রগণ তোমরা অবহিত হও, মানব সকল পরস্পর ভ্রাতৃতুল্য।' শ্রীবুদ্ধ, শ্রীযীশু প্রমুখ ধর্ম সংস্থাপকগণ বারে বারে সাম্য শান্তি ও মৈত্রী-বাণী প্রচার করিয়াছেন কিন্তু মানুষ এখনো ধর্মীয় বা রাষ্ট্রীয় গণ্ডী অতিক্রম করিয়া মহামানবতার সীমানায় পৌঁছাইতে পারে নাই। ইহার কারণ ও প্রতিকারে সাভারকর বলেন, এমন একটি বিশ্ব-রাষ্ট্র থাকিবে যেখানে সকল নর নারী সমান অধিকার লাভ করিবে, মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ থাকিবে না। সূর্য হইতে পৃথিবী পর্যন্ত সকল দেশই আমাদেরই পিতৃভূমি ও পুণ্য ভূমি হইবে। পৃথিবী আমাদের দেশ এবং মানবতা ও দেশ ভক্তিই আমাদের ধর্ম, কিন্তু যখন মানব জাতিকে একই জাতি সংঘের মধ্যে পুরিয়া দিবার জন্য সংগ্রাম চলিতে থাকে তখন সাধারণতঃই যে জাতি দুর্বল, মানবতার নাম করিয়া তাহাকেই সবল জাতি গোষ্ঠী দমন করিয়া রাখিবার চেষ্টা করে। সেই জন্যই বীর সাভারকরের অভিমত সকলকে একীভূত করিবার পূর্বে প্রত্যেককে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বলিষ্ঠ জাতি রূপে প্রস্তুত করিতে হইবে।

বীর সাভারকরের বৈদেশিক নীতি ব্যবহারিক মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার

মতে যে সব জাতি হিন্দুজাতির প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হইবে তাহারাই আমাদের মিত্র হইবে। কোন ভুয়া গণতন্ত্র, নাৎসীবাদ বা ফ্যাসীবাদ ভারতের বৈদেশিক নীতির পরিচালনায় মূল ভিত্তি হইবে না। স্বীয় আবাস ভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়া ইহুদীগণ দীর্ঘকাল ভ্রাম্যমান জীবন যাপন করিয়া নিজভুজবলে ইস্রাইল রাষ্ট্র গঠন করিলে বীর সাভারকর তাহাতে নৈতিক সমর্থন জানাইয়াছিলেন। ইহার কারণ মালয় হইতে আফ্রিকা পর্যন্ত যে একটি ইস্লামিক বলয় রহিয়াছে তাহাকে বিখণ্ড করিয়া অভ্যন্তরে একটি ইহুদীরাজ্য গঠন করিলে মুসলমানদের আক্রমণাত্মক নীতি বাধাপ্রাপ্ত হইবে। হিন্দুরাজ্যের উপর ইহুদীদের কোন বিরূপ মনোভাব নাই। সুতরাং যাহাতে প্যালেস্টাইনের ইহুদীরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে হিন্দুসংগঠনকারীদের তাহার জন্য সদ্ইচ্ছা ও নৈতিক সমর্থন থাকা উচিত বলিয়াই সাভারকর মনে করেন।

বীর সাভারকর হিন্দুমহাসভায় যোগদান করিবার পর হইতেই হিন্দুমহাসভা বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠে। ১৯৩৯ সালে খুলনা জেলার গান্ধীপার্কে প্রাদেশিক মহাসভার অধিবেশনে তিনি যোগদান করেন। অধিবেশনের প্রারম্ভে বাঙ্গালীর রচিত মুক্তি সঙ্গীত বাঙ্গালীর কণ্ঠে শ্রবণ করিতে করিতে বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের একনিষ্ঠ সাধক বীর সাভারকরের মুখমণ্ডল রক্তাভ হইয়া উঠিল। অধিবেশন সময়ে বিরাট মুসলিম জনতা মহাসভা নিপাত যাক্, সাভারকরের মুণ্ডু চাই প্রভৃতি ধ্বনি সহকারে মণ্ডপের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, ইহাতে মহাসভা নেতারা চঞ্চল হইয়া উঠিলে বীর সাভারকর নির্ভীক ভাবে বলিলেন, বিচলিত হইবেন না। আমি সাভারকর এইখানেই থাকিব। শুধু বাংলার নয় সমগ্র বিশ্বের মুসলমান সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে বামে যে দিক দিয়ে পারে আসুক, বিদেশে ব্রিটীশ শক্তির নিকটও যে নতি স্বীকার করে নাই জননীর কোলে তার ভয় কী? বলা বাহুল্য মাত্র যে হিন্দুজনতার গগনভেদী বন্দেমাতরম্ হুংকারের সম্মুখীন না হইয়া মুসলিম জনতা পশ্চাদ ধাবন করিয়াছিল। খুলনা হইতে প্রত্যাবর্তন পথে কলিকাতায় টাউন হলে তাঁহাকে নাগরিক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ১৯৩৯ সালে ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় অখিল ভারত হিন্দুমহাসভার অধিবেশন আহুত হয় তাহাতে সভাপতিত্ব করেন বীর সাভারকর। সাভারকরের বলিষ্ঠ আহ্বানে বাঙ্গালীর প্রাণে নবীন উদ্দীপনা ও সঞ্জীবনী শক্তির সঞ্চার হয়, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৪০ সনে মার্চ মাসে কলিকাতা পৌরসভার নির্বাচনে। দেশ-গৌরব সুভাষচন্দ্র বসু মহোদয়ের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বে-ও তাঁহার দল পাইয়াছিল ২১,৪৪২ ভোট আর হিন্দুমহাসভা পাইয়াছে ২০,২১৩ ভোট, বঙ্গীয় এসেম্বলির উপনির্বাচনে মহাসভা পাইয়াছে ১১,১৫১ ভোট এবং তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী পাইয়াছেন ২,৩২৭ ভোট। বীর সাভারকর পর পর ছয় বার হিন্দুমহাসভার সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁহার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং সংগঠন শক্তির প্রভাবে হিন্দুমহাসভা বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিল। হিন্দুমহাসভার এই সর্বভারতীয় আলোড়নে কংগ্রেসনায়কগণ বিশেষ বিচলিত এবং উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা হিন্দুমহাসভাকে সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া উপহাস ও উপেক্ষা করিতে লাগিলেন

এবং লীগপ্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহারাই পুনঃ পুনঃ লীগ সভাপতির গৃহে গমন করিয়া লীগকে প্রভাবশালী করিয়া তুলিলেন এবং সাধারণ মুসলমানগণও বুঝিল ভারতের মুক্তি নির্ভর করে তাহাদেরই উপর।

কংগ্রেসের মতে হিন্দুমুসলিম ঐক্য না হইলে স্বরাজ্য লাভ হইবে না। বীর সাভারকরের মতে **হিন্দুমুসলিম ঐক্যের অন্তরায় ইংরাজ শাসক**, সুতরাং এই বিভেদ সৃষ্টিকারী শাসককে বিতাড়িত করিতে না পারিলে ভারতের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হইবে। সাভারকরের মতে 'স্বরাজ্য লাভের জন্য বিচ্ছিন্য হিন্দুজাতির একতা সর্বগ্রে প্রয়োজন। ১০ কোটি-মুসলমানের অসহ-যোগিতায় ৩০ কোটি হিন্দু যদি স্বরাজ আনয়ন করিতে না পারে সে স্বরাজ হিন্দুরা রক্ষা করিতেও পারিবে না।' বীর সাভারকরের ভাষায় 'হিন্দুমহাসভাকে সাম্প্রদায়িক বলা হয় কিন্তু কায্যতঃ কংগ্রেসই সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান।' কোন ব্যক্তি বা কোন প্রতিষ্ঠানকে বিচার করিতে হইলে তাহার কার্য্যকলাপের দ্বারাই বিচার করিতে হয়। নারিকেলের কঠিন আবরণ দেখিয়া কিম্বা মাকালফলের বাহ্যিক রূপ দেখিয়া বিচার করিলে বিচারফল কি হইবে? মোপলা বিদ্রোহের নেতা আলী মুসাদিয়রের ভাষায়, 'ভারতবর্ষে সম্মিলিত জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে স্থায়ী ঐক্য স্থাপন করিতে হইলে সমস্ত হিন্দুর মুসলমান হওয়া ব্যতীত অন্য উপায় নাই। যে হিন্দু ইহা করিতে অস্বীকার করিবে তাহারা ভারতের ঐক্য বিরোধী বিশ্বাসঘাতক সুতরাং মৃত্যুই তাহাদের প্রাপ্য শাস্তি।' মোপলা বিদ্রোহে শিশু যুবা বৃদ্ধ নির্বিশেষে হিন্দু হত্যা করা হয়, হিন্দু নারী নির্যতীতা হন অথচ কংগ্রেস এই মোপলা বিদ্রোহ জাতীয় আন্দোলন রূপে সমর্থন করেন কোন জাতীয়তায়? পৃথক নির্বাচন প্রথা কংগ্রেস না গ্রহণ না বর্জন করেন, কোন জাতীয়তায়? পৃথক নির্বাচন প্রথা কংগ্রেস না গ্রহণ না বর্জন করেন, কোন জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ হইয়া ? মুসলমান দিগকে সাদা চ্যাক্ এবং যোগ্যতার বিচার না করিয়া শত করা ৮০টি চাকরী ছাড়িয়া দিতে চাহিয়াছিল, মুসলিমগণের তুষ্টি বিধানের জন্য। বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের অঙ্গচ্ছেদ করিয়াছিল কোন জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ হইয়া। গান্ধিজী হিন্দুস্থানী ভাষা নামে এক উদ্ভট ভাষা প্রচলনেও প্রয়াসী হইয়াছিলেন, ঐ ভাষায় 'জনাব রামচন্দ্র কি সাথ বেগম সীতাকো সাদি হুয়ে থি।' কংগ্রেসের এই জাতীয়তার স্বরূপ উদঘাটন করিয়া সাভারকর বলিলেন, 'আমাকে সাম্প্রদায়িক বলা হয় কারণ আমি অখণ্ড ভারতে বিশ্বাসী এবং তোষণনীতির বিরোধী।'

'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে।'

হিন্দু সম্প্রদায় নহে, হিন্দু একটি প্রাচীন জাতি এবং সভ্যতার জনক। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রীয় প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে হিন্দুজাতি সমাজবদ্ধ। হিন্দুমহাসভার মাধ্যমে সাভারকর হিন্দুগণের ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় উদ্যোগী বলিয়া তিনি মুসলীম ধর্ম বিদ্বেষী ছিলেন না। তিনি হিন্দুদের জন্য বিশেষ কোন সুবিধা দাবী করেন নাই এবং অপরকে বিশেষ সুবিধা দানে পক্ষপাতী ছিলেন না। বীর সাভারকর বারংবার এই কথাই বলিয়াছেন, অনুগত নাগরিক হইলে সংখ্যালঘুরা রক্ষাকবচ ধারণ করিয়া নির্বিঘ্নে বাস করিতে পারেন।'

সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম প্রদেশ লইয়া লীগ পাকিস্থান গঠনের দাবী জানাইল। এই পাকিস্থান পরিকল্পনাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করিবার জন্য বীর সাভারকর **ভাষাভিত্তিক প্রদেশ** গঠনের অভিমত প্রকাশ করেন। যেমন মানভূম, সিংহ ভূম, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃত বাংলা ভাষী অঞ্চল বাংলার সঙ্গে যুক্ত হইলে এবং অনুরূপ ভাবে পাঞ্জাব ও দিল্লী এবং সিন্ধু বোম্বাইর সঙ্গে ভাষা ভিত্তিক অঞ্চল গঠিত হইলে বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু হিন্দু সংখ্যা গরিষ্ঠ হয় সুতরাং লীগের পাকিস্থান দাবী অযৌক্তিক হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রাদেশিকতায় চিত্ত কলুষিত কংগ্রেসী নেতাগণ তাঁহাকে সাম্প্রদায়িকস্বার্থ প্রণোদিত এবং পাকিস্থান পাগলের পরিকল্পনা বলিয়া বিদ্রূপ করেন। সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প হইতে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করিবার জন্য বিদ্রোহী কবি সাবধান বাণী উচ্চারণ করিলেন, 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কিন্তু ইহা নির্মম এবং অপ্রিয় সত্য যে ইচ্ছায় কিম্বা অনিচ্ছায় হউক, অথচ রাজনৈতিক অদূরদর্শীতার ফলেই হউক কাণ্ডারী হুঁশিয়ার হইলেন না। কংগ্রেস কাণ্ডারী বার বার লীগ সাম্প্রদায়িকতার নিকট **নতি স্বীকার** করিলেন; কমিউনিষ্ট কাণ্ডারীরাও মুসলিমলীগের **সহায়তা** করিলেন। ১৯৪৬ সালে কলিকাতায় মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের উদ্বোধনী শোভাযাত্রায় লীগপতাকার সহিত পার্টির লালঝাণ্ডা লইয়া **সহযাত্রী** হইয়া ছিলেন, দেশ বিভাগ এবং পাকিস্থানের প্রতিষ্ঠা যে গণতন্ত্র সম্মত ন্যায্যদাবী তাহাও প্রচার করিয়াছিলেন, নোয়াখালী, ত্রিপুরায় সংখ্যালঘু—হিন্দুহত্যা, নারী নির্যাতন এবং সম্পত্তি হরণ বুর্জোয়া বিত্তবান শ্রেণীর বিরুদ্ধে **সর্বহারার অভ্যুত্থান** বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। জাতীয়তা বনাম সাম্প্রদাযিকতার সংঘর্ষের দিনে বীর সাভারকর বলিষ্ঠ পদক্ষেপে অগ্রসর হইলেন ভারতের ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য। সর্বভারতীয় একভাষা, এক আশা, এক বিধান এবং এক নিশান এর কথাই তিনি প্রচার করিলেন।

হায়দ্রাবাদের তৎকালিন শাসক নিজাম বাহাদুর হিন্দুদের প্রতি অন্যায় আচরণ করিবার প্রতিবাদে ১৯৩৮ সালে বীর সাভারকর সত্যাগ্রহের আহ্বান জানাইলে, 'নিজামকে বিব্রত করিও না বলিয়া গান্ধীজী উপদেশ দিলেন এবং উক্ত আন্দোলন বর্জন করিয়া হিন্দুরাজ্য জয়পুরে পাল্টা আন্দোলন চালাইবার জন্য শেঠ যমুনা লাল বাজাজকে তথায় প্রেরণ করিলেন। পূর্বে কাশ্মীরে প্রজা আন্দোলনের সময় গান্ধীজী কাশ্মীর রাজকে উপদেশ দিয়াছিলেন যদি কাশ্মীর রাজ মুসলমান প্রজাদের সন্তোষ বিধান করিতে না পারেন তাহা হইলে কাশ্মীর রাজের কাশীবাসই **শ্রেয়**। বীর সাভারকর গান্ধীজীকে তাঁহার পূর্ব কথা স্মরণ করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হিন্দু প্রজাদের সন্তোষ বিধান করিতে না পারিলে নিজামের মক্কাবাসই শ্রেয় বলিয়া উপদেশ দিতেছেন না কেন? বীর সাভারকরের আহ্বানে এবং লক্ষ্মণ রাও; বলবন্ত ভোপৎকারের পরিচালনায় দলে দলে হিন্দু তরুণগণ পাঠান সৈনিকের উৎপীড়ন লাঠি চালনা এবং অনুরূপ নিজামী দলন নীতি অগ্রাহ্য করিয়া কারাবরন করিতে লাগিলেন। বীর সাভারকর তথাকথিত জাতীয়তাবাদী মুসলমান দিগকে আহ্বান জানাইলেন 'আপনারা কি অবগত নহেন যে, নিজাম রাজ্যে হিন্দুগণ সভাসমিতি করিতে, ধর্মীয় বা সামাজিক শোভাযাত্রা করিতে, এমন কি পুরাতন মন্দির সংস্কার ও নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করিতে

এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততিদিগকে মাতৃভাষায় শিক্ষা দিবার অধিকার হইতে **বঞ্চিত**? জন সংখ্যার শতকরা ৮৫ জন হিন্দুর পক্ষে উর্দুভাষা কি **প্রতিকূল** নহে ? শত করা ১২ জন হইয়াও কি মুসলমানগণ শতকরা ৮০টি চাকরী পাইতেছেন না? বলপূর্বক হিন্দুগণ কি ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষিত হইতেছেন না? ইস্‌লাম ধর্ম প্রসার কল্পে কি নিজাম সরকার হইতে **অর্থ ব্যয়** করা হয় না? কিন্তু **রাজস্ব** বাবদ হিন্দুরাই অধিক অর্থ দিয়া থাকেন। হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার করা, হিন্দুনারী হরণ করা, হিন্দুনেতাদিগকে হত্যা-করা, প্রকাশ্য দিবালোকে হিন্দুর **সম্পত্তি লুণ্ঠন** করা প্রভৃতির জন্য কি মুসলিম গুণ্ডাদিগকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না? নিজাম স রকারের পুলিস বিভাগে শতকরা ৮০ জন মুসলিম কর্মচারীই কি এই সব ঘৃণ্য ব্যাপারে উদাসীন নহেন?

১১ মাস অবিশ্রান্ত সত্যাগ্রহে ১৫,০০০ হিন্দু কারা বরণ করিয়াছিল। কংগ্রেসের উদাসীনতা সত্ত্বেও সাভারকর সংগ্রামে জয়ী হইলেন, নিজাম সরকার হিন্দুদের রাষ্ট্রিয় মর্যাদা এবং ধর্মীয় অধিকার স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহার দশ বৎসব পরে ১৯৪৮ সালে নিজামী ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে কংগ্রেস সরকারকেও অস্ত্র ধারণ করিতে হইয়াছিল।

অখণ্ড বঙ্গের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ, কে, ফজলুল হক করাচীতে এক জন সভায় বলিয়াছিলেন, 'মুসলমানগণ সিংহ ও ব্যাঘ্র তুল্য। ইচ্ছা করিলে তাহারা হিন্দুদিগকে বিব্রত করিতে পারে।' বীর সাভারকর পুণায় জনসভায় উক্ত উক্তির প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন, 'হিন্দুগণ সুসভ্য মানুষ, তাহারা ইচ্ছে করিলে সিংহ, ব্যাঘ্র পশুগুলিকে করায়ত্ত করিয়া, পিঞ্জরাবদ্ধ রাখিয়া বেত্রাঘাত করিতে পারে।'

'মুক্ত করো ভয়
আপন মাঝে শক্তি ধরো নিজেরে করো জয়।'

বৎসরে ৩০,০০০ মাইলেরও অধিক ভ্রমণ করিয়া বিপ্লবী সাভারকর দৃপ্ত কণ্ঠে সুপ্তিমগ্ন জাতিকে ডাকিয়া বলিলেন, 'কোন বিশ্ব বিদ্যালয়ের এম, এ, অথবা মহামোহপাধ্যায় অপেক্ষা সৈনিক দলের অধিনায়ককে আমি অধিকতর ভালবাসি।' জাতীয় জীবন সামরিক শক্তি শালী করিবার উদ্দেশ্য পররাজ্য আক্রমণকারী, পরস্ব অপহরণকারী যুদ্ধ বাজ জাতিতে পরিণত করা নয়, পরন্তু নির্ভীকতা, নিয়মানুবর্তীতা, আজ্ঞানুবর্তীতা, কর্তব্যপরায়ণতা এবং ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি সৈনিক জনোচিত গুণরাজিতে উদ্বুদ্ধ, ঐক্যবদ্ধ বলিষ্ঠ এক-মহাজাতি গঠন করা। পৃথিবীর অপর কোন ধর্মাবলম্বীই হিন্দুর মত এইরূপ বিপুল সংখ্যায় একদেশে বাস করে না, কিন্তু ধর্মীয় রাষ্ট্রীয় এবং সমাজজীবনে হিন্দুই সর্বাপেক্ষা বিচ্ছিন্ন। এই জন্যেই হিন্দুগণ আন্তপ্রাদেশিক বিবাহের দ্বারা আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য বীর সাভারকরের আহ্বান। হিন্দুর সাহিত্য, দর্শন, ধর্মীয় শিক্ষা হিন্দুকে উদার এবং পরমত সহিষ্ণু করিয়াছে কিন্তু জাতীয় জীবন সামরিক শক্তিশালী এবং ঐক্যবদ্ধ করিতে পারে নাই, সেই জন্যই বার বার আক্রমণকারীর নিকট পরাজিত হইয়াছে। এই বাস্তব সত্যের জন্যই বীর সাভারকর বলেন, 'রাজনীতি হিন্দুভাবাপন্ন কর, এবং হিন্দুত্বকে ক্ষাত্র বীর্য্যে সঞ্জীবিত কর।' ১৯৩১

সালে লোকগনণায় কংগ্রেসের নির্দেশে অনেক হিন্দু নাম না লেখাইয়া যে ভুল করিয়াছিল ঐ ভুল যেন ১৯৪১ সালের লোকগণনায় না করে সেই বিষয়ে সতর্ক করিয়া বীর সাভারকর আবেদন জানাইলেন প্রত্যেক হিন্দু কোল, ভীল, সাঁওতাল, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল কেহই যেন ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় না দিয়া সকলেই হিন্দু নামে পরিচয় দেন। এই উদ্দেশ্যে বীর সাভারকরের নির্দেশে সারা ভারতে হিন্দুমহাসভা 'লোকগণনা সপ্তাহ' পালন করেন। ভারত সরকার এই ব্যাপারে বিরোধিতা না করিলেও তৎকালীন বাঙ্গলার লীগমন্ত্রী সভা হিন্দুকে শত বিচ্ছিন্ন দেখাইবার জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সাভারকরের আবেদন বিফল হয় নাই, এই ভেদ-নীতির কুফলের প্রতি ভারতের চিন্তানায়কগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও 'হিন্দু' পরিচয় দিয়া জাতির গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

১৯৪৩ সালে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী, রাজনীতিজ্ঞ, দার্শনিক সাহিত্যিক ও কবি সাভারকরকে সাহিত্যে সম্মানীয় ডক্‌টোরেট উপাধি প্রদান করে।

১৯৪৪ সালে গান্ধীজীর পত্নী কস্তুরবার মৃত্যুতে গান্ধীজীর নিকট সাভারকর শোক বাণী প্রেরণ করেন। তিনি কস্তুরবার স্মৃতি ভাণ্ডারে হিন্দু সংগঠন কারীদেরকে **অর্থদান** করিতে বারণ করেন এবং **ঐ অর্থ বাংলার দুর্ভিক্ষ সাহার্য্যভাণ্ডারে দান** করিবার জন্য আবেদন জানান যে, কস্তুরবা দেবী দেশের জন্য এমন কিছুই করেন নাই যার জন্য তাঁহার স্মৃতি রক্ষা একান্তই প্রয়োজন বর্তমানে বিপ্লবী বাংলাকে দুর্ভিক্ষের হাত হইতে রক্ষা করাই প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। এই দুর্ভিক্ষে হিন্দুমহাসভা বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানে নঙ্গরখানা স্থাপন ও পরিচালন করেন। ঐ সব নঙ্গরখানায় হিন্দুমুসলমান জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলকেই সমভাবে অন্নদান করা হইত। এই বৎসর অর্থাৎ ১৯৪৪ সালে সাভারকরের ৬২ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ২৮ শে মে হইতে অস্পৃশ্যতা বিরোধী সপ্তাহ পালন করা হয়। বিপ্লবী নায়ক এম, এন, রায় ও ডাঃ পারঞ্জপে সাভারকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বাংলা ও পাঞ্জাবকে বাদ দিয়া স্বাধীনতা গ্রহণ অর্থাৎ বিকল্প পাকিস্থান সমর্থন করিয়া শ্রীরাজ গোপাল আচারীয়া যে প্রস্তাব করেন তাহা **সি, আর, ফরমূলা** নামে কথিত হয়। বীর সাভারকর ভারতময় ভ্রমণ করিয়া **অখণ্ড হিন্দুস্থান** ও **পূর্ণ স্বাধীনতার** দাবী জ্ঞাপন করিয়া সি, আর, ফর্‌মূলার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করেন।

১৯৪৫ সালে রাসবিহারী বোসের মৃত্যুতে সাভারকর শোকবাণী প্রেরণ করেন। এই বৎসরে গণেশ দামোদর সাভারকর পরলোকগমন করেন এবং গান্ধীজী বীর সাভারকরের নিকট শোকবাণী প্রেরণ করেন। বীর সাভারকরের কন্যা **প্রভাবতীর** বিবাহ এই বৎসর অনুষ্ঠিত হয় এবং এই উপলক্ষে তথাকথিত অস্পৃশ্য নরনারীর দ্বারা রন্ধন পরিবেশন যাবতীয় কায্য নির্বাহ করা হয়। ১৯৪৫ সালে ২৮ শে মে সাভারকরের ৬৩ তম জন্মজয়ন্তীতে তাঁহার গুণমুগ্ধ দেশবাসী তাঁহাকে ৫০,০০০ টাকা এবং 'মরিয়া'র (যেই জাহাজ হইতে তিনি সমুদ্র ঝাঁপ দিয়াছিলেন) অনুরূপ একখানি রৌপ্য নির্মিত জাহাজ উপঢৌকন দিয়াছিল। ভারতের নেতৃবৃন্দ তাঁহার সুস্থ্যস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করিয়া বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন। গান্ধীজী তাঁহার বাণীতে উল্লেখ করয়াছিলেন, '......A brave and celebrated Servant

(of humanity) needs no recommendation' ভুলাভাই দেশাই ও মঃ লিয়াকৎআলীর প্রস্তাবিত এবং গান্ধীজীর সমর্থিত হিন্দুমুসলমান সমতা বিধানের বিরুদ্ধে সাভারকর তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। আল্লমামাক্‌সৃরুরী প্রতিনিধিদ্বয় সাভারকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। **শ্রীরাহুল সাংকৃত্যায়ণও** বীর সাভারকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সাভারকরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কমিউনিষ্ট পার্টি **ত্যাগ** করেন, ইহা ১৯৪৬ এর ঘটনা।

লীগমন্ত্রী শাসিত সিন্ধুদেশে উপজাতীয় দস্যুরা হিন্দুদিগকে হরণ করিতে এবং প্রচুর অর্থের বিনিময়ে প্রত্যপর্ণ করিত। সিন্ধুর উপদ্রুত হিন্দুগণ গান্ধীজীর শরণাপন্ন হইলে তিনি তাহাদিগকে **উপদেশ** দিয়াছিলেন, 'যদি তোমার ধন, সম্পদ ও সম্মান রক্ষা করিয়া বাস করিতে না পার তাহা হইলে অন্যত্র নিরাপদস্থানেই আশ্রয় গ্রহণ কর।' বীর সাভারকর গান্ধীজীর এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'হিন্দুগণ যদি এইরূপ পলাতক মনোবৃত্তিপরায়ণ হয় তাহা হইলে অচিরেই ইহুদীর ন্যায় ভ্রাম্যমান জাতিতে পরিণত হইবে। অস্ত্রের দ্বারাই দস্যু তস্করদিগকে পর্যুদস্ত করিতে হইবে'। হিন্দুশূন্য সিন্ধুদেশ এবং বর্তমান খণ্ডিত ভারতের ছিন্নমূল হিন্দুর দুর্দশা সাভারকরের উক্তিই স্মরণ করাইয়া দেয়।

ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে বীর সাভারকরের আবির্ভাব ভারতীয় জনচিত্ত যে গভীর ভাবে আলোড়িত করিয়াছিল এবং কংগ্রেস নেতৃত্বকেও প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় কলিকাতার 'স্টেটসমেন' পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক মিঃ আলফ্রেড ওয়াটসনের প্রসিদ্ধ Great Britain and the East-এর নিম্ন উদ্ধৃত অনুচ্ছেদটিতে .... 'In this belief of dictatorship, Neharu has a dangerous rival, Savarkar, who dose not hide his aspiration to rule under any veil of anonymity but publicly proclaims it as the leader of the the Hindu Mohasava.

'Savarkar claims domination for the Hindus in the future of India on the democratic basis of the counting heads. For that domination he is prepared to fight and loudly demands that in recruiting for armies in India, the present rulers shall Select majority of the Hindus so that he may have an instrument to enforce his will when British rule is finally abandoned. If ever it comes to a tussle between Neharu and Savarkar as seems inevitable, there is little doubt who will win.

'Advancing age is rapidly disqualifying Gandhi for the position of a dictator'.

দেশগৌরব **সুভাষ চন্দ্র বসু** মালাবার হিলে মুসলিম লীগ সভাপতি মিঃ জিন্নার বাসভবনে এক সাক্ষাৎকারে হিন্দুমুসলিম ঐক্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে মিঃ জিন্না অসম্মতি জানাইয়া বলেন যে, কাহারো সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া কোন ফল হইবে না, এমন কি গান্ধীজির সঙ্গেও এই ব্যাপারে আলোচনা নিরর্থক, একমাত্র সাভারকরের সঙ্গেই আলোচনা করিতে পারেন যদি তিনি তাঁহার বাসভবনে আসেন। দেশ-

গৌরব জিন্নাভবনে আর বৃথা কাল হরণ না করিয়া 'দূর-ভাষণে' সাভারকরের সঙ্গে আলাপ করেন এবং **সাভারকর-সদনে** সাভারকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন ১৯৪০ সালে। ভারত-জননীর এই দুই বিপ্লবী সন্তানের মিলন সংবাদ তৎকালে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইলেও উভয়ের গূঢ় ও গভীর নিভৃত আলোচনা জনগণের অজ্ঞাত ছিল। জাপান শাখা হিন্দু মহাসভার সভাপতি এবং ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা মহাবিপ্লবী নায়ক রাসবিহারী বসুর সহিত বীর সাভারকরের পত্রালাপের গোপন তথ্যও দেশগৌরব সুভাষ চন্দ্র বসুকে দেখাইয়া ছিলেন। ইহা **ঐতিহাসিক সত্য** যে বীর সাভারকরের মন্ত্রণায় ও প্রেরণায় বর্হিভারত হইতে ব্রিটীশের বুকে সশস্ত্র আঘাত হানিয়া বাঙ্গলার সুভাষ ভারতের নেতাজী রূপে জনচিত্ত জয় করিয়াছেন।

নেতাজী স্বদেশবাসীর মুক্তির জন্য ভারতীয় জাতীয় বাহিনী লইয়া যখন বীরবিক্রমে অগ্রসর হইতেছিলেন এবং উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান জানাইয়াছিলেন - আমাকে রক্ত দাও আমি স্বাধীনতা দিব তখন গান্ধীজী সত্যাগ্রহ নামে শূন্যগর্ভ আস্ফালন করিয়াছিলেন, 'একভাই বি নেহি দেউঙ্গে এক পাই বি নেহি দেউঙ্গে', অর্থাৎ এক ভাইও দিব না, এক পাইও দিব না। অধিকন্তু তিনি উপদেশ বিতরণ করিলেন, 'ইংরাজবন্ধুর দুর্দিনে তাহাকে বিব্রত করিও না।' নেহেরু পন্ডিতজী ও নেতাজীর অসীম সাহসিক কার্য্যাবলী নাৎসীবাদের সঙ্গে তুলনা করিয়া ২য় বিশ্বযুদ্ধকালীন বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, সুভাষ চন্দ্র আসিলে খোলা তরবারি লইয়া তাঁহাকে বাধা দিবেন। ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টিও নেতাজী ও তাঁহার নির্ভীক সেনাবাহিনীকে দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক এবং নাৎসীবাদের নায়ক বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন।

ভারতসরকারও নেতাজীর বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার করিয়াছিল। ১৯৪৩ সালে বর্দ্ধমানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুমহাসভা সম্মেলনে নেতাজীর প্রতি মিথ্যাপবাদের প্রতিবাদে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। বীর সাভারকর ভারতময় ভ্রমণ করিয়া হিন্দু যুবকদিগকে আহ্বান জানাইলেন, 'তোমরা দলে দলে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও। কল-কারখানায় , জলে স্থলে, নভে যে যেভাবে পার অংশ গ্রহণ কর। এতকাল ইংরাজ ভারতীয়দিগকে সেনাবিভাগে নিয়োগ করিবার যে সুযোগ দেয় নাই, এখন সেই **সুযোগ** হেলায় হারাইও না। প্রত্যেক পরিবার হইতে অন্ততঃ একজন যুবক সমরে অবতীর্ণ হও। তোমাদের সাধনা বিফল হইবে না। রণক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তোমাদের প্রতিবেশীকে **সামরিক ভাবাপন্ন** করিতে পারিবে। ব্রিটীশ সরকার যখন দেখিবে সমর বিভাগে উচ্চপদ হইতে নিম্নপদে সর্বত্রই ভারতবাসী এবং জনগণও সামরিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ, তখনই ব্রিটীশ সরকার তোমাদের হাতে হাত মিলাইতে বাধ্য হইবেন। সংগ্রামের পথই স্বাধীনতার পথ। রণভূমে সংঘবদ্ধ হইয়া যদি বিপরীতর দিকেই অস্ত্রধারণ করিতে পার, তোমাদের নবজাগ্রত শক্তিকে কেহ প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। ভারতের প্রত্যেক হিন্দু-মুসলমান দিস্তা কাগজে স্বাক্ষর করিয়া যদি আবেদন নিবেদন করে যে উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই, বিবাদ নাই, সব ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই তথাপি ইংরাজ স্বাধীনতা দিবে না, স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে। হিন্দুযুবকগণ তোমরা দেখিতেছ না মুসলিম তরুণগণ দলে দলে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতেছে, তাহাদের নিকট তোমাদের

অনুপ্রেণা লাভ করা উচিৎ। বর্তমানে মুসলিম তরুণগণ ইংরাজকে সাহায্য করিতেছে সুতরাং পরবর্তীকালে ইংরাজ সরকার তাহাদিগকেই সুযোগ সুবিধা দিবে। কালক্রমে যদি তাহারা তোমাদিগকে আক্রমণ করে তোমরা কি করিবে? (যুদ্ধান্তে প্রতি দেশেই উচ্ছৃংখলতা এবং অরাজকতা দেখা যায়) আত্মরক্ষার জন্যও তোমাদের প্রস্তুত হওয়া কর্তব্য। পাড়ায় পাড়ায় রক্ষীবাহিনী গঠন কর।'

হিন্দুমহাসভার বিশিষ্ট নেতা স্বর্গীয় ডাঃ বাদল শঙ্কর মুঞ্জেও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া গেরিলা যুদ্ধ শিক্ষা করিবার জন্য এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিন্দু যুবকগণকে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান জানান। এই প্রচারের জন্য হিন্দুমহাসভা এবং বীর সাভারকরকে ভারতবর্ষের অন্যান্য জননায়কগণ কঠোর সমালোচনা করিয়া দোষারোপ করেন। বীর সাভারকর এই সব বিরুদ্ধ সমালোচনার প্রতিবাদে বলেন, 'বর্তমানে জাতির পক্ষে সামরিক শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা ভবিষ্যতে ইতিহাস স্বীকার করিবে। হিন্দু সংগঠনকারীগণ তোমরা কাহারো বিরূপ সমালোচনায় কর্ণপাত করিও না।

বীর সাভারকর রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার উৎসাহ দিয়াই উদাসীন থাকিতে পারেন নাই। ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রতি কোন প্রকার বৈষম্য মূলক আচরণ না করিয়া সম্মানজনক ব্যবহার করিবার জন্য মেজর এট্‌লির নিকট তারবার্তা প্রেরণ করিয়াছিলেন।

হিন্দুমহাসভার প্রচার কার্য্য মিত্র পক্ষের অনুকূলে থাকিলেও ভারত সরকার মুঞ্জের প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হিন্দুমহাসভার সামরিক বিদ্যালয়ে রাইফেল ব্যবহার করিবার যে অনুমতি ছিল তাহা বাতিল করিয়া দেন। লর্ড সভায় জনৈক সদস্যের উক্তিতেই ইহার কারণ বুঝিতে পারা যায়। উক্ত সদস্য মহাশয়ের মতে যদিও হিন্দুমহাসভার ভারতীয় তরুণদিগকে মিত্রপক্ষের হইয়া যুদ্ধে উৎসাহ দিতেছে তথাপি মহাসভাকে প্রত্যয় করা অনুচিত কারণ মহাসভায় **সাভারকর** এবং **শ্যামাপ্রসাদের** মত লোক আছেন। মিঃ আশুতোষ মুখার্জী ইংরাজকে ভয় না করিয়া হাতের মুঠার মধ্যে রাখিতেন। তাঁহাকে বলা হইত রয়েল বেঙ্গল টাইগার। তাঁরই পুত্র শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী। যৎকিঞ্চিতে এ (আনন্দবাজার) সম্পাদকীয় মন্তব্যও প্রকাশিত হইয়াছিল—ইংরাজরা জানিয়া রাখুন যে এখনো বাঙ্গলা দেশে বাঘের বংশ নির্মূল হয় নাই।

১৯৪৪ সালে ২৫শে ডিসেম্বর সান্ধ্য লগনে নেতাজীর কণ্ঠধ্বনি বেতার যন্ত্রে প্রতিধ্বনিত হইল, When due to misguided political whims and lack of vision allmost all the leaders of Congress party are decrying all the soldiers in Indian army mercenaries it is heartening to know that Veer Savarkar is fearlessly exhorting the youths of India enlist in the armed forces.

'This enlisted youth themselves provided us with trained men from which to draw the soldiers for our Indian National Army (Free Hindu Sthan 28th May 47)

অর্থাৎ কংগ্রেস নায়কগণ রাজনৈতিক খামখেয়াল এবং অদূরদর্শিতার জন্য যখন ভারতীয়

সৈনিকদিগকে অর্থপিশাচ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছিলেন তখন একমাত্র বীর সাভারকর ভারতীয় তরুণদিগকে যুদ্ধে যোগদান করিবার জন্য উৎসাহ দিতেছেন অবগত হইয়া বিশেষ আনন্দিত হই। এই সব শিক্ষিত সৈনিক দ্বারাই ভারতীয় জাতীয় বাহিনী গঠন করা সহজ হইয়াছে।

এই আন্দোলনের ফলে যুদ্ধান্তে দেখা গেল সেনাধ্যক্ষ রূপে হিন্দুগণ শতকরা ৬৪টি পদ অধিকার করিয়াছে এবং ভারত বিভাগের পর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ইংরাজ সামরিক কর্মচারী ব্যতীত যেইরূপ সহজভাবে পরিচালিত হইয়াছে পাকিস্থানে তাহা সেইরূপ সহজ হয় নাই।

১৯৪২ এর আগষ্ট বিপ্লবে কংগ্রেস নায়কগণ কারারুদ্ধ হইলে দিশেহারা ভারতবাসী বিবিধ নাশকতা মূলক কার্যে লিপ্ত হইয়া পড়িলেন। দেশবাসীকে নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত করিবার গুরুদায়িত্ব সভাবতই হিন্দুমহাসভার উপরই বর্তাইয়া ছিল এবং বীর সাভারকরও তাঁহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তিনি অদলীয় সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন এবং দেশবাসীকে সচেতন করিয়া বলিয়াছিলেন সাবধান 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন ভারত বিভাজন আন্দোলনে যেন পরিণত না হয়।'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারত সরকার ভারতীয়গণের পূর্ণ সহযোগিতা এবং সৌহার্দ্য কামনা করিলে বীর সাভারকর যুদ্ধকালের জন্য ভারতের ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস ও যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গে অখণ্ড ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিবার জন্য জাতি সংঘের নিকট সত্যবদ্ধ হইতে দাবী জ্ঞাপন করিলেন। ডোমিনিয়ন দাবী করিবার জন্য অপরাপর ভারতীয় নেতৃবৃন্দ তাঁহাকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করিয়াছিলেন কিন্তু পরিনামে এই সমালোচক গণই দুইজাতিবাদ স্বীকার করিয়া ধর্মের ভিত্তিতে খণ্ডিত ভারতের ডোমিনিয়ন মর্যাদা স্বাধীনতার বিজয় উল্লাসে গ্রহণ করিলেন। বিদ্রোহী কবি নজরুলের ভাষায় মা 'ডোমনী' হইলেন।

'দুলিয়ে মাজা বগল বাজা
বসে কেন অমনি রে,
ভাঙ্গা ঢোলে মার চাটি
মা হবেন আজ ডোমনীরে।
মা ভৈঃ স্বাধীন হয়েছি
যেই বলেছি, পৃষ্ঠে পাড়ল ঠাঁস
মনে পড়ল হায় এযে ডোমিনিয় ষ্টেটাস্'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর রকেট বোম যখন লণ্ডনে ইংরাজের শত শত গৃহ, ঘণ্টায় বিদ্ধস্ত করিতেছিল তখনো ব্রিটীশ সরকার ভারতবাসীর স্বাধীনতা আকাঙ্খার প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি দেখান নাই, বরং কঠিন ও কঠোর হস্তে ভারতকে শাসন ও শোষণ করিয়াছেন। ভারতের বাজার হইতে তামার পয়সা ও রূপার টাকার কুড়াইয়া লইয়া 'ফুটা' পয়সা এবং কাগজের টাকা প্রচলন করিলেন, ৪২ এর আগাষ্ট আন্দোলন চরম নিষ্ঠুরতার সহিত দমন করিলেন, সর্বাপেক্ষা উপদ্রুত অঞ্চল সুতাহাটা (মেদিনীপুর) এবং অস্তিচিমুরের নির্মমতা

ইংরাজ দমন নীতির উজ্বল স্বাক্ষর। সমর সংকটের দিন ব্রিটীশরাজ তাঁহার ভারতীয় প্রজাগণের নিকট করুণ কণ্ঠে আবেদন জানাইলেন মন্দিরে মস্‌জিদে গীর্জায় মিত্রশক্তির জয়ের জন্য প্রার্থনা করিতে। ইংরাজ মহিলাগণ ভারতীয় মহিলাগণের নিকট খোলা চিঠি লিখিলেন, ভারতীয় ভগিনীগণ, বিশ্বগ্রাসী এই ভয়াবহ সংগ্রাম বন্ধ করিতে আপনারা সাহার্য্য করুন। আমাদের কোন আশ্রয় নাই, দুগ্ধপোষ্য শিশু মাতৃদুগ্ধ হইতে বঞ্চিত। আমরা মূষিকের মত পরিখার (Trench) মধ্যে দিন কাটাইতেছি। ভারতীয় ভগনীগণ, মানবতার নামে আপনাদের নিকট আবেদন জানাইতেছি এই ভীষণ সমরানল নির্বাপণে আপনাদের কল্যাণ হস্ত প্রসার করেন। জাতীয় জীবনের এইরূপ ঘোর দুর্দিনেও ব্রিটীশ সরকার ভারতবাসীর স্বাধীনতা দাবী উপেক্ষা করিয়া কেন যুদ্ধে জয়লাভের পর বিজয়ীর আসনে বসিয়া ভারতবাসীর সহিত আপোষ রফা করিলেন।

নেতাজী যুদ্ধে পরাজিত হইলেও জীবন সংগ্রামে জয়ী হইলেন। নেতাজীর কণ্ঠে উদ্‌গত 'জয়হিন্দ্' রণহুংকার ভারতবাসীর হৃদয়ে ক্ষাত্র বৃত্তি উদ্দীপ্ত করিল। বিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, মাঠের কৃষক, কল কারখানার মেহনতী মানুষ, বক্তৃতা মঞ্চে জননায়ক সকলের মুখে এক কথা নেতাজীর মুক্তিমন্ত্র 'জয়হিন্দ্'। স্বাধীকার প্রাপ্তির তীব্র আকাংক্ষায় ভারতের আবাল— বৃদ্ধ নরনারীর চিত্ত যে কিরূপ উদ্বেলিত হইয়াছিল (কলিকাতা) বালীগঞ্জ জগবন্ধু উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র দ্বাদশ বর্ষীয় শ্রীমান দেবব্রত দাসের অন্তিম যাত্রায় নির্ভীক উক্তি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কলিকাতায় 'রসিদ আলী-দিবসে পুলিশের নির্মম ব্যায়নেট চার্জে দেবব্রত আহত হয়, উদারের অন্ত্র (Intestine) বাহির হইয়া পড়ে। শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে চিকিৎসক যখন বলিলেন, খোকা কোন ভয় নাই, বালক দেবব্রত তখনো নির্ভীক ভাবে বলিল, না ভয় করিব কেন। হাসপাতালে মাতাকে কাঁদিতে দেখিয়া আহত পুত্র সান্ত্বনা দিল, মা কেন কাঁদিতেছ, দেশের জন্য জীবন দেওয়া ত গৌরব, আমাকেএকগ্লাস জল দাও।

'সেথা রবি উঠে নাক
পড়ে যায় বেলা রে
হয় নাক বেচা কেনা
ভেঙে যায় মেলা রে।'

বালক দেবব্রত ইহজগতে নাই, আছে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নির্ভীকতার নির্বাক সাক্ষী স্মৃতিবেদী।

ব্রিটীশ শক্তির বিরুদ্ধে নেতাজীর প্রচণ্ড আঘাত, রসীদ আলী দিবস, নৌ বিদ্রোহ, বৈমানিক বিদ্রোহ, পুলিশ ধর্মঘট, ডাক ধর্মঘট এবং অনুরূপ ঘটনা পরম্পরায় রণক্লান্ত ব্রিটীশ সরকার স্তম্ভিত হইয়া গেল। বিশ্ববিজয়ী আলেকজাণ্ডারের সৈনিক গণ বীর পুরুরাজের প্রবল বিক্রমে ভীত হইয়া যেমন ভারতে অভিযান চালাইতে সাহসী হন নাই, ইংরাজ সরকারও তেমনই বীর বিপ্লবীদের বিক্রমে ভারতে শাসনদণ্ড আর নিরাপদ মনে করিলেন না, সুতরাং

ভারতবাসীর সঙ্গে আপোষ করিতে সচেষ্ট হইলেন। এই আপোষ সিদ্ধান্তের মূল বিষয় হইল প্রথমতঃ ভারতবর্ষ **অখণ্ড** থাকিবে, অথবা হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানে **বিভক্ত** হইবে তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা করা। দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষ বিভক্ত হইলে কোন পদ্ধতিতে ভারতের নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দের নিকট তাহা উপস্থাপিত করা হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করা। তৃতীয়তঃ ভারত বিভক্ত হইলে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের (পূর্ব ঘোষণা মত) পূর্বে বৃটেনের ভারত ত্যাগের কালে সশস্ত্র বাহিনীও অপরাপর আবশ্যক বিভাগ সমূহ বণ্টন প্রশ্নের যাহাতে সুমীমাংসা হয়, তজ্জন্য কিভাবে বিভাগ হইবে তৎসম্পর্কে যত সত্বর সম্ভব ভারতবাসীর মতামত গ্রহণ করা। ভারতের এই জটিল সমস্যার সমাধান কল্পে, ভারতে মন্ত্রীমিশন আসিলেন। বহু আলোচনার পর ১৯৪৬ সালের ১৬ই মে মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনা ঘোষিত হয় এবং কংগ্রেস ও লীগ তাহা গ্রহণ করেন। বীর সাভারকর এই পরিকল্পনার তীব্র বিরোধিতা করেন। মুসলীম লীগ প্রথমতঃ পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেও পরে বর্জন করায় মন্ত্রী মিশনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। ১৯৪২ সালেও স্যার ক্রীপস্ বিশেষ দূত রূপে ভারতে আসিয়া ছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতবাসীর সৌহার্দ্য কামনায় এবং ভারতীয় রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান আলোচনায়। বীর সাভারকর স্যার ক্রীপ্স-এর সঙ্গে প্রথম আলোচনাতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দূতের যেইরূপ বিশেষ ক্ষমতা থাকে স্যার ক্রিপ্স এর সেইরূপ দৌত্য ক্ষমতা নাই। সুতরাং তিনি অপরাপর ভারতীয় নেতাদের মত স্যার ক্রিপস্ এর সঙ্গে সান্ধ্য ভ্রমণ কিম্বা নৈশ ভোজনে সময় অতিবাহিত করেন নাই। স্যার ক্রিপস্ দ্বিতীয় বার বীর সাভারকরকে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিলে বীর সাভারকর বলিয়াছিলেন, আপনার সঙ্গে আলোচনায় রাজনৈতিক সমস্যার কোন সমাধান হইবে না। আপনি আমাদের দেশে আসিয়াছেন, অতিথি রূপেই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারি। বলা বাহুল্যমাত্র যে **ক্রীপস্ দৌত্যও ব্যর্থ** হইয়াছিল।

ব্রীটিশ সরকার ভারতবাসীকে ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে আগ্রহী কিন্তু হিন্দু মুসলিম সমস্যাই প্রধান অন্তরায় বলিয়া প্রচার করেন। বীর সাভারকর ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, খৃষ্টানুগামী হইয়াও ইংরাজ জাতি খৃষ্টধর্মাবলম্বীর সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া যে সৌভ্রাত্র প্রীতির পরিচয় দিতেছে তাহাতে ভারতের হিন্দু মুসলিম সমস্যাকে ভারতবাসীর স্বাধিকার প্রাপ্তির অন্তরায় বলিয়া প্রচার করা **অন্যায় ও অযৌক্তিক**।

ভারতময় পর্যটন এবং কঠোর পরিশ্রমের ফলে সাভারকর ক্রমশঃ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং শয্যাশায়ী হইলেন। তাঁহার চিকিৎসকগণ তাঁহাকে রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকিতে নির্দেশ দেন।

১৯৪৬ সালে ১৬ই আগষ্ট মুসলিম লীগ '**প্রত্যক্ষ সংগ্রাম**' (Great Calcutta Killing) দিবস কলিকাতায় পালন করে। এই প্রত্যক্ষ সংগ্রামে হিন্দুর ধন প্রাণ নারীর মর্যাদা বিনষ্ট হইল। সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৪৬) নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলায় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় নাদীর শাহী আক্রমণ, লুণ্ঠন, নিধন, নারী নির্যাতন হরণ এবং বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ দ্বারা সংখ্যা লঘুর ধ্বংস স্তূপে ঐসলামিক বিজয় পতাকা উড্ডীন উদ্যোগী হইলে বিহারেও

প্রতিক্রিয়া স্বরূপ শান্তি ভঙ্গ হইল। 'বাংলা জ্বলে, পাঞ্জাব জ্বলে ভুলো মাৎ ভুলো মাৎ। হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই' রবে যখন বিহারী হিন্দুরা মারমুখী হইয়া উঠিলেন তখন ডাঃ সৈয়দ মামুদ প্রভৃতি মুসলিম জন নায়কগণ মিঃ জিন্নার নিকট তারবর্তায় আবেদন জানান, 'যদি বিহারী মুসলমানদের প্রতি আপনার কোন দরদ থাকে বাংলার দাঙ্গা হাঙ্গামা বন্ধ করেন।' বিহারের দাঙ্গা বন্ধ না হইলে অনশনে প্রাণ ত্যাগ করিবেন বলিয়া গান্ধীজী দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করেন। পণ্ডিতজী গোরা ও পাঠান সৈনিক দ্বারা কঠোর হস্তে উপদ্রব নিবারণ করেন। (তৎকালে বাংলা লীগমন্ত্রী শাসিত এবং বিহার কংগ্রেস মন্ত্রী শাসিত ছিল।) ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মহাসভার পতাকা হস্তে বিপন্ন হিন্দুকে রক্ষার জন্য নোয়াখালী এবং ত্রিপুরা জেলায় পরিভ্রমণ করেন। গান্ধীজীও তথায় শান্তি পরিক্রমা করেন। বীর সাভারকর রুগ্ন শয্যায় থাকিয়াও বিহারের হিন্দুদিগকে সম্বোধন করিয়া বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন।

'হে বীর বন্ধুগণ' আপনারা যেরূপ বীরত্বের সহিত হিন্দু বিরোধী অভিযান প্রতিরোধ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। আপনাদের বীরত্বপূর্ণ কার্যের দ্বারা আপনারা যে শুধু আপনাদিগকেই রক্ষা করিয়াছেন তাহা নহে, আপনারা তদ্দ্বারা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের হিন্দু দিগকেও রক্ষা করিয়াছেন।

'ভারতবর্ষের সর্বত্র এক শ্রেণীর লোক আপনাদের বিরুদ্ধে যেরূপ অত্যাচারের অভিযান চালাইতেছে সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অবহিত আছি। বাংলায় এক শ্রেণীর লোকের উপর অকথ্য অত্যাচার হওয়ায় যে আপনারা বিশেষ ভাবে বিক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন ঐ শ্রেণীর লোকের মতে উহাই আপনাদের জঘন্যতম অপরাধ। দংশনোদ্যত ফণীকে কেহ আঘাত করিলেও ঐ শ্রেণীর লোক তাহারও নিন্দা করিবেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, হিন্দুধর্ম একটি বাস্তব জাতীয়তাবাদের মূর্ত প্রতীক। পৃথিবীর যে কোনও স্থানে একজন হিন্দুর প্রতি অবিচার বা অত্যাচার করা হইলে তাহা সমগ্র হিন্দুজাতির প্রতি অপমানকর এবং হিন্দু মাত্রেই উহার প্রতিকার করিতে বদ্ধ পরিকর হইবে।

"ভারতের বহু গণ্যমান্য নেতা, যদিও তাঁহারা বিহারী নহেন কিন্তু বিহারের জন্য অশ্রু-বর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন যে, বিশ্বের কোন অংশে একজন মুসলমানের প্রতি অবিচার করা হইলে, উহার প্রতিবিধান গ্রহণ করিবার **অধিকার** মুসলমানদের আছে কিন্তু কোন স্থানে হিন্দুর প্রতি অত্যাচার করা হইলে তাহার প্রতিকার করিবার **অধিকার** অন্য হিন্দুর নাই। বাংলার হিন্দুদের জন্য যদি বিহারের হিন্দুগণ বেদনা অনুভব করেন, তাহা হইলে বিহারী হিন্দুদের উপর তাঁহারা (নেতারা) বোমাবর্ষণ ও গুলীবর্ষণ ইত্যাদির হুমকি দেখান।

"কিন্তু হে বিহারের বীর সন্তানগণ, আমি আপনাদিগকে নিশ্চিত বলিতে পারি যে, হিন্দুস্থানের লক্ষ লক্ষ হিন্দু আপনাদের বীরত্বের প্রশংসা করিতেছেন এবং আপনাদিগকে আর্শীবাদ করিতেছেন। আপনাদের চিন্তায় এবং কার্যে হিন্দুধর্মের বিশ্বজনীন আদর্শের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে বলিয়া আপনারা হিন্দুমাত্রেরই আশীর্বাদ ভাজন হইবেন।

"আমি জানিতে পারিয়াছি যে, গান্ধীজী বর্ষাকাল আগমনের পূর্বেই বিহারের হিন্দুদের

নিজ নিজ বাড়ীতে মুসলমানদের আশ্রয় দিবার উপদেশ দিয়াছেন এবং মুসলমানদিগকে হিন্দুদের নিজ নিজ পরিবারের লোক হিসাবে ব্যবহার করিবার জন্য ওকালতি করিয়াছেন। ঐ ভদ্রলোক বোধহয় চাহেন যে, ভারতের প্রতিটি হিন্দুর ঘর এক একটি পাকিস্থানে পরিণত হউক। আমি আপনাদিগকে বলিতে চাহি যে, ক্ষিপ্তলোকের ন্যায় যাঁহারা ঐরকম কথা বলেন, তাহাতে আপনারা কর্ণপাত করিবেন না। বিহারের কোনও হিন্দুর ঘরে যদি স্থান থাকে এবং কিছু পরিমাণ খাদ্য বরাদ্দ থাকে তাহা বাংলার দুর্গত হিন্দুদের সাহায্যার্থে দিবার জন্য আমি আপনাদিগকে **অনুরোধ** করিতেছি, কারণ **তাঁহারাই আপনাদের নিজের ভাই।**

'বিহারে মুসলমানদের পৃথক বাসস্থানের যে ব্যবস্থা করা হইতেছে তাহাতে প্রাণপণে বাধাদান করিবার জন্য আমি আপনাদিগকে বলিতেছি। আপনারা স্মরণ রাখিবেন যে, এই সকল মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল অদূর ভবিষ্যতে **পাকিস্থানী কড়িডোরের সহায়ক** হইবে। বিহারের কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আপনারা সাবধান হউন। ....''

নোয়াখালী ত্রিপুরা জেলায় নির্মম, নিষ্ঠুর হিন্দু-নিপীড়নের সংবাদ শ্রবণ করিয়া মর্মপীড়ায় ভগ্নহৃদয়ে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রাণত্যাগ করেন। কলিকাতার দাঙ্গায় বহু প্রবাসী বিহারী ধনে প্রাণে নিধন হন। প্রিয়জন শোকাহত বিহারী হিন্দু-জন-চিত্ত যে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবে তাহাই স্বাভাবিক।

ব্রিটীশ সরকার ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যেই ভারতীয়দের হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, কিন্তু সেই ক্ষমতা গ্রহণের যোগ্য প্রতিনিধিকে তাহাই সমস্যা রূপে দেখা দিল। **মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানগণের প্রতিনিধি বলিয়া ঘোষণা করিল। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতবর্ষে হিন্দু মহাসভাই হিন্দুদের প্রতিনিধি বলিয়া দাবী জ্ঞাপন করিল।** কংগ্রেস হিন্দু-মুসলমান উভয়েই প্রতিনিধি বলিয়া প্রচার করিল। পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে (অর্থাৎ হিন্দু প্রার্থীর জন্য হিন্দু ভোট এবং মুসলমান প্রার্থীর জন্য মুসলমান ভোট) ভোট গ্রহণ করা হয়। মুসলিম নির্বাচন কেন্দ্রে কংগ্রেস ন্যাসানেলিষ্ট পার্টি নামে মুসলিম প্রার্থী মনোনিত করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। হিন্দুমহাসভা এবং মুসলিমলীগও স্ব স্ব নির্বাচন কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ১৯৪৫ সালের এই গুরুত্বপূর্ণ নির্ব্বাচনে সাভারকর বলিয়াছিলেন, **কংগ্রেসকে একটি ভোট দেওয়ার অর্থ পাকিস্থানের পক্ষে একটি ভোট দেওয়া**, সুতরাং হিন্দু নির্বাচকগণের উচিত প্রতিটি ভোট হিন্দু সংগঠনকারীকেই দেওয়া। হিন্দুমহাসভা পাকিস্থান দাবীর বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতের হিন্দুজনমত উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছিল, এবং কংগ্রেসের চিরন্তন মুসলিম তোষণনীতির জন্য কংগ্রেসের প্রতি হিন্দুগণের আস্থা বহুলাংশে শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রীপুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন বলিয়াছিলেন, 'পাকিস্থান পরিকল্পনা বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ণ এবং যাহারা কংগ্রেস লীগ ঐক্যের ধূয়া তুলিয়াছেন ও পাকিস্থানের সমর্থন করিতেছেন তাহারাও নিমকহারাম।' পণ্ডিত নেহেরুও বলিয়াছিলেন, 'কংগ্রেসকে ভোট দাও, কংগ্রেস অখণ্ড ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিবে।' সর্দার প্যাটেলও বলিয়াছিলেন, 'কংগ্রেসই ভারতের অখণ্ড সত্ত্বা সংরক্ষণে সমর্থ সুতরাং কংগ্রেসই ভোট পাওয়ার যোগ্য অধিকারী'। গান্ধীজী বলিয়াছিলেন, 'পাকিস্থান স্বীকার করা মহাপাতক।

ভগবান করুক ভারতমাতা দ্বিখণ্ডিত হওয়ার পূর্বে যেন আমার দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়।' নির্বাচনে মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসেরই জয় হয়। মুসলিম লীগের প্রত্যেক প্রার্থী নির্বাচিত হয়, মুসলিম কেন্দ্র হইতে কংগ্রেসের মনোনীত কোন প্রার্থী নির্বাচিত না হইলেও কংগ্রেস যেইরূপ বিপুল বিপুল সংখ্যক ভোট পাইয়াছিল বিশ্বে কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে একক ঐরূপ ভোট পাওয়া **বিস্ময়কর** ব্যাপার। ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর ভারত আগমনের ফলে বিশাল জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় যে **ভাববন্যা** প্লাবিত হয় তাহাতেই কংগ্রেসের জয়ের পথ সুগম হয়। কংগ্রেস ভোটযুদ্ধে জয়ী হইয়া নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভুলিয়া গেল এবং মুসলিম লীগের সঙ্গে হাত মিলাইয়া ভারত বিভাগে সম্মত হইল। কংগ্রেসের মহারথীরা যে ব্রিটীশ সরকারের সহিত সংগ্রামের পরিবর্তে রফা করিবার পক্ষপাতী, দেশ গৌরব **সুভাষচন্দ্র বসু** এই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়াই কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত হইয়া শ্রদ্ধানন্দ পার্কে (কলিকাতায়) আপোষের কুশপুত্তলিকা দাহ করিয়া আপোষহীন সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছিলেন।

নেতাজী অজ্ঞাতবাসে, অখণ্ড ভারতের সংগ্রামী নায়ক সাভারকর রুগ্ন শয্যায় সুতরাং নির্বাচনে বিজয়ী কংগ্রেসের ভারত বিভাগ সিদ্ধান্তে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রহিল না। ভারত বিভাগ যখন অনিবার্য হইল তখন সাভারকরের নির্দেশে হিন্দুমহাসভা ভবিতব্য পাকিস্থান ভাগ করিবার প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করে অর্থাৎ বাঙ্গলা ও পঞ্জাবে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল পাকিস্তানের পূর্ণ গ্রাস হইতে উদ্ধার করিতে প্রয়াসী হয়।

১৯৪৭ সালের ৩রা জুন সন্ধ্যায় নয়াদিল্লী হইতে ভারত সম্পর্কে ব্রিটীশ সরকারের সিদ্ধান্ত করা হয়। ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের ভিত্তিতে এক বা একাধিক কর্তৃপক্ষের হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং বাঙ্গলা ও পঞ্জাব বিভাগ সহ ভারত বিভাগের পরিকল্পনা, সীমান্ত প্রদেশ ও শ্রীহট্টে গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থার কথা বিশ্লেষণ করা হয়।

৩রা জুন ৪৭, লণ্ডনে কমন্স সভায়ও ব্রিটীশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ক্লেমেন্ট এটালী ঘোষণা করেন যে, ভারতের একটি বা দুইটি কর্তৃপক্ষের হাতে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস প্রদান করিবার জন্য ব্রিটিশ পরিকল্পনা ভারতের প্রতিনিধিগণ আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। * * * * * ভারতীয় বিভিন্ন সম্প্রদায় যদি অখণ্ড ভারতের ভিত্তিতেআলোচনা চালাইতে চাহে তাহাতে বাধা দিবার কোন পরিকল্পনা ব্রিটীশ সরকারের নাই। * * * বাংলা এবং পঞ্জাবের আইন সভায় হিন্দু এবং মুসলমান সদস্যগণ (ইউরোপীয় সদস্যগণ বাদে) পৃথক পৃথক ভাবে মিলিত হইয়া স্থির করিবেন যে উক্ত প্রদেশদ্বয় বিভক্ত হইবে কিনা। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং আসামের শ্রীহট্ট অঞ্চল হিন্দুস্থান বা পাকিস্থানে যোগদান করিবে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য উভয় স্থানেই গণভোট গ্রহণ করা হইবে।

৩রা জুন, ১৯৪৭, পণ্ডিত নেহেরু বেতার ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন যে, ব্রিটীশ সরকারের পরিকল্পনা গ্রহণে আমরা মনস্থ করিয়াছি এবং উহা গ্রহণ করিবার জন্য বৃহত্তর সমাজের নিকট উপস্থিত করিতেছি হিংসাচারের অবসান চাই। আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকারের ভিত্তিতে ভারত বিভাগে সম্মত। এই সম্মতির ফলে একদিকে ভারত হইতে কতকগুলি অঞ্চল বিচ্ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে, আবার অন্যদিকে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার পথে এক বিরাট অগ্রগতির

প্রতিশ্রুতিও রহিয়াছে। এই পরিবর্তন সাধিত হইবার পূর্বে অবশ্য জনগণের সমর্থন থাকা বাঞ্ছনীয়। উক্ত তারিখে মিঃ জিন্না তাঁহার বেতার ভাষণে বলেন, লীগ কাউন্সিলই ব্রিটীশ পরিকল্পনা সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। ব্রিটীশ সরকারের এই পরিকল্পনা একটা 'আপোষ' অথবা বন্দোবস্ত হিসাবে গ্রহণ করা না করা আমাদের উপরই নির্ভর করে।

৩রা জুন, ১৯৪৭, বীর সাভারকর সিন্ধুর হিন্দু অধিবাসীদের এক তারবার্তায় বলেন যে, হিন্দুস্থান ইউনিয়ন যোগদানের নিমিত্ত সিন্ধুপ্রদেশের হিন্দুসংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলিকে পৃথক করার জন্য আপনারা কার্য্যকরীভাবে দাবী জানান। পাকিস্থান হউক বা নাই হউক অখণ্ড হিন্দুস্থানের স্বার্থরক্ষার্থ হিন্দুসংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলিকে পৃথক করিতেই হইবে।

শ্রীহট্ট হিন্দুস্থান অথবা পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইবে তাহা নির্দ্ধারনের জন্য গণভোট গ্রহণ করা হয়। লালা লাজপত রায়ের কথায় 'প্রত্যেক মুসলমানই একজন শ্রেষ্ঠ রাজ নীতিজ্ঞ, (Every Muslim is a best politician)। নোয়াখালী, ত্রিপুরা এবং মৈমনসিং জেলা হইতে দলে দলে মুসলমান শ্রীহট্টে আসিয়া বাস করিতেছিলেন এবং মুসলমি লীগ সর্বপ্রকারে তাহাদিগকে উৎসাহ ও সাহায্য করিয়াছিল। পাকিস্থান দাবীর সূচনা হইতেই লীগ তথায় মুসলমান সংখ্যা গরিষ্ঠতার জন্য সচেষ্ট ছিল। ভোটের ব্যাপারে আরো তৎপর হইয়া উঠিল। বীর সাভারকর আসামের প্রধানমন্ত্রী শ্রীগোপীনাথ বরদলুই এর নিকট ৫ই মে ১৯৪৭, নিম্নলিখিত তারবার্তা প্রেরণ করেন ঃ—

হিন্দু সংগঠনীরা আক্রমণকারীদের সহিত ভীরুর মত আপোষ মীমাংসার নিন্দা করিতেছে কারণ উহার ফলে আরো আক্রমন হইবে। বে-আইনীভাবে নূতন ও পুরাতন যে সকল বহিরাগত মুসলমান প্রবেশ করিবে তাহাদের প্রত্যেককে বাহির করিয়া দিতে হইবে এবং আসামের এক ইঞ্চি পরিমাপ জমিও ছাড়া হইবে না। অতীতে হিন্দুরা ইঞ্চি ইঞ্চি করিয়া জমি ছাড়িয়া দিয়াছে, ফলে আজ সমগ্র হিন্দুস্থান ছাড়িয়া দিবার জন্য হুমকী দেওয়া হইতেছে। আসামের হিন্দুরা সেই পূর্বপুরুষগণেরই বংশধর একদা যাহারা আওরঙ্গজেবের সৈন্যবাহিনীকে হটাইয়াছিল। আজ কী তাহারা এই লীগ-চমূদের নিকট আত্মসমর্পণ করিবে? আসাম শৌর্যপূর্ণ হিন্দু প্রদেশ হিসাবে অখন্ড হিন্দুস্থানের পূর্ব সীমান্ত বিস্তার ও রক্ষা করিয়া তাহার সুপ্রাচীন উদ্দেশ্য সফল করিবে। (চমূ = সৈন্যবাহিনী)

শ্রীহট্টে গণভোটের সিদ্ধান্ত জুনমাসে ঘোষণা করা হয়। দূরদ্রষ্টা রাষ্ট্রিক সাভারকর মে মাসেই সর্তক বাণী উচ্চারণ করেন। কিন্তু ইহা অপ্রিয় এবং তিক্ত সত্য যে, অসমীয়া হিন্দুগণ শ্রীহট্টে বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা গরিষ্ঠতার ভয়ে জাতীয়তা ত্যাগ করিয়া প্রাদেশিকতাই গ্রহণ করিয়াছিল। বাঙ্গালী হিন্দুগণ যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াও শ্রীহট্টে ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত রাখিতে পারিল না।

৪ঠা জুন ১৯৪৭, তদানিন্তন বড় লাট লর্ড মাউন্ট ব্যাটন নয়াদিল্লী সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, 'সম্মিলিত ভারতই আমার কাম্য ছিল। মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনা গ্রহণের সময় এখনও আছে। নেতৃবৃন্দ সেই পরিকল্পনাই গ্রহণ করিবেন অথবা ভারত বিভাগ তথা সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশ বিভাগের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন তাহা তাঁহারাই স্থির করিবেন। আমি অকপট

ভাবেই বলিতেছি যে , ১৯৪৮ সালের জুন মাসের পূর্বেই সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতা হস্তান্তর কায্য সম্পন্ন হইবে। আমি সরল ভাবেই এই কথা বলিতেছি ইহাতে কোন ছল চাতুরী নাই।

৪ঠা জুলাই , ৪৭, নয়া দিল্লী হইতে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন, 'ব্রিটিশ সরকারের নূতন পরিকল্পনায় ভারত বিভাগের যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা ভারতের হিন্দুজাতি সমর্থন করিতে পারে না। তথাপি মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনার তুলনায় বর্তমান পরিকল্পনাই শ্রেয় । বাঙ্গলা ও পঞ্জাব বিভাগের নীতি গৃহীত হওয়ায় আমাদের প্রথম জয় হইয়াছে। ......ভারতীয় নেতৃবৃন্দ কর্ত্তৃক ব্রিটিশ পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ায় বৈদেশিক মহলের মতামত; ডেলী টেলিগ্রাফ্ মন্তব্য করে, 'ভারতে ঐক্য স্থাপন করাই ছিল ব্রিটিশের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান কিন্তু বর্তমান ঘোষণায় সেই আদর্শ ধ্বংস করা হইয়াছে।.......ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান ....ঐক্য এবং অখন্ডত্বকে ধ্বংস করিয়া যে পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে, ভারতীয়দের তাহা গ্রহ্ণ করিবার কথা বুঝিয়া উঠা দায়। ইয়র্কশায়ার পোষ্ট-১৯৪২ এর ক্রীপস্ প্রস্তাব এবং বর্তমানের সমাধান কায্যত একই। সেই সময় ক্রীপস্ প্রস্তাব গৃহীত হইলে, বহু রক্তপাত ও দুঃখদুর্দশা ঘটিত না। কানাডার প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকেসিকিং বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, ব্রিটিশ কমনওয়েলথ এর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। ফরাসী সরকারের মুখপাত্র বলেন, ব্রিটিশ কূটনৈতিকদের বিরাট জয় হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রী জেনারেল স্পার্টস বলেন যে, ভারতের উপর ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস বর্ষণ করা হইল। ডেলী ওয়ার্কার, সাম্রাজ্য বাদ নূতন পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। ভারতকে নিজ সমস্যা সমাধান করিতে দেওয়া হয় নাই এবং স্বাধীনতা ঘোষণার কোনও কথা নাই। পরিকল্পনায় একহাতে যাহা দান করা হইয়াছে অপর হাতে তাহাই অপহরণ করা হইয়াছে। পরিকল্পনা রচনা কারীদের বিশ্বাস ভারতকে বিভক্ত করিয়া হিন্দু ও মুসলমানকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লাগাইয়া দিলেই প্রকৃত ক্ষমতা হাতে রাখিতে পারিবেন ইহা করিতে যাইয়া বাহিরের খোলসটা পরিত্যাগ করিলেও কিছু আসে যায় না। রজনী পাম দত্ত বলেন, 'পূর্ণ স্বাধীনতার পথে ভারত বিভাগ মারাত্মক অন্তরায় হইবে।' প্রখ্যাত লেখিকা পার্লবার্ক বলেন, 'ভারতের জনগণ বিভক্ত দেশকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঈর্ষায় পরিপূর্ণ ইউরোপে পরিণত করিতে পারে আবার ইচ্ছা করিলে বন্ধু ভাবাপন্ন রাষ্ট্রসমূহ লইয়া এক ইউনিয়নও গঠন করিতে পারে। প্রতিটি ইউনিয়ন যদি সর্বপ্রথম ভারতের কথা তারপর নিজেদের কথা চিন্তা করে তবে ভারত বিরাট ও শক্তিশালী হইতে পারিবে, অন্যথায় শীঘ্রই হউক কিম্বা বিলম্বেই হউক দুর্বলতার জন্য ভারত পুনরায় পরাধীন হইবে।'

ভারত বিভাগ সম্পর্কে বীর সাভারকর এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন, বিগত নির্বাচনে হিন্দু নির্বাচক মন্ডলী এই আশাতেই কংগ্রেসী হিন্দু প্রার্থীদিগকে ভোট দিয়াছিলেন যে, তাঁহারা প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন সভায় থাকিয়া অখন্ড ভার তেরেই চেষ্টা করিবেন। আজ বিভক্ত ভারতের সমর্থনের অধিকার—প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় হিন্দু সদস্যদের এমন কী গণ-পরিষদেরও নাই। ভারত বিভাগের পরিকল্পনায় সমর্থন করিতে হইলে তাহাদের পুনরায় নির্বাচনে দাঁড়াইতে হইবে।

পুন নির্বাচনের দাবী করিয়া হিন্দু নির্বাচক মন্ডলীর বুদ্ধিবৃত্তিকে আমি লঘু করিয়া দেখিতেছি

না। সকলের অপেক্ষা আমি ইহা মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছি যে, একমাত্র হিন্দু-সাংগঠনিক দল ছাড়া অপর সকল হিন্দু আজ মিথ্যা জাতীয়তাবাদে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহা এমন এক অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় গিয়া পড়িয়াছে যে যাহারা সারা জীবন হিন্দুত্বের উদ্ধারকল্পে, হিন্দুত্বের জাগরণের দাবীতে পরম বেদনা দুঃসহ কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া আসিতেছে তাহাদের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা হারাইয়া, যাহারা পদে পদে হিন্দুর অধিকার হিন্দুর জাতিগত দাবীকে বিড়ম্বিত করিয়া আসিতেছে, তাহাদের প্রতিই বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে। হিন্দু সংগঠন কারীদের নিকট আজ আবার আহ্বান আসিয়াছে, সমগ্র হিন্দুমনে আবার চেতনার প্রবাহ সঞ্চারিত করিতে হইবে। হিন্দুদের সম্মুখে আজ দুইটি বিরাট কর্ত্তব্য উপস্থিত। প্রথমটি অখন্ড হিন্দুস্থান, দ্বিতীয়টি বাঙ্গলা, পঞ্জাব ও সিন্ধুতে হিন্দু প্রদেশ গঠন। সমগ্র হিন্দু জাতির তাই আজ জাগরণের প্রয়োজন।'

হিন্দুমহাসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত ভোপৎকারের নিকট বীর সাভারকর এক তার বার্তায় বলেন (৪ঠা জুন ৪৭), কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ত্তের বাহিরে সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতে হইবে। বিদ্রোহী মুসলিম প্রদেশগুলিকে পুনরায় হিন্দুস্থানের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। বাঙ্গলা, পঞ্জাব ও সিন্ধুতে নূতন হিন্দু-প্রদেশ গঠন করিতে হবে। পাকিস্তান বিরোধী 'কৃষ্ণ দিবস' ও পালন করা উচিৎ।

১৯৪৭ এর ২০ শে জুন, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাংলার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রথমে হিন্দু প্রধান ও মুসলমান প্রধান অংশের সদস্যগণের এক সম্মিলিত অধিবেশন হয়, এবং প্রস্তাব উত্থাপিত হয় যে বর্তমান গণপরিষদে সমগ্র বাংলার যোগদান কর্তব্য; ১২৩-৯০ ভোটে উক্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। অতঃপর দুই প্রধান অংশের সদস্যগণ পরিষদ ভবনে পৃথক পৃথক সভা করেন। হিন্দু প্রধান অংশের সভায় বঙ্গ বিভাগের সিদ্ধান্ত ৫৮-২১ ভোটে গৃহীত হয়। লীগ দল প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। মুসলমান প্রধান অঞ্চলের সভায় লীগ দলের নেতৃত্ব করেন মিঃ সুরাবর্দী, কংগ্রেস দলের নেতৃত্ব করেন শ্রীধীরেন্দ্র নারায়ণ মুখার্জী। মুসলিম অঞ্চলের সভায় সভাপতিত্ব করেন মিঃ নরুল আমিন এবং হিন্দু প্রধান অঞ্চলের সভায় সভাপতিত্ব করেন বর্ধমানের মহারাজা উদয় চাঁদ মহাতব বাহাদুর। মুসলমান প্রধান অঞ্চলের সভায় বঙ্গ বিভাগ প্রস্তাব ১০৬-৩৫ ভোটে পরিত্যক্ত হয়।

১৯৪১ সালের লোকগণণায় মুসলমান প্রধান জেলা চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ত্রিপুরা, বাখরগঞ্জ, ঢাকা, ফরিদপুর,ময়মনসিংহ, যশোর, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বগুড়া, দিনাজপুর, মালদহ, পাবনা, রাজসাহী, রংপুর। কোন কোন জেলা লইয়া পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ গঠিত হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য একটি বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠিত হয়। উক্ত ট্রাইবুনালে কংগ্রেস পক্ষের কৌশলী ছিলেন শ্রীঅতুল চন্দ্র গুপ্ত, হিন্দুমহাসভার পক্ষে শ্রীনির্মল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মুসলিমলীগের পক্ষে মিঃ এ, কে, ফজলুল হক।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট (ধর্মের ভিত্তিতে খন্ডিত ভারতে ঔপনিবেশিক সায়ত্ত্ব শাসন) স্বাধীনতার বিজয় আনন্দ উৎসব রূপে উদ্‌যাপন করিবার জন্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ আবেদন জানান। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়ও নবলব্ধ স্বাধীনতার মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়। এই উল্লাস

উন্মত্ততার মধ্যে একমাত্র সাভারকরই আবেদন জানাইলেন, 'স্বাধীনতার দিবস নহে, **মাতৃ হত্যার শোক দিবস** পালন করেন, আনন্দ উচ্ছ্বাস নয়, শোক জ্ঞাপন করেন, বিজয় গৌরব পতাকা নয়, বিষাদের কৃষ্ণ পতাকা প্রতিগৃহে উত্তোলন করেন।' বর্ষীয়ান সংগ্রামী বীর পুরুষের অন্তরের গভীর বেদনা দেশবাসী সেই দিন উপলব্ধি করিতে না পারিলেও ইদানীং ছিন্নমূল ভারতবাসী উপলব্ধি করিতেছেন।

'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়।'

আজন্ম বিপ্লবী সাভারকর ১৫ই আগষ্টের এই আনন্দ উৎসব স্বাধীনতার বিজয় উল্লাস রূপে গ্রহণ করিতে পারিলেন না কেন? নয়াদিল্লীতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে (মধ্য রাত্রি এক ঘটিকায়) কলিকাতার লাট ভবনেও বাঙ্গলার পরাধীনতার অবসান ঘোষিত হয়। বাংলার নূতন গর্ভনর শ্রী চক্রবর্তী রাজাগোপাল আচারিয়া নিম্নলিখিত শপথ গ্রহণ করেন 'আমি ধর্মত প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি যতদিন পশ্চিমবঙ্গের গর্ভণর থাকিব, ততদিন আমি রাজা **৬ষ্ঠ জর্জ** ও তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের প্রতি এবং আইন অনুসারে বিধিবদ্ধ ভারতীয় শাসনতন্ত্রের প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকিব এবং ভয়, অনুগ্রহ, প্রীতি বা বিরাগ দ্বারা প্রভাবান্বিত না হইয়া ভারতের আইন ও প্রথা অনুসারে সমস্ত শ্রেণীর অধিবাসীদের প্রতি সুবিচার করিব।' (আনন্দ বাজার, শুক্রবার ২৯শে শ্রাবণ ১৩৫৪ Friday, 15th Nov 47) শপথ বাক্যের **রাজানুগত্য** লক্ষণীয়। মুক্তি সংগ্রামী সাভারকর ডোমিনীয়ন ষ্টেটাস্‌কে স্বাধীনতার মর্যাদাদানে কুণ্ঠিত হইবেন ইহাতে আর বিচিত্র কি?

স্বাধীনতা সপ্তাহ পালন উপলক্ষে নয়াদিল্লীতে একজন সভায় সর্দার প্যাটেল বলিয়াছিলেন, 'পরাজয়ের মনোভাব লইয়া দেশ বিভাগ মানিয়া লই নাই। আজ যাহারা আমাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, তাহাদের মোহময় স্বপ্ন মিলাইয়া যাইতে খুব বেশী দেরী নাই; শীঘ্রই তাহারা আবার ভারতের অবশিষ্ট অঞ্চল সমূহের সঙ্গে মিলিত হইবে।'

শ্রীপুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডন (যুক্ত প্রদেশ ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার) আমেদাবাদ জন সভায় বলিয়াছিলেন, 'কংগ্রেস দেশ বিভাগ মানিয়া লইয়া ভুল করিয়াছে, উহা ১৯১৬ সালে সাম্প্রদায়িক নির্বাচন মানিয়া লওয়ার ফল'.....

-শরৎ চন্দ্র বসু লন্ডনে (২রা জানুয়ারী ১৯৪৮) জন সভায় বলিয়াছিলেন ......'উভয় দেশের মধ্যে মিলনের অথবা উভয় দেশের একই যুক্ত রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত হইবার সম্ভাবনা আছে।

কংগ্রেসের প্রখ্যাত নেতৃগণ বিভক্ত ভারতের পুনর্মিলন আশা যদি অন্তরে পোষণ করিতে পারেন, অখন্ড ভারতের সংগ্রামী নায়ক বীর সাভারকবের হিন্দু সাংগঠনিকদিগকে পুনর্মিলনে ব্রতী থাকিবার উৎসাহ দান ভাবাবেগ নহে। হিন্দু মুসলিম **বিভেদ সৃষ্টিকারী বিদেশী সরকার** ভারত ত্যাগ করিলেই এই সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া সাভারকর কংগ্রেসের মুসলিম তোষণ নীতির প্রতিবাদ করিয়াছেন। বিলম্বে হইলেও গান্ধীজী সাভারকরের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া (২৬শে মে, ১৯৪৭ সাল) নয়া দিল্লীর প্রার্থনান্তিক সভায় বলিয়াছিলেন, 'ইংরাজ চলিয়া

গেলে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবার মত বিজ্ঞতা আমাদের মধ্যে দেখা দিবে বলিয়াই আমি বিশ্বাস করিতে পারি।' খন্ডিত ভারতের একাংশে যদি উভয়ে বাস করিতে পারে অখন্ড ভারতে কেন পারিবে না?

বিপ্লবী বীর বাঘা যতীন বা যতীন্দ্র নাথ মুখার্জীর স্মৃতি সমিতির সম্পাদক বীর সাভারকরের নিকট বাণী চাহিয়া পত্র লিখিলে সাভারকর নিম্ন লিখিত পত্র প্রেরণ করেন (১৯৪৭, ৩রা সেপ্টেম্বর) "১৯১৫ সালে বালাসোরে ভারতের বীর বিপ্লবীগণ ক্যাপ্টেন যতীন মুখার্জীর নেতৃত্বে ব্রিটীশ শক্তিকে যে সশস্ত্র সংগ্রামের আহ্বান জানাইয়াছিলেন, তাঁহার স্মৃতি পালনের জন্য আপনারা যে আয়োজন করিয়াছেন আমি সর্বান্তকরণে তাহা সমর্থন করিতেছি। সেই বিশেষ সংগ্রামক্ষেত্রে নিহত বীর স্বদেশ প্রেমিকদের স্মৃতির প্রতি আমি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি; কারণ তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া প্রকৃত পক্ষে আমরা ভারতের বিপ্লব আন্দোলনের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিব। ভারতের বিপ্লবীগণ নির্ভীক চিত্ত এবং দুর্দমনীয় সাহসের উপর নির্ভর করিয়া ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে যে সশস্ত্র প্রতিরোধ ব্যবস্থা চালাইয়াছেন তার ফলেই ভারত আজ স্বাধীনতার দ্বারদেশে আসিয়া উপনীত হইয়াছে, কিন্তু আমাদের এই কথা ভুলিলে চলিবে না যে স্বাধীনতা মহাসংগ্রামে আমরা কথঞ্চিৎ জয়ী হইলেও পূর্ণ বিজয়ের জন্য আমাদিগকে অবশ্যই শেষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইবে। স্বাধীনতার সেই শেষ সংগ্রামে জয়লাভ করিতে হইলে দেশের মুক্তি সংগ্রামে নিহত আমাদের শহীদ সৈনিক এবং সেনাধ্যক্ষদের অমর কার্য্যাবলী পর্যালোচনা করিতে এবং ইহা হইতে নব নব শক্তি এবং অনুপ্রেরণা গ্রহণ করিতে হইবে।

'বিপ্লববাদীগণ সর্বদাই ভিন্ন পথগামী স্বদেশ প্রেমিকদের সাহায্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত কিন্তু অহিংসা, কারাবরণ এবং আত্মবিসর্জনের নিকট নতি স্বীকার করিয়া ব্রিটীশশক্তি ভারতে শান্তিপূর্ণ এবং রক্তপাতহীন বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে বলিয়া এক শ্রেণীর লোক যে হীন প্রচার কার্য্য চালাইয়া থাকে, পরিষ্কার ও কঠোর ভাষায় তাহার প্রতিবাদ করা প্রয়োজন অন্যথায় জাতির মধ্যে কাপুরুষতা এবং ক্লীবত্ব দেখা দিবে।

১৯০১ সাল হইতে ১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত যদি ভারতের বিপ্লব আন্দোলনের একখানা মৌলিক ইতিহাস রচনা করা হয় এবং সব বিপ্লবী নায়কদের তিরোধানের পূর্বেই যদি রচনা করা হয় এবং সব বিপ্লবী নায়কদের তিরোধানের পূর্বেই যদি তাহা সম্ভব হয় তাহা হইলে দেশকে উল্লিখিত **ক্ষতিকর প্রচারের হাত হইতে রক্ষা করা সম্ভব হইতে** পারে।

'আপনার স্মৃতিকমিটি যদি এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই বীর যতীনের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হইবে।

'আপনার পত্রে দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে, পূর্ণ অহিংসা নীতি কোন সদ্‌গুণত নহেই বরং ইহা মানুষের পক্ষে পাপ বিশেষ , কারণ ইহা **আত্মরক্ষার নীতি বিরুদ্ধ**।'.......

পৃথক নির্বাচন প্রথা এবং সংখ্যালঘুদের জন্য আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা বিলোপ করায় সাভারকর সর্দার প্যাটেলকে তার বার্তায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন, 'সাম্প্রদায়িক এবং

ধর্মের ভিত্তিতে নির্বাচন রদ করিয়া গণপরিষদ যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে তার জন্য অভিনন্দন জানাইতেছি, আশা করি শাসনকর্ত্তৃপক্ষ সাহসিকতার সহিত উহা বাস্তবে পরিণত করিবে।'

বর্তমান ভারত সরকার নির্যাতীত রাজ নৈতিক কর্মী দিগকে বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং কাহারো কাহারো বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফেরৎ দিয়াছেন। কিন্তু সাভারকর এই বৃত্তি হইতে বঞ্চিত এবং তাঁহার সম্পত্তিও ফেরৎ দেওয়া হয় নাই। সরকারী নথি পত্রে জানা যায় **ভাগুর** গ্রামে সাভারকরের দুইটি বাড়ী ছিল, তাহার মূল্য ২৮ হাজার টাকা। বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভায় আর , এস্. মন্ডলীকরের এক প্রশ্নোত্তরে তৎকালীন স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রীমোরারজী দেশাই বলেন, সাভারকরের অতীত দেশসেবা অপেক্ষা বর্তমান কায্যকলাপ অধিক হানী কর।

এই হীন উক্তির প্রতিবাদ করিয়া স্বনামখ্যাত শ্রী পি, আর, দাস এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, বীর সাভারকর যদি দেশের কোন ক্ষতিকর কার্যে লিপ্ত থাকিতেন তাহা হইলে তিনি কখনো স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া গান্ধীজী হত্যা মামলায় সাভারকরের পক্ষ সমর্থন করিতেন না।

'সুজন সুরব করে কুরব ঢাকিয়া।
কুজন কুরব করে সুরব নাশিয়া।।'

২২শে নভেম্বর ১৯৫৭, লোক সভায় রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ একটি বিল উত্থাপন করেন যে, বীর সাভারকর, বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, ডাঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা) কে দেশ সেবার স্বীকৃতির জন্য **মাসে পাঁচশত টাকা** করিয়া বৃত্তি দেওয়া হউক। আইন মন্ত্রী শ্রীঅশোকসেন এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী বি, এন, দাতার উক্ত প্রস্তাব উত্থাপনে আপত্তি জানান। স্পীকার মৌখিক ভোটে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলে বিরোধী সদস্যগণ শেম শেম ধ্বনিতে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন।

১৩৬০ সনের ১লা জৈষ্ঠ শুক্রবার যুগান্তর পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ, খাজা ইসমাইল সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু এবং সশরীরে ঈশ্বর বলিয়া বিবেচিত **আগা খাঁকে প্রতি বৎসর ১২ হাজার টাকা বৃত্তি** দেওয়া হয়। তাঁহার পিতামহ ১৮৪৪ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে **'লাভজনক' সহায়তা** করিয়া ছিলেন বলিয়া পুরুষপরম্পরায় এই বৃত্তি দেওয়া হয়। পরিশেষে একটি জিজ্ঞাসার চিহ্নও উক্ত পত্রিকায় মুদ্রিত হয় - 'ব্রিটীশ ভারতের সব কিছুকেই চোখ বুজিয়া অনুসরণের **এই দৈন্য** কি আমাদের কমনওয়েলথী গাঁট ছড়ায় আবদ্ধ থাকিবার ফল না অহেতুক তাঁবেদারীর পরিণাম?'

মহাভারতের উপেক্ষিত বীর কর্ণ এবং বর্তমান ভারতের নির্যাতীত বীর সাভারকর উভয়েই শৌর্য বীর্য ত্যাগমন্ডিত চরিত্র মাধুর্যের সমপর্যায় ভুক্ত। সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, অব্যক্ত চরিত্রবল, অপূর্ব কর্তব্যনিষ্ঠা এবং অকৃত্রিম দেশপ্রেমে উদুদ্ধ পুরুষকারের মূর্ত প্রতীক এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ মানব জাতির গৌরব। কৌরব সভায় দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ কালিন আচরণ মহাভারতের বীর কর্ণ চরিত্রে এক দুরপনেয় কলঙ্ক, কিন্তু বর্তমান ভারতের বীর সাভারকর চরিত্র কলঙ্ক মুক্ত।

বীর কর্ণ তৎকালে শূর কুলে প্রতিপদে লাঞ্ছিত ও উপেক্ষিত হইয়াও মূহর্তের জন্য ভীরুতা বা লিপ্সার নিকট আত্মবলি না দিয়া পুরুষকারেরই শ্রেষ্ট পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। নির্যাতন নিপীড়ন সহনশীলতার মূর্ত প্রতীক স্বাতন্ত্র্য বীর সাভারকর মুক্তিলাভের পর সভাপতির সুসজ্জিত রথ, সুউচ্চ বক্তৃতা মঞ্চ, বৃহৎ অক্ষরে সংবাদ পত্রের প্রচার প্রভৃতিতে প্রলুব্ধ না হইয়া তিরস্কৃত, উপেক্ষিত পথই বাছিয়া লইলেন এবং সাম্প্রদায়িক দাবীদারের নিকট তোষামোদের দ্বারী মস্তক অবনত না করিয়া সিংহবিক্রমে স্বদেশীয়গণের হৃদয়ে পৌরুষের ভাব জাগ্রত করিতে সচেষ্ট হইলেন। বীর কর্ণ এবং বীর সাভারকর পুরুষকারের আদর্শ পুজারী হইলেও নিয়তি তাঁহাদের প্রতি সুপ্রসন্ন নহেন। নির্মম নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে সাভারকর গান্ধী হত্যাকান্ডে র তীব্র নিন্দা করিয়া বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন 'গান্ধীজীকে অমানুষিক ভাবে হত্যা করিবার নিন্দা করিয়া এবং হিন্দু মহাসভার নীতি ব্যাখ্যা করিয়া মহাসভার সভাপতি এবং কার্য্যকরি সমিতির কয়েকজন সদস্য যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা সময়োচিত হইয়াছে আমি নিজেও এই নিন্দনীয় কার্যের তীব্র নিন্দা করি। সকলের স্মরণ রাখা উচিত যে, এই আত্মঘাতী নীতি মারাত্মক হইবে।'

গান্ধীজীর হত্যা সম্পর্কে অভিযুক্ত নাথুরামগডসে, বীর বিনায়ক রাও দামোদর সাভারকর এবং অপর ৬ জন আসামীর বিচার লাল কেল্লায় বিচা রপতি শ্রীআত্মাচরণের বিশেষ আদালতে ১৯৪৮ সালের ২২শে জুন, সকাল ১০ টায় আরম্ভ হয়। সরকারী কৌসুলী শ্রীদপ্তরী অভিযোগবলী বিশ্লেষণ করেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষ সমর্থ করেন শ্রীলক্ষ্মণ রাও বলবন্ত ভোপৎকরা। তিনি বীর সাভারকরের পক্ষও সমর্থন করেন।

সাভারকর ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১০৯ ধারা সহ ৩০২ ধারা অনুযায়ী দণ্ডার্হ এবং উক্ত আদালতের বিচারধীন বলিয়া অভিযুক্ত হইলেন। সাভারকর নির্দোষবোধে বিচারের দাবী জ্ঞাপন করেন।

শ্রী দপ্তরী সাভারকর প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি দীর্ঘকাল হিন্দুমহাসভার সভাপতি রূপে এবং স্বকীয় প্রতিভার জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন বটে কিন্তু অহিংস নীতির কিম্বা মুসলিম প্রীতির প্রতি তাঁহার আদৌ **সমর্থন নাই**। বোম্বাই অবস্থানকালে নাথুরাম গডসে ও আপ্তর সঙ্গে তাঁহার বিশেষ সংযোগ ছিল এবং তাঁহাকে তাহার **গুরুপদে** বরণ করিয়াছিলেন।

১৯৪৮ সালের ২০শে নভেম্বর লালকেল্লায় বিশ্বের বর্ষীয়ন বিপ্লবী স্বাতন্ত্র্য বীর সাভারকর ৫৭ পৃষ্ঠাব্যাপী লিখিত বিবৃতি পাঠ করেন। উক্ত বিবৃতি পাঠ করিতে তাঁহার প্রায় দুই ঘণ্টা ২০ মিনিট সময় লাগে এবং পাঠকালে আদলতে পূর্ণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে ছিল; ভারত বিভাগের বিষয় উল্লেখ কালে তিনি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। ফরীয়াদী পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণের কথা উল্লেখ করিয়া সাভারকর বলেন যে, ফৌজদারী মামলার সাক্ষ্য প্রমাণের যে মাপকাঠি আছে আদেশানুসারে বিচার করিলে দেখা যাইবে, আমার বিরুদ্ধে আনিত কোন অভিযোগই ফরয়াদী পক্ষ প্রমাণ করিতে সমর্থ হয় নাই। **আমার বিরুদ্ধে কেবলমাত্র সন্দেহ ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া অভিযোগ আনা হইয়াছে।** গান্ধীজী ও পণ্ডিতজীর আদর্শ ও কার্য্য পদ্ধতির বর্ণনা প্রসঙ্গে সাভারকর বলেন যে, আমাদের মধ্যে নীতিগত বা

কার্য্যতঃ পার্থক্য কিছু থাকিলেও আমরা কখনো তাহা ব্যক্তিগত বিদ্বেষে পরিণত হইতে দেই নাই। ১৯০৮ সালে গান্ধীজী যখন লন্ডনে সুবিখ্যাত পন্ডিত শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মার সত্বাধীনে ও আমার পরিচালনায় ইন্ডিয়া হাউসে বাস করেন, তখন গান্ধীজী ও আমি এক সঙ্গে বন্ধুরূপে বাস করিয়া সহকর্মীরূপে কাজ করিতাম , পরে গান্ধীজী যখন সস্ত্রীক আমার ও আমার পরিবার বর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমাদের পুরাতন সম্পর্ক ও বর্ত্তমান রাজনীতি আলোচনা করেন ....সেই সুন্দর অতীতের কথা আমি বলিব না। 'ইয়ং ইন্ডিয়ায়' আমার সম্পর্কে গান্ধীজী যে সহৃদয় মন্তব্য লিখিতেন তাহারও উল্লেখ করিয়া আমি আদালতের সময় নষ্ট করিব না। এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কোন কোন বিষয়ে তাঁহার আদর্শের সহিত আমার মৌলিক মতভেদ থাকিলেও অন্যান্য বিষয়ে আমাদের মতের মধ্যে সৌসাদৃশ্য থাকায় উভয়ের মধ্যে সর্বদায়ই একটা শ্রদ্ধা ও ব্যক্তিগত শুভেচ্ছার সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। 'সাভারকর সদন' নামক তাঁহার বাসভবনে এবং তাহাতে যাঁহারা বাস করেন তাঁহাদের পরিচয় দিয়া সাভারকর বলেন - ফরিয়াদী পক্ষের প্রচ্ছন্ন অভিযোগের বিষয় উল্লেখ করিয়া এখানে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, একসময়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের এবং বিদেশের সহস্র সহস্র লোক সাভারকর সদন দেখিতে আসিতেন। রাজা, মহারাজা, কৃষক, সনাতনী, সমাজতন্ত্রী, হিন্দু মহাসভাপন্থী কংগ্রেসী প্রভৃতি বিভিন্ন দলের সর্বভারতীয় নেতৃগণ হইতে আরম্ভ করিয়া স্কুল-কলেজের যুবকগণ সকলেই এখানে আসিতেন। আমেরিকা, রাশিয়া, আফ্রিকা এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাংবাদিক ও খ্যাতনামা রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকগণ সাভারকর সদনে আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিতেন।

উক্ত মামলার সঙ্গে হিন্দুমহাসভার সম্পর্ক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সাভারকর বলেন, লালা লাজপত রায় ও পন্ডিত মদন মোহন মালব্য প্রমুখ কংগ্রেস নায়কগণই হিন্দু মহাসভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। হিন্দু সংগঠন এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে হিন্দুদিগকে সুসংহত এবং সামরিকশিক্ষাদান হিন্দুমহাসভার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। হিন্দুমহাসভার এই আদর্শ যে, ভারত মূলত একটি ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হইবে এবং এমনভাবে গঠিত হইবে যে, ধর্ম জাতি ও শ্রেণী নির্বিশেষে প্রত্যেক অনুগত নাগরিকের সমান অধিকার ও সমান কর্তব্য বোধ থাকিবে, কিন্তু সভা ইহা বরদাস্ত করিতে অসম্মত হয় যে, কেবলমাত্র মুসলমান বলিয়াই ঐ সম্প্রদায়ের লোকদিগকে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্যের অনেক অধিক দেওয়া হবে অন্যথায় তাহারা অনুগত নাগরিকের ন্যায় চলিবে না; আর মুসলমানদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য হিন্দুদিগকে ন্যায্য প্রাপ্য ও অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া মুসলমানদিগকে তাহা দিতে হইবে। মহাসভার কায্যকলাপ উচ্চাঙ্গের দেশ হিতৈষণা, জনস্বার্থ এবং ন্যায় ও সঙ্গত কার্য্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আমার সঙ্গে এই ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত সংস্রবকে ফরীয়াদীপক্ষ যদি এই মামলায় আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ সাব্যস্ত করিতে চান তাহা অত্যন্ত অদ্ভুত অন্যায় অসঙ্গত ও অবৈধ হইবে। নাথুরাম গডসে এবং আপ্তের সঙ্গে কায্যপোলক্ষেই আমি পরিচিত হই। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে গোপাল গডসে, শঙ্কর, মদনলাল প্রভৃতির নামও আমি পূর্বে শুনি নাই। হিন্দু সংগঠনে কার্যে ছোট বড় সহস্র লোক আমার সঙ্গে সহযোগিতা করিয়াছেন। গডসে ও আপ্তে তাহাদেরই দুই জন। অপরাপর নেতা ও কর্মীর মতই তাহারাও আমাকে

অনুরাগ ও শ্রদ্ধা দেখাইতেন। অতঃপর সাভারকর সরকার পক্ষের উত্থাপিত সাক্ষ্য প্রমাণাদি বিশ্লেষণ করিয়া বলেন আমার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ ভিত্তিহীন এবং সরকার পক্ষ কোন নির্ভর যোগ্য তথ্য প্রমাণ করিতে পারেন নাই। এমন কি পুলিশ আমার গৃহ হইতে যে দশ হাজার পত্র উদ্ধার করিয়াছে তাহা তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করা সত্ত্বেও আমার বিরুদ্ধে যাইতে পারে এমন একটি শব্দ বা লাইনও পাওয়া যায় নাই। এই সত্য এবং ইহার সমতুল্য অন্যান্য বিষয়ও আমার নির্দোষিতার অকাট্য প্রমাণ।

বীর সাভারকর বলেন, বহু অপরাধীই ধর্মগুরু ও তাঁহার অনুশাসনের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান বলিয়া অনুগামীর অপরাধের সহিত গুরুকে জড়িত করা হয় না। অনেক অপরাধই পিতামাতা-স্বজনগণের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা থাকে, আনুগত্য প্রকাশ করিয়া পত্রাদিও দেয় তার জন্য ইহা কি ধরিয়া লওয়া হয় যে অপরাধীরা অপরাধ অনুষ্ঠানে আত্মীয় স্বজনগণের সহিত পরামর্শ করিয়াছে? অথবা কোন রাজনৈতিক নেতার অসংখ্য অনুগামীদের মধ্যে যদি কেহ কোন অন্যায় অপরাধ করে এবং কোন না কোন সময়ে কোন না কোন প্রকারে নেতাকে সন্মান করিয়া থাকে তবে রাজনৈতিক নেতাকেই কি পুলিশের নিকট প্রতিভূ ও কৈফিয়ৎ ভাজন হইতে হয়? প্রসঙ্গত ১৯৪২ এর আন্দোলনের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া সাভারকর বলেন, জনতা গান্ধীজীর নামে জয়ধ্বনী করিয়া অগ্নি সংযোগ, ধ্বংস মূলক কার্য্য ও রক্তপাত করিয়াছিল বলিয়া ব্রিটীশ সরকার ও গান্ধীজীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান নাই।

বীর সাভারকর তাঁহার বিবৃতিতে কেন্দ্রীয় সরকার সম্বন্ধে বলেন, রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রামে আমিও একজন সৈনিকরূপে গত ৫০ বৎসর যাবৎ বর্ত্তমান কালের যে কোন দেশভক্ত নেতার মতই দুঃখ ও ত্যাগ স্বীকার করি। আমাদের সাধনা বহুল অংশে পূর্ণ হইলেও একটা অংশ এখনো অসিদ্ধ রহিয়া গিয়াছে এবং আমরা আমাদের মাতৃভূমিকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করিবার অভিলাষ এখনো পরিত্যাগ করি নাই। এই অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য যাহা পাইয়াছি তাহাকে সুসংগঠিত করা একান্ত আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে আমি জনসাধারনের এই ধারণা বদ্ধমূল করিবার চেষ্টা করিব যে, যে দলই কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃত্ব করুন না কেন সর্বাগ্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিশালী করিতে হইবে। ঐ নেতৃত্ব পরিবর্তন যতই বাঞ্ছনীয় হউক না কেন নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই তাহা নিষ্পন্ন করা কর্তব্য; কারণ আমাদের মধ্যে যদি কোন বল প্রয়োগ মূলক কায্য কলাপ বা গৃহযুদ্ধ বাধে তবে রাষ্ট্র বিপন্ন হইবে। কোন বৈদেশিক শাসন ও সশস্ত্র নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বৈপ্লবিক মনোবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী ও সমর্থন যোগ্য হইলেও আমাদের রাষ্ট্রকে বিপজ্জনক দলগত দ্বন্দ্ব ও গৃহযুদ্ধ হইতে রক্ষা করিতে হইলে অবিলম্বে ঐ বৈপ্লবিক মনোবৃত্তিকে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই নিয়ন্ত্রিত করা একান্ত আবশ্যক।

ধর্মাধিকরণ–বঞ্চিত ব্যারীষ্টার সাভারকর তাঁহার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ বিভিন্ন ধারা উপধারায় বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগগুলি বিশেষরূপে প্রণিধান যোগ্য ঃ

১) ষড়যন্ত্রের অভিযোগ অথবা ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে অনুষ্ঠিত কার্য্য কলাপের সহিত তাঁহার সংস্রবের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই।

২) তাঁহার নিকট বা তাঁহার কর্তৃত্বে কোন অস্ত্র শস্ত্র বা বিস্ফোরক দ্রব্য অথবা অনুরূপ আপত্তিকর কিছু পাওয়া যায় নাই।

৩) তাঁহার নিকট গত দশ বৎসরের প্রায় হাজার দশেক চিঠি পত্রের মধ্যে আপত্তিকর কিছুই পাওয়া যায় নাই।

৪) তাঁহার বিরুদ্ধে সমগ্র মামলা রাজসাক্ষীর অসমর্থিত শোনা কথার উপর প্রতিষ্ঠিত।

৫) গান্ধীজী ও নেহেরু তাঁহার কতখানি শ্রদ্ধা ভাজন সংবাদ পত্রে প্রকাশিত বিবৃতিগুলিতে ব্যক্ত হইয়াছে।

বীর সাভারকর উপসংহারে দৃঢ়তা ব্যঞ্জক কণ্ঠে বলেন, 'আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। আমার বিরুদ্ধে যে সকল অপরাধের অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার কোনটাই আমি করি নাই এবং তাহা করিবার কোন কারণও ছিল না। এই হেতু আমার চরিত্রের উপর বিন্দুমাত্র দোষরোপ না করিয়া উপরোক্ত কারণে অবিলম্বে আমাকে মুক্তির আদেশ দেওয়া হউক।'

১৯৪৮ সালের ১৮ই ডিসেম্বর পাটনা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রী পি, আর দাশ বীর সাভারকরের পক্ষ হইয়া সওয়াল আরম্ভ করেন এবং ২৮শে ডিসেম্বর সওয়াল সমাপ্ত করেন।

সংক্ষেপে শ্রীযুক্ত দাসের সওয়াল ঃ-

শ্রীযুক্ত দাস বলেন যে, আদালত দুইটি প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়াছেন, প্রথমতঃ বিচার করিতে হইবে যে, সত্যিকারের কোন ষড়যন্ত্র ছিল কিনা, দ্বিতীয়তঃ উহা যদি থাকে তবে বীর সাভারকর উহাতে লিপ্ত ছিলেন কিনা।

তিনি বলেন যে, সরকার পক্ষ হইতে পরিষ্কার ভাবেই অভিযোগ করা হইয়াছে যে, গান্ধী হত্যার ষড়যন্ত্র করা হইয়াছিল। বলা হইয়াছে যে, ২০ শে জানুয়ারীতে মেরিনা হোটেলে ৪০নং কক্ষে ষড়যন্ত্র করা হয়। ঐ দিনই প্রার্থনা সভায় গান্ধীজীকে হত্যা করিবার চূড়ান্ত ব্যবস্থা করা হয়, রাজসাক্ষীর সাক্ষ্যের দ্বারা সরকার পক্ষের উক্ত অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া দেখান হইয়াছে। আসামী পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে গান্ধীজীকে হত্যা করিবার কোন ষড়যন্ত্রের প্রয়োজন ছিল না; আর যদি আদৌ ইহাকে ষড়যন্ত্রই আখ্যা দেওয়া হয় তবে ২০শে জানুয়ারী প্রার্থনা সভায় বিক্ষোভ প্রদর্শনের ষড়যন্ত্র উহাকে বলা চলিতে পারে। হত্যাকাণ্ড ঘটে ৩০শে জানুয়ারী, অতএব উহা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নহে, ষড়যন্ত্রের ফলে উহা হয় নাই।

এতএব সরকার পক্ষের সাক্ষ্য ষড়যন্ত্রের অভিযোগের সহিত শুধু সামঞ্জস্যহীন কিনা অথবা উহা দ্বারা সাম্প্রতিক ঘটনাবলীও সমর্থিত হইয়াছে, মাননীয় বিচারপতিকে উহা পরীক্ষা করিতে হইবে।

২০শে জানুয়ারী মেরিনা হোটেলে কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে কোন চুক্তি হয় নাই—এই সম্পর্কে সরকার পক্ষের সাক্ষ্য ও আসামী পক্ষের মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য রহিয়াছে। রাজসাক্ষীর সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে, ২০শে জানুয়ারী সন্ধ্যায় গান্ধীজীকে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করা হয়। ইহাও বলা হইয়াছে যে, ২০শে জানুয়ারী মেরিনা হোটেলে ঐ

সম্পর্কে পাকাপাকি বন্দোবস্ত হয়। ষড়যন্ত্রকারীগণ নিজেদের মধ্যে অস্ত্র বন্টন করে। রাজসাক্ষী ইহাও বলিয়াছেন যে, তাহাদের মধ্যে পাঁচজন প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিলেন, তাঁহাদের কাহারো কাহারো রিভলবার ছিল, অন্য কয়েক জনের নিকট হাত বোমা ছিল, প্রার্থনা সভায় ৭ জন হত্যার দৃঢ় সংকল্প লইয়া উপস্থিত ছিলেন। ২০শে জানুয়ারী যদি তাঁহাদের গান্ধীজীকে হত্যা করিবার ইচ্ছা থাকিত তবে ৩০শে জানুয়ারীর পরিবর্তে ২০শে জানুয়ারী তাঁহারা অনেক সহজেই উহা করিতে পারিতেন, কিন্তু ২০শে জানুয়ারী কিছুই ঘটে নাই। সত্য সত্যই যাহা ঘটে তাহা হইতেছে এই যে, দূরে একটা বোমা বিস্ফোরণ হয় এবং উহার ফলে কোটিপতি বিড়লার মাত্র ২০ টাকা ক্ষতি হয়।

২০শে জানুয়ারীতে যখন তাঁহাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কাহারো মনে কোনরূপ সন্দেহ ছিল না, তখন ষড়যন্ত্র থাকিলে সাতজন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ লোক কেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল করিতে পারে নাই, ইহার কোন যুক্তি প্রদর্শন করা যায় না। বোমা বিস্ফোরণের ফলে পুলিশ সাবধান হইবার পর ৩০শে জানুয়ারীতে যে হত্যাকাণ্ড হইল তাহার পশ্চাতে ষড়যন্ত্র ছিল বলিয়া মনে হয় না। শ্রীযুক্ত দাস বলেন যে, সুতরাং ২০শে জানুয়ারীর প্রকৃত ঘটনার দ্বারা সরকার পক্ষের যুক্তি মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে।

ইহা ব্যতীত এমন কী সরকার পক্ষের সাক্ষীরাও ৩০শে জানুয়ারীতে ষড়যন্ত্রের কোন কথা বলেন নাই। **রাজসাক্ষী বাদগে** তাঁহার জবানবন্দীতে বলিয়াছেন যে, ২০শে জানুয়ারী সন্ধ্যায় তিনি হিন্দুমহাসভা ভবনে প্রত্যাবর্তন করিলে আপ্তে এবং গডসেও পরে তথায় গমন করেন। অতঃপর কি ঘটিয়াছিল, বাদগেকে তাহা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনিই কিছুই বলেন নাই।

শ্রীযুক্ত দাস বলেন যে, ২০শে জানুয়ারীর ঘটনার পর তাঁহাদের সাক্ষাৎকারের কোন আভাস পাওয়া যায় নাই। সুতরাং গান্ধীজীকে হত্যার পশ্চাতে ষড়যন্ত্র ছিল বলিয়া বাদগে যাহা জানাইয়াছেন, তাহা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি বলেন যে, আসামীর অপরাধ সরকার পক্ষ প্রমাণ না করিলে, আসামীর নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার এই যুক্তির সমর্থনে শ্রীযুক্ত দাস ১৮৯০ সালের ইংলিশ জুরীর সিদ্ধান্ত ও অপেক্ষাকৃত অল্প দিন পূর্বের এলাহাবাদ হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চের সিদ্ধান্তের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন যে, সরকার পক্ষ আসামীর বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণ করিতে না পারিলে আসামীর নিজেকে নিজ অপরাধ প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই এবং আসামী মুক্তি পাইবার **যোগ্য**।

শ্রীযুক্ত দাস বলেন যে, সাভারকরের সহিত আলোচনার ব্যাপারে আপ্তে ও **কারকারে বাদগেকে** তাহাদের মধ্যকার সকল কথা বলেন নাই। সুতরাং বীর সাভারকর ষড়যন্ত্রের সহিত জড়িত ছিলেন বলিয়া বাদগে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা **বিশ্বাস্য** নয়। ১৭ই জানুয়ারী গডসে ও আপ্তের সাভারকর সদনে গমন সম্পর্কে শ্রীযুক্ত দাস বলেন যে, বাদগেকে নীচের তলায় বসাইয়া রাখা হইয়াছিল, সুতরাং আপ্তে ও গডসে এবং সাভারকরের মধ্যে যে আদান প্রদান হয় সে সম্পর্কে বাদগে যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

২০শে জানুয়ারী মেরিণা হোটেলের ৪০নং ঘরে আসামীদের মিলনের কথা উল্লেখ

করিয়া শ্রীযুক্ত দাস বলেন যে, রাজসাক্ষী যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে ঐ দিন সন্ধ্যায় গান্ধীজীকে হত্যার মোটামোটি ষড়যন্ত্র ঠিক হয়। ইহা প্রাণের জন্য পরিপ্রেক্ষিত সাক্ষ্যের প্রয়োজন ছিল না। প্রত্যক্ষ সাক্ষীই ছিল। রাজসাক্ষী বলিয়াছেন যে, ১৫ই জানুয়ারী দীক্ষিত মহারাজের বাড়ীতে আপ্তে তাঁহার নিকট এই ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই ষড়যন্ত্র ছিল ২০শে জানুয়ারী গান্ধীজীকে হত্যা করা। রাজসাক্ষী আরো বলিয়াছেন যে, ২০শে জানুয়ারী অপরাহ্নে তাহারা মেরিণা হোটেলে সমবেত হইলে নাথুরাম গডসে তাঁহাকে বলেন, 'বাদগে ইহাই আমাদের শেষ চেষ্টা। দেখিও কাজটি যেন সুসম্পন্ন হয়।' রাজসাক্ষী আরো বলিয়াছেন যে, মদনলাল ও কারকারে তখন তথা হইতে বিড়লা ভবনে যান। আপ্তে, গোপাল, শঙ্কর ও রাজসাক্ষী ১৫/২০ মিনিট পরে সেই স্থান ত্যাগ করেন। যখন তাহারা সেই স্থান ত্যাগ করেন যে, তিনিও ১৫/২০ মিনিটের মধ্যে তাহাদের অনুসরণ করিবেন। শ্রীযুক্ত দাস বলেন যে রাজসাক্ষীর উক্তি অনুসারে প্রত্যেক ষড়যন্ত্রকারীকে নির্দিষ্ট কাজের ভার দেওয়া হয়। পোষাক বদলানো হয় এবং ছদ্মনাম গ্রহণ করা হয়, কিন্তু সাক্ষ্যের এই অংশের কোন সমর্থন নাই। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ হইলে সমর্থন থাকিত, কিন্তু কিছুই ঘটে নাই এবং কেহই ইঙ্গিত করে নাই যে, আর একটি ষড়যন্ত্র হইয়াছিল এবং এমন ইঙ্গিতও কোথাও নাই যে, ৩০শে জানুয়ারী গান্ধীজীর হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত এই ষড়যন্ত্র চলিয়াছিল। গান্ধী হত্যা নিতান্তই কোন এক ব্যক্তির কাজ।

শ্রীযুক্ত দাস বিড়লা ভবনের ৪জন সাক্ষী সুলোচনা, ছোট্টরাম, ভুরসিং এবং সুজিৎ সিংহের সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে, ৪জন সাক্ষীর সাক্ষ্যই অসঙ্গতিতে ভরা। সুতরাং ২০শে জানুয়ারী গান্ধীজীকে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করা হইয়াছিল বলিয়া ফরিয়াদী পক্ষ হইতে যে মামলা আনিত হইয়াছে তাহা একেবারেই অযৌক্তিক প্রতিপন্ন হইতেছে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত দাস অধ্যাপক জৈন, বোম্বাইয়ের স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রীমোরাজী দেশাই এবং বোম্বাইয়ের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার শ্রীনাগরওয়ালার সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে, রাজসাক্ষী যে ষড়যন্ত্রের কথা অধ্যাপক জৈনকে বলিয়াছেন ২০শে জানুয়ারী সন্ধ্যায় তাহার শেষ হইয়াছে। ২০শে জানুয়ারী সত্যই যাহা ঘটিয়াছিল তাহাতে আসামীপক্ষের যুক্তিই সমর্থিত হয় এবং ফরিয়াদীপক্ষের যুক্তি খণ্ডিত হয়।

বীর সাভারকর ষড়যন্ত্রকারী কিনা এই প্রশ্নের সওয়াল করিয়া শ্রীযুক্তদাস বলেন যে, বীরসাভারকর একজন বিশিষ্ট ব্যারিষ্টার ও সারাজীবন দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াছেন। তিনি ৬ বৎসর হিন্দুমহাসভার সভাপতি ছিলেন এবং নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টরেট ডিগ্রী পাইয়াছেন। তাঁহার মত পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি নাথুরাম ও আপ্তের মত লোকের সহিত এইরূপে ষড়যন্ত্র করিতে পারেন কি না তাহা বিচারপতিই বিবেচনা করিবেন। গান্ধীজীর প্রতি তাঁহার কোন বিরাগ ছিল এমন কোন সাক্ষ্য নাই।

বীর সাভারকরের বিবৃতি হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীযুক্ত দাস বলেন যে,

১৯৪৪ সাল পর্য্যন্ত যে ব্যক্তি এইরূপ উচ্চ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন তিনি কখনো বলিতে পারেন না যে গান্ধীজীর শতবর্ষ শেষ হইয়াছে।

সাভারকর সদন তল্লাসী করিয়া ১৪০টি ফাইল এবং ১০ সহস্র পত্র উদ্ধার করা হয়। কোন একটি পত্রে সামান্য একটু ইঙ্গিতও নাই যে, সাভারকর গান্ধীজীর মৃত্যু কামনা করিতেন অথবা তাঁহার হত্যার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন।

১৯৪৭ সালে আপ্তে অথবা গডসের সহিত তাঁহার কোন পত্রালাপ হয় নাই। তবে এই চিঠিগুলি আদালতে উত্থাপন করা হইয়াছে কেন, ফরিয়াদী পক্ষ বলিয়াছেন যে, সাভারকর ও গডসে আপ্তের মধ্যে যোগাযোগ প্রমাণের জন্য উহ্য করা হইয়াছে। ১৯৪৬ পর্য্যন্ত তাঁহাদের মধ্যে যে যোগাযোগ ছিল তাহা অবান্তর। নাথুরাম ও আপ্তে হিন্দুমহাসভার কর্মী ছিলেন এবং সাভারকর ছিলেন সভাপতি। কাজেই তাহাদের মধ্যে যোগাযোগ থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু সাভারকর রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণের পর আর তাঁহাদের মধ্যে কোন যোগাযোগ ছিল না।

অতঃপর শ্রীযুক্ত দাস রাজসাক্ষী বাদগের সাক্ষ্য লইয়া আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, বাদগের সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে, স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে সাভারকর নেহেরু সরকারের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য উৎসুক ছিলেন এবং ডঃ শ্যামাপ্রসাদকে মন্ত্রীসভায় যোগদানের অনুমতি দেন। নাথুরাম ও আপ্তে ছিলেন স্বাধীনচেতা লোক। তাহারা হিন্দুমহাসভা অথবা সাভারকরের সমালোচনা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, নাথুরাম ও আপ্তে সাভারকররে হাতের পুতুল ছিলেন না। বাদগের উপরোক্ত উক্তির ভিত্তিতেই আদালত বীর সাভারকরের বিচার করিবেন।

১৪ই জানুয়ারী নাথুরাম ও আপ্তের, সাভারকর সদনে গমন সম্পর্কে শ্রীযুক্ত দাস বলেন যে, বাদগে বলিয়াছেন, বাদগেকে বাহিরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া নাথুরাম ও আপ্তে সাভারকর সদনে প্রবেশ করেন এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই উক্তি সত্য হইলে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, নাথুরাম ও আপ্তে ১৪ই জানুয়ারী সাভারকর সদন দর্শন করেন কিন্তু তাহারা যে বীর সাভারকরের সহিত অলোচনা করিয়াছিলেন এমন কোন প্রমাণ নাই। উক্ত গৃহে আরো বহু লোক বাস করে। তাহাদের কাহারও সহিত নাথুরাম ও আপ্তে হয়ত সাক্ষাৎ করিয়া থাকিবেন। নাথুরাম ও আপ্তে সাভারকর সদনে গমনের কথা অস্বীকার করিয়াছেন এবং উক্ত গল্পের কোন সমর্থনও নাই।

বাদগে বলিয়াছেন যে, ১৫ই জানুয়ারী তিনি আপ্তে ও গডসে যখন দীক্ষিত মহারাজের গৃহ-প্রাঙ্গণে আসেন তখন আপ্তে তাহাকে প্রশ্ন করেন যে, তিনি দিল্লী যাইতে রাজী আছেন কি না? আপ্তে তাহাকে বলেন যে, সাভারকর গান্ধী, সুরাবর্দ্দী ও নেহেরুকে খতম করিতে চান এবং এই কাজের ভার তাহাদের উপর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই কাহিনী কি বিশ্বাস্য? নাথুরাম ও আপ্তে জানিতেন যে, বাদগে বেআইনী অস্ত্রশস্ত্রের কারবার করেন। বাদগের সহিত তাহাদের সম্পর্কের সূত্র একমাত্র ব্যবসা, নাথুরামের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতার কোন প্রমাণ নাই। সাক্ষ্যে প্রমাণ তাহারা বাদগেকে বিশ্বাস করিতেন না। তাহাদের পক্ষে ইহা বিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই যে, নিজের ব্যবসা সম্পর্কে অতি উৎসাহী বাদগে গান্ধী

হত্যার ব্যাপারে তাহাদের সহিত যোগ দিবে। ইহা কি বিশ্বাস্য যে, দীক্ষিত মহারাজের বাড়ীর প্রাঙ্গণে বাদগে তাহাকে গান্ধী হত্যার ব্যাপারে যোগ দিতে বলিয়াছিলেন? সাভারকর নাথুরাম ও আপ্তেকে যাহা বলিয়াছেন বলিয়া সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে তাহা গ্রহণযোগ্য নয়। ইহা গৃহীত হইলেও ইহার উপর গুরুত্ব দেওয়া যায় না। আপ্তে হয় ত বাদগেকে দলে টানিবার জন্য সাভারকরের নাম লইয়াছিল। এই ধরণের সাক্ষ্য গৃহীত হইলে কেহই নিরাপদ নন।

বাদগে তাহার সাক্ষ্যে বলিয়াছেন যে, আপ্তে ও তিনি সাভারকরের দর্শনলাভের জন্য একটি ট্যাক্‌সিতে করিয়া সাভারকর-সদনে গিয়াছিলেন। আপ্তে তাহাকে একতলায় অপেক্ষা করিতে বলিয়া গডসের সহিত উপরে উঠিয়া যান। ৫/১০ মিনিটের মধ্যে তাহারা ফিরিয়া আসেন। সাভারকর তাহাদের পিছনে পিছনে আসিয়া বলেন 'সফল কাম হইয়া ফিরিয়া আসিও।' ট্যাক্‌সিতে উঠিয়া আপ্তে বাদগেকে বলেন যে তাঁতিয়ারাও ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছেন যে, গান্ধীজীর শত বৎসর শেষ হইয়াছে এবং তাঁহাকে সাফল্যের সহিত খতম করা যাইবে।

উপরোক্ত উক্তি ট্যাক্‌সি ড্রাইভার সমর্থন করে নাই। গড়সে আপ্তে ও বীর সাভারকর স্বীকার করেন নাই যে ১৭ই জানুয়ারী তাহারা সাভারকর সদনে গিয়াছিলেন। ট্যাক্‌সি ড্রাইভার বলেন যে তাহারা পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরিয়া আসেন। শ্রীযুক্ত দাস বলেন যে, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই যে তাহারা ফিরিয়া আসেন একথা স্বভাবতই অবিশ্বাস্য। তাহারা সাভারকর সদনে গেলেও কি আলোচনা করিয়াছিলেন তাহাই প্রশ্ন। বাদগে বাহিরে ছিলেন। সম্ভবতঃ তাহারা হায়দ্রাবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ছিলেন। নিজেদের সংবাদপত্র সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়া ছিলেন। ১৯৪৭-৪৮ সালে আপ্তে ও গডসে কখনো সাভারকর সদনে গিয়াছেন এমন প্রমাণ নাই।

১৯৪৭-৪৮ সালে তাহাদের মধ্যে কোন পত্রালাপও হয় নাই। কাজেই ইহা কী বিশ্বাস্য যে তাহারা হঠাৎ সাভারকরের নিকট যাইয়া বলিবেন যে, তাহারা গান্ধীজীকে হত্যা করিতে যাইতেছেন এবং তাঁহার আর্শীবাদ প্রার্থী।

শ্রীযুক্ত দাস বলেন যে, রাজসাক্ষীর সাক্ষ্য সম্পূর্ণ বাতিল করা উচিত, শোনা কথার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

১৯৪৯ সালে ১০ই ফেব্রুয়ারী এক বৎসর ১১ দিন পর উক্ত মামলার রায় প্রকাশিত হয়। সরকার পক্ষ ১৪৩ জন সাক্ষী কাঠগড়ায় হাজির করান তাহাদের টাইপ করা বিবরণ লিখিতে ৬৯৬ পৃষ্ঠা ফুলস্ক্যাপ কাগজ প্রয়োজন হয়। সরকার পক্ষ হইতে ৩৫৪ খানি দলিল এবং আসামী পক্ষ হইতে ১১৮ খানি দলিল দাখিল করা হয়। ৮০ প্রকার প্রামাণ্য জিনিষও দাখিল করা হয়। বিচারকীয় মন্তব্য লিখিতে ২০৪ পৃষ্ঠা কাগজের প্রয়োজন হয়।

বীর সাভারকর নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় সসম্মানে মুক্তিলাভ করেন। নাথুরাম গডসে এবং নারায়ণ আপ্তে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। কারকারে, গোপাল গডসে, মদনলাল, শংকর, ডাঃ পারচুরে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন এবং **রাজসাক্ষী বাদগে অব্যাহতি পান।**

হিন্দুসাংগঠনিকগণ সাভারকরের মামলা পরিচালার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন। বাংলা হইতে প্রসিদ্ধ কৌশুলী জে, পি, মিত্র মহোদয় সাভারকরের মামলা পরিচালনায় সহায়তা করেন।

বলাবাহুল্য মাত্র যে, নেহেরু সরকার জাগতিক ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াও বীর চরিত্রে বিন্দুমাত্র কলঙ্ক আরোপ করিতে পারেন নাই। স্বদেশ জননী তাহার বীর সন্তানের বালক সদৃশ সুন্দর ললাটে বিজয় গৌরব টীকা পড়াইয়া দিলেন।

'দুঃখের পথে তোমার তুর্য বাজে
অরুণ বহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে
মৃত্যুর হউক লয়
তোমারি হউক জয়।'

বীর সাভারকরের মুক্তিলাভে তাঁহার অগনিত অনুগামী বিজয় উল্লাস অনুভব করেন। তাঁহার প্রত্যাবর্তন পথে বিভিন্ন ষ্টেশনে বিরাট জনতা বিবিধ পুষ্পমাল্যে সোৎসাহে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন বাণী প্রেরণ করেন।

সাভারকর মুক্তি লাভ করিলেও **দিল্লীতে তাঁহার প্রবেশ নিষিদ্ধ** করিয়া চীফ্ কমিশনার আদেশ জারি করেন। ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে **সতর্কতা** মূলক আটক আইন বলে গ্রেপ্তার করা হয় এবং **বেলগাঁও জেলে আবদ্ধ** রাখা হয়। ১৯৪৬ সালেই রোগক্রান্ত হইয়া সাভারকর রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক বৎসরের মধ্যে অথবা **পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন** অথবা **তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত** রাজনীতিতে কার্য্যকরী ভাবে অংশ গ্রহণ করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় ১৩ই জুলাই' ৫০ বোম্বাই হাইকোর্টের আদেশে **মুক্তি** লাভ করেন।

১৯৪৯ সালে কলিকাতায় অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে সাভারকর যোগদান করেন। ১৯৫৬ সালে লোকমান্য তিলকের জন্ম শতবার্ষিকীতে পুণায় এক জনসভায় শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও সাভারকর ভাষণ দেন। ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে বোম্বাই-এ একজনসভায় সর্বভারতীয় রাষ্ট্রীয় বর্ষপঞ্জিকা প্রচলন করিবার জন্য সাভারকর এক সারগর্ভ ভাষণ দেন। বলাবাহুল্য মাত্র যে বর্তমান ভারতে সর্বভারতীয় রাষ্ট্রীয় পঞ্জিকা প্রচলিত হইয়াছে। ১৯৫৬ সালে যোধপুরে 'সাভারকর নগরে' হিন্দু মহাসভার বার্ষিক অধিবেশনে সাভারকর প্রদৃপ্ত কণ্ঠে ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন, 'আমার বয়স বর্তমানে ৭৫ বৎসর, আমার স্বাস্থ্য দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। আমার বাসস্থানের অতি নিকটবর্তী কোন সভাসমিতিতেও যোগদান করিতে পারি না, কিন্তু বোম্বাই হইতে যোধপুরে আসিয়াছি তার কারণ হিন্দুরাষ্ট্র আজ এক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার সম্মুখীন। যে শ্রদ্ধা ও সম্মান আপনারা আমাকে দেখাইতেছেন তাহা হিন্দুর প্রতিই জানানো হইতেছে। আমি আর বেশীদিন বাঁচিয়া থাকিব না কিন্তু তখনই কী আপনাদের হৃদয়ের উচ্ছাস শুকাইয়া যাইবে? না, তাহা হইবে না বলিয়া আজও আপনারা হিন্দুত্বের পূজারীদের প্রতি এমনই ভালবাসা প্রদর্শন করেন। মহারাণা প্রতাপ সিংএর জীবদ্দশায় যত না সমর্থন পাইয়াছেন মৃত্যুর পর তাঁহার মতবাদের পূজারীর সংখ্যা অনেক বেশী হইয়াছে। উহা প্রতাপের চাইতে অনেক গুণ বেশী শক্তিশালী বস্তু। ***অনেকেই প্রতাপসিং এর মত ঘাসের রুটি খাইয়া আজ দিন কাটাইতেছেন, কিন্তু এই সংগ্রামের অবশ্যই জয়,

হইবে আমি আজ কেবল এই আশীর্বাদই করিতে আসিয়াছি। একনিষ্ঠার সহিত যাহারা এই গৈরিক পতাকা বহন করিতেছেন তাহারা যে কত বড় ত্যাগী ও বীর একদিন ইতিহাসই ঘোষণা করিবে। **আমাদের নানা বিষয়ে চিন্তা করিতে হইবে। গোয়া ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত না করিতে পারিলে , নাগা বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হইলে, কাহাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে? কাশ্মীর লইয়া ভারতের জয় পরাজয়ে কাহারা আনন্দিত বা দুঃখিত হইবে? পাকিস্থান ভারত আক্রমণ করিলে ব্যক্তি বিশেষের কথা ছাড়িয়া দিলে সমাজ হিসাবে কাহারা প্রতিরোধ করিবে? **যাহাদের রক্তে হিন্দুরক্ত প্রবাহিত তাহারাই হিন্দুস্থানের জয় পরাজয়ে আনন্দিত বা দুঃখিত হইবে।**

দ্বিতীয় কথা হইল, রাজনীতির হিন্দুকরণ এবং হিন্দুদের সামরিক করণের প্রয়োজন রহিয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, রাজ নীতির যে কোন আভ্যন্তরিক বা আন্তর্জাতিক সমস্যাকে হিন্দুদের হিত সাধনের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিতে হইবে। **ভারত বিশ্বজগতের প্রায় সমস্ত রাজ্যগুলিকে রাষ্ট্র হিসাবে মর্যাদা দিয়াছে, কিন্তু ইস্রাইল, যাহাকে রাশিয়া, চীন, ব্রহ্ম, আমেরিকা, ইংল্যান্ড্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাষ্ট্রগুলি স্বীকার করিয়া লইয়াছে;ভারত এখনো তাহাকে রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকার করে নাই। ইহার **কারণ ইস্রাইল মুসলমান বিরোধী রাষ্ট্র এবং নেহেরুজীর মনে মুসলমানদের প্রতি ভীতি মিশ্রিত এক বিচিত্র প্রেম বর্তমান।** **১৮৫৭ হইতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত যে সমস্ত বীর পুরুষেরা নিজেদের রক্ত দিয়া সংগ্রাম করিয়াছেন, তাঁহাদের পুণ্য প্রচেষ্টার ফলে দেশের তিন চতুর্থাংশ স্বাধীন হইয়াছে। স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে সামরিক শক্তির একান্ত প্রয়োজন। কেবল শান্তি এবং পঞ্চশীলের মহামন্ত্রে তাহা সম্ভব হইবে না। ভারতকে বিশ্বে কেহ শক্তিশালী রাষ্ট্র বলিয়া মনে করে না। আমরাই আমেরিকা এবং রাশিয়াকে বৃহৎ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র বলিয়া প্রশংসা করি। **বাস্তবিক পক্ষে জনসংখ্যা, পরিধি, ও সংস্কৃতির দিক হইতে ভারতই শ্রেষ্ঠ।** রাশিয়া একদিকে হাঙ্গেরীতে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছে এবং অন্যদিকে ব্রিটেনকে হুম্‌কী দিয়াছে। তাহারা আমাদের পঞ্চশীলের ধার ধারে না। তাহাদের পঞ্চশীল আমাদের পঞ্চশীল অপেক্ষা অনেক ভারী। তাহা হইতেছে ১। সাঁজোয়া গাড়ী, ২। ডুব জাহাজ, ৩। বিমান, ৪। কামান, ৫। আনবিক বোমা। ভারী হইলেও ইহাদের সাহায্যেই রাষ্ট্র জীবিত থাকে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং ধন সম্পদ বৃদ্ধির কথা বলা হয়; পূর্বে আমাদের উর্বর ভূমির এবং ধন সম্পদের আকর্ষণে দেশ বিদেশীর দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল এবং প্রতিরোধ করিবার মত শক্ত লৌহ আবরণের **অভাব ছিল।** আজ সেই আবরণ সৃষ্টির **প্রচেষ্টা করিতে হইবে।** যুবকদিগকে সৈন্য বাহিনীতে ভর্তি হইতে হইবে। হাইড্রোজেন বোমার তুলনায় শক্তিশলি অক্‌সিজেন বোমা প্রস্তুত করিতে হইবে। স্বাধীন ভারতে ভূমির আকাশ বোমারু বিমানের চন্দ্রাতাপে ব্যাপ্ত থাকিবে। পবিত্র হিন্দুভূমির পাদ প্রক্ষালনকারী সাগরের ঢেউয়ের উপর ভারতের রণতরী দোলায়মান হইতে থাকিবে। **ইহাতে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি পাইবে।**

১৯৬০ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরুও ষষ্ঠ জাতীয় বন্দুক চালনা

চ্যাম্পিয়ানশিপের উদ্বোধনী ভাষণে বলেন যে, 'সকল স্কুল কলেজে বাধ্যতামূলকভাবে বন্দুক চালনা ও সাঁতার শিক্ষা দেওয়া উচিত।'

নাসিক নগরের যে গৃহে মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লবীদল বীর সাভারকরকে কেন্দ্র করিয়া 'অভিনব ভারত' সংঘের গোড়াপত্তন করেন এবং যে গৃহে চারণ কবি 'গোবিন্দ' জাগরণী সংগীত রচনা করিয়া জনচিত্তে ক্ষাত্রবৃত্তি উদ্দীপ্ত করিয়া তোলেন ইংরাজ সরকার সেই গৃহখানি দখল লইয়াছিল এবং বিপ্লবীদের যাহা কিছু ভাবিকালে স্মরণীয় ও বরণীয় বলিয়া পরিগণিত হইত তাহা সমস্তই বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। বিপ্লব আন্দোলনের বহু স্মৃতি বিজড়িত এই গৃহখানি বীর সাভারকরের প্রচেষ্টায় নাসিকবাসী খরিদ করিয়া ১৯৫৩ সালের ১০ই মে বীর বিপ্লবীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং **'অভিনব ভারত স্মৃতি মন্দির'** প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ব গৃহটি অপরিবর্তিত রাখিয়া নির্মিত হইয়াছে আধুনিক মন্দির।

মন্দির গাত্রে স্মৃতি ফলকে লিখিত আছে ঃ-

স্বাতন্ত্র লক্ষ্মী -কি জয় !
ব্রিটীশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে
১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৭ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত
যাঁহারা আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন,
ভারত মাতার সেই সকল সন্তান
মহৎ ব্রতে মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন
আত্মোৎসর্গকারী শহীদের
স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বরূপ ওই মন্দির
প্রতিষ্ঠিত হইল।

১৯৫৭ সালে সিপাহী যুদ্ধের শতবার্ষিকী উৎসব ভারতের সর্বত্র সরকারী ও বেসরকারীভাবে প্রতিপালন করা হয়। তৎকালিন কেরালায় নাম্বুদ্রিপাদ সরকার সাভারকরকে উৎসবে আমন্ত্রণ জানান। অসুস্থতার জন্য তিনি যাইতে না পারায় উৎসবের তাৎপর্য ও সাফল্য কামনা করিয়া বাণী প্রেরণ করেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভাও কলিকাতায় উক্ত উৎসবে তাঁহাকে আমন্ত্রণ করেন। উক্ত আমন্ত্রণ পত্রোত্তরে সাভারকর যে পত্র প্রেরণ করেন তার সারাংশ ঃ-

'আপনারা ১০ই মে প্রতিপালন করায় আমি আনন্দিত হইলাম। এই শতবার্ষিকী উৎসবে আমি কেরল হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দু স্থানের প্রায় সকল রাজ্যের রাজধানী হইতে আমন্ত্রণ লিপি পাইয়াছি। কিন্তু অসুস্থতার জন্য কোথায়ও যোগদান করিতে না পারায় দুঃখিত। **১৯০৭-০৮ সালে লন্ডনে আমিই প্রথম ১০ই মে পালন করি,** কাজেই এই অনুষ্ঠানে যোগদান আমি গৌরবজনক বলিয়া মনে করি।

গত ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে ব্যর্থতার জন্য হিন্দুমহাসভা কর্মীগণের নিরুৎসাহ হওয়া উচিত নহে। বরং পরিপূর্ণ উদ্যমে ও কর্মশক্তিতে হিন্দুজাতির সেবা করা কর্তব্য। অন্যান্য

দলের প্রার্থীদের তুলনায় মহাসভা প্রার্থীর যোগ্যতা বা ক্ষমতায় নিকৃষ্ট ছিলেন না। কিন্তু নির্বাচকমন্ডলী যদি হিন্দু আদর্শের রক্ষাকারীদের জয়যুক্ত করিতে না চায় তবে সেই দোষ অন্ধ আত্মহত্যাকারী নির্বাচকমন্ডলীর, হিন্দুমহাসভার নহে। আপনারা সর্বদা গীতার বাণী মনে রাখিবেন কর্মে অধিকার, ফলে নহে। রাণা প্রতাপ সিং এবং অন্যান্য দেশ হিতৈষীগণের আমল হইতেই লক্ষ লক্ষ হিন্দু তাঁহাদের উপকারী বন্ধুদের বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া শত্রুর পিছনে ধাওয়া করিতেছে। পার্বত্য অরণ্যে আত্মগোপনকারী রাণা প্রতাপ কোল ভীলগণের সমর্থনেই জাতির জন্য যখন সংগ্রামে লিপ্ত তখন মোগলের পদলেহনকারী মানসিং টোডরমলের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া দিল্লীশ্বরকে জগদীশ্বর বলিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। কিন্তু **প্রতাপকে তাঁহার অসুবিধা এবং শক্তির স্বল্পতার জন্য দোষ দেওয়া যায় কি?**

১৯৫৮ সালের ২৮ শে মে, বীর সাভারকরের ৭৬তম জন্মদিবসে বোম্বাই পৌরসভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সকল দলের সদস্য দ্বারা অনুমোদিত মানপত্রে বলা হয়, 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আপনার দুঃসাধ্য প্রচেষ্টা এবং সানন্দে অবর্ণনীয় দুঃখবরণ ও আত্মত্যাগ ভারতের ইতিহাসে দেশপ্রেমের জ্বলন্ত নিদর্শন হইয়া থাকিবে এবং যুগে যুগে ভারতবাসী আপনার অর্নির্বাণ দেশপ্রেমের দীপশিখা হইতে তাহাদের দেশপ্রেমের দীপটি প্রজ্বলিত করিয়া লইবে।' তাঁহার গুণমুগ্ধ দেশবাসী কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ ৭৬টি পদ্মকোরকে ৭০০০্ টাকা সমর্পণ করিয়া শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

সম্বর্দ্ধনার উত্তরে বীর সাভারকর জাতীয় জীবন সামরিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, 'আমি আমার জীবদ্দশাতেই ভারতকে রাশিয়ার মত শক্তিশালী দেখিয়া যাইতে চাই।' ভারত বিভাগের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, 'আমি এই বিষয়ে সুনিশ্চিত যে বর্তমান দেশভাগ স্থায়ী হবে না। দুই জাতি একীকরণের কার্য্য ভাবি বংশধরদের হস্তে ন্যস্ত করিয়া এই বিষয় অপেক্ষা করিতে রাজি আছি।'

'সমগ্র ভারতবাসীর অন্তরের কামনাই যে বীর সাভারকরের মুখে বাণীমূর্তি গ্রহণ করিয়াছে ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। কম্যুনিষ্ট রাশিয়া অল্প সময়ের মধ্যে কিভাবে অন্যতম বিশ্বশক্তিতে পরিণত হইয়াছে তাহার কথা আমরা খুবই কম জানি। আজন্ম বিপ্লবী বীর সাভারকর ভারতকে রুশিয়ার মত শক্তিশালী দেখিয়া যাইতে চাহিবেন ইহা খুব স্বাভাবিক।' (দৈনিক বসুমতী ১৭ই জৈষ্ঠ্য ১৩৬৫)

বীর সাভারকরের এই ৭৬তম জন্মোৎসবে কলিকাতায় আহুত এক জনসভায় প্রখ্যাত সাংবাদিক **শ্রীবিবেকানন্দ মুখ্যোপাধ্যায়** প্রধান অতিথির ভাষণে বলেন, 'বীর সাভারকরের প্রতি আমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা আছে। সে শ্রদ্ধা কোন দলগত মতবাদের জন্য নয়। সাভারকরের জীবনের মধ্যে এমন একটা আশ্চর্য্য দিক আছে বর্তমানে নবগঠিত জাতির তা জানা দরকার। সাভারকরের বৈপ্লবিক জীবনের কোন সংবাদ বর্তমান যুবকেরা রাখে না কিন্তু রাখা দরকার। যে মানুষ ইতিহাসের এক প্রকান্ড ধারা নিয়ে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁকে জানা উচিত। বাংলাদেশে একটা ক্ষাত্রবীর্যের মনোভাব আছে, সেই ক্ষাত্রবীর্যের প্রতীক বিপ্লবী

বীরকে আমি বাংলাদেশের পক্ষ হইতে অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করিতেছি। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে যদি কেউ নাড়া দিয়ে থাকে, ভয় ঢুকিয়ে থাকে তবে সে হচ্ছে এই **বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পঞ্জাব**। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের ধারণা একমাত্র তাঁহাদের দ্বারাই স্বাধীনতা এসেছে। কিন্তু ইতিহাস এই কথা বলে না। কংগ্রেসের বাহিরেও যে আন্দোলন চলেছিল তার সমষ্টিগত ফল এই স্বাধীনতা। এককভাবে কোন দল সে কৃতিত্ব দাবী করতে পারে না।"

"বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সাভারকরের অভ্যুদয় ও অভ্যুত্থান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপর যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল তা আজিকার পার্লামেন্টারী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দিনে অনুভব করা যাবে না। কি গভীর আত্মত্যাগ , কি গভীর সাধনা, কি কঠোর সহনশীলতা ইহার পশ্চাতে থাকিলে এইরূপ বিপ্লব সংগঠিত হইতে পারে তাহা আজিকার সখের রাজনৈতিক আন্দোলনকারীরা অনুভব করিতে পারিবেন না।

বীর সাভারকরের মনোভাব ক্ষাত্রধর্মের মনোভাব। রাষ্ট্রকে বাস্তব দিক হইতে রক্ষা করিতে হইলে এই ক্ষাত্রধর্মের মনোভাব প্রয়োজন। যদি আমরা বীর সাভারকরের কাছ হইতে শিক্ষা পাইতে চাই, জীবন হইতে নির্দেশ পাইতে চাই তবে আমাদের ক্ষাত্রশক্তিকে জাগ্রত করিতে হইবে। সাভারকর এই শিক্ষাই দেন যে তুমি অবশ্য অপরকে অত্যাচার করিবে না, আক্রমণ করিবে না, লাঞ্ছনা করিবে না, শোষণ **করিবে না**, কিন্তু অপর দিকে অপরকেও তোমার উপর আক্রমণ, অত্যাচার, লাঞ্ছনা ও শোষণ **চালাইতে দিবে না**। তার জন্য শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে, ক্ষাত্রধর্মকে সাধারণের মধ্যে জাগাইয়া তুলিতে হইবে, ব্যক্তিগত জীবনে অহিংসার হয়ত **মূল্য আছে**, কিন্তু রাষ্ট্রীয় জীবনে যখন আমরা বহিরাক্রমণের **সম্মুখীন হই** তখন অহিংসার কোন **মূল্য নাই**। আমি স্তম্ভিত হইয়া যাই যে আমাদের দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীও সৈন্যদলকে অহিংসা ধর্ম পালন করিতে উপদেশ দেন। দেশের নিরাপত্তা , সার্বভৌমত্ব যদি আমরা রক্ষা করিতে চাই তবে অহিংসার দ্বারা হইবে না, তার জন্য চাই ক্ষাত্র ধর্মের উদ্বোধন। **সাভারকর আমাদের এই শিক্ষাই দেন।**

"যদি আমরা শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিতে চাই, অত্যাচারহীন শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন করিতে চাই তবে এই ত্যাগবীর সাভারকরের আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে।"

১৯৫৯ সালের ৮ই অক্টোবর বোম্বাইএ এক বিশেষ সমাবর্তনে পুণা বিশ্ববিদ্যালয় বীর সাভারকরকে সাহিত্য সেবার পুরস্কার স্বরূপ ডক্‌টোরেট অব লিটারেচার উপাধি দান করেন। উপাধিপত্র সংস্কৃত ভাষায় রচিত এবং উহাতে সাভারকরের দেশসেবা, সাহিত্যচর্চা প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়।

উপাধি গ্রহণের পর বীর সাভারকর এক নাতিদীর্ঘ ভাষণে বলেন, **ক্ষাত্রবৃত্তি ও বৈজ্ঞানিক** গবেষণা ভারতের আজ সর্বাধিক প্রয়োজন। **গৃহস্থ কাহারো ঘরে চুরি করে না বলিয়া কি গৃহীর ঘরে চুরি হয় না?** ভারত কাহাকেও আক্রমণ না করিলেও ভারত কি আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা নাই? * গত বারো বৎসরের মধ্যে আমাদের সেনাদল বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দেয় নাই, নাগরিকদের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেয় নাই, যুদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টিতে যত্নবান হই নাই বা উন্নত ধরনের অস্ত্র শস্ত্র নির্মাণের উদ্যোগ করি নাই। তৎপরিবর্তে সাংস্কৃতিক কার্য্যক্রমের

নামে শৃঙ্গাররসপূর্ণ নাট্যভিনয়, নৃত্যগীত প্রভৃতির উন্নতির প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিয়াছি, লক্ষ লক্ষ টাকা এই ব্যাপারে ব্যয় করিয়াছি। ইহার ফলে যাহা হইবার হইয়াছে—সারা বিশ্বে আমরা আজ তামাসার পাত্র হইয়া উঠিয়াছি। *** মনে রাখিবেন এই পৃথিবীতে দুর্বলের স্থান নাই। মিঃ ক্রুশ্চেভের কথায়, 'সারা জগৎ ভয় পায় কেন? রাশিয়ার সামরিক শক্তিই কি ইহার কারণ নহে?''

আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, আপনারা পুণা বিশ্ববিদ্যালয়েও এমন কার্য্যক্রম গ্রহণ করুন যেন আমাদের ছাত্রদের সামরিক শিক্ষা গ্রহণের তথা বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। রাশিয়া যদি চাঁদে রকেট পাঠায়, তবে ভারতকে সর্বপ্রথম মঙ্গলগ্রহে পৌঁছাইবার প্রচেষ্টা করিতে হইবে। সর্বাধুনিক সামরিকবিদ্যা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ভারত উৎকর্ষতা লাভ করুক ইহাই আমার অন্তিম কামনা।''

পুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি বীর সাভারকরের এই আবেদন ব্যর্থ হয় নাই। ১৯৬৩ সালে ২৮শে মে বীর সাভারকররের ৮১তম জন্মজয়ন্তী পালন উপলক্ষে অতীত কার্য্যকলাপের কথা স্মরণ করিয়া পুণা বিশ্ববিদ্যালয় সামরিক বিজ্ঞানের একটি অধ্যাপক পদ সৃষ্টির বিষয় নীতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

ভারতের পূর্ব সীমান্তে পাকিস্থানী সেনা পুনঃ পুনঃ হানা দিয়া ভারতীয় নাগরিক গৃহ পালিত পশু ও শস্য অপহরণ করিত। ভারত সরকার কড়া নোট পাঠাইয়া এবং চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করিয়াও সীমান্ত উপদ্রব নিবারণ করিতে সমর্থ হন নাই। সেই জন্য পূর্ব সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষার ভার সেনা বাহিনীকে দেওয়া হয়। তার জন্য বীর সাভারকর পণ্ডিত নেহেরুকে নিম্নলিখিত তারবার্তায় অভিনন্দিত করেন—

সাভারকর সদন
শিবাজী পার্ক (বোম্বাই)
২/৪/৫৯

আমাদের পূর্ব সীমান্তের ভারতীয় সেনা বাহিনীর হস্তে ন্যস্ত করিয়া যে সাহসিকতা পূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও সমর্থন জানাইতেছি।

প্রতিরোধ, প্রতিশোধ, শাস্তিমূলক সামরিক ব্যবস্থার দ্বারাই আমাদের লুপ্ত মর্যাদা পুনরুদ্ধার করা যাইতে পারে।

যুবকদের বাধ্যতা মূলক সামরিক শিক্ষা প্রবর্তনের নীতি ও অস্ত্র আইন বাতিল করা প্রয়োজন।

বশংবদ
ভি, ডি, সাভারকর।

১৯৫৭ সনে সাধারণ নির্বচনে কেরলে কমিউনিষ্ট পার্টির জয় সূচিত হওয়ায় শ্রীনাম্বুদ্রীপাদ তথায় মন্ত্রীসভা গঠন করেন। বর্তমান দুনিয়ায় রাষ্ট্রপরিচালন ব্যাপারে বিপ্লববিহীন রক্তপাতহীন ইহাই একমাত্র কমিউনিষ্ট সরকার গঠনের দৃষ্টান্ত। নাম্বুদ্রীপাদ সরকারের প্রস্তাবিত শিক্ষাসংস্কার বিল এবং ভূমি সংস্কার বিলের প্রতিবদে কংগ্রেস, পি, এস, পি,

খ্রীশ্চিয়ান মিশনারীগণ ও ইস্‌লাম সম্প্রদায় প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি করেন। গণতন্ত্রের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়া ভীরুর মত অন্যায় আন্দোলনকারীদের নিকট নতি স্বীকার না করিতে বীর সাভারকর শ্রীনাম্বুদ্রীপাদের নিকট বাণী প্রেরণ করেন। অবশেষে কেরলে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রযুক্ত হয় এবং পুনঃ নির্বাচন হয়। লক্ষ্য করিবার বিষয় উক্ত পুনঃনির্বাচনে বিপক্ষকে পরাভূত করিবার জন্য কংগ্রেস মুসলিম লীগ পুনর্গঠনে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে নাই। এইরূপেই **খণ্ডিত স্বাধীন ভারতে মুসলিম লীগের পুনর্গঠন** হইল। 'বর্তমান মুসলীম লীগ অতীতের মুসলীম লীগ নয়, বলিয়া নেহেরুজীও পুনর্গঠিত মুসলিম লীগকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন।

নাম্বুদ্রীপাদ সরকারের এই পতনে বীর সাভারকর এক প্রবন্ধাকারে বলেন,

"কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার কর্তৃক গদীচ্যুত কেরলের কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা বড় অভিযোগ যে, কমুনিষ্ট সরকার স্কুলপাঠ্য পুস্তক সমূহে কমুনিষ্টভাবধারা প্রচারে প্রয়াসী ছিল এবং ইহার উদ্দেশ্য ছিল বাল্যকাল হইতেই তরুনমনগুলিকে কমুনিষ্ট ভাবাপন্ন করিয়া তোলা।

কেরলে কমুনিষ্ট সরকারের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারে অভিযোগ সমূহের বিচার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু যে দল জাতীয়তাবাদকে নিজেদের আদর্শ বলিয়া প্রচার করে তাহারা যদি দলীয় সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তরুণমনকে কলুষিত করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহা খুবই বেদনাদায়ক সন্দেহ নাই। কেবল বেদনা-দায়ক নয়, এইরূপ একদেশদর্শী মনোভাব জাতির বুদ্ধি বিবেচনার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সামিল। কংগ্রেস সরকার স্বয়ং এই নীতি হইতে চ্যুত হইয়াছেন।

প্রত্যেক জাতীয় সরকারের কর্ত্তব্য, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় নবীন বংশধরেরা যাহাতে কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রচার কার্যের ধারক না হইয়া দাঁড়ায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে, কংগ্রেস সরকার যে অপরাধের জন্য কেরলের কমুনিষ্ট সরকারকে শাস্তি দিয়াছেন তাঁহারাও সেই অপরাধে অপরাধী। তাঁহাদের শাস্তি আরো বেশী হওয়া উচিত; কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলিতে যে সব পাঠ্য পুস্তক প্রচলিত, তাহাতে নির্জলা মিথ্যা ইতিহাস এবং সম্পূর্ণ ভুল তথ্যের পরিবেশন কার হইয়াছে। যেহেতু ক্ষমতা কংগ্রেস সরকারের হাতে, তুলিবার মত হাতের সংখ্যা অনেক বেশী, সেইজন্য তাহারা খেয়াল মাফিক ইতিহাস সৃষ্টি করিতেছেন। কংগ্রেস সরকারের কর্ণধার শ্রীনেহেরুকে এই অপরাধের জন্য শ্রীনাম্বুদীপাদের অপেক্ষা অধিক শাস্তি দেওয়া উচিত। বর্তমান স্কুলপাঠ্য পুস্তকগুলি কংগ্রেসদলের প্রচারকার্যে ভরপুর। ঐগুলিতে সত্যও অহিংসার মাধ্যমে একবিন্দু রক্তপাত না করিয়া 'স্বরাজ্য' অর্জন করা সম্ভব হইয়াছে বলিয়া অলীক কাহিনী প্রচার করিতেছে।'

গান্ধীবাদের সত্য ও অহিংসার বির্তকমূলক কথা বাদই দিলাম। উহা রাজনৈতিক জগতে গত ৪০ বৎসর ধরিয়া জঘন্য রকমের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়াছে। কংগ্রেস সরকার কিভাবে বিকৃত ঐতিহাসিক তথ্য পাঠ্যপুস্তকসমূহের সন্নিবিষ্ট করিয়া নিজেদের দলীয় স্বার্থসাধনের

চেষ্টা করিতেছে, তাহা বলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের কয়েকটি গৌণদিগককে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকেই প্রধান বলিয়া দেখাইতে চেষ্টা না করিয়া এই সম্পর্কে তরুণগণের মনে প্রকৃত ধারণা দিবার চেষ্টা করা উচিত, কিন্তু তাহা করা হইতেছে না। এখানে একটি পাঠ্যপুস্তক হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি........'অবশেষে ভারত স্বাধীনতাসংগ্রামে একমাত্র গান্ধীজীর অহিংসার অস্ত্রের সাহায্যে জয়ী হইল এবং ১৯৫০ সালে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইল।' (বোম্বাইয়ের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পৃথিবী ও ভারত নামক একটি পাঠ্যপুস্তক হইতে উদ্ধৃত)

ঐ প্রচারের দুইটি দিক লক্ষ্যণীয়

(১) হিন্দুস্থানের স্বরাজ্যলাভ সম্ভব হইয়াছে ব্রিটীশ শাসকদের হাত হইতে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর এবং তাহা গান্ধীজীর প্রত্যক্ষ প্রভাবেই সম্ভব হইয়াছে। ইহাতে স্বরাজ্য অর্জন গৌরব গান্ধীজী এবং তাঁহার চরকা সমন্বিত কংগ্রেসের উপরেই বর্ত্তাইয়াছে।

(২) প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইতেছে যে গান্ধীজী এবং তাঁহার কংগ্রেস অহিংসা উপায়ে স্বরাজ্য অর্জন করিয়াছে। সংক্ষেপে নিরস্ত্র বিপ্লবের সাহায্যে দেশ স্বাধীন হইয়াছে। প্রকৃত তথ্য—ঐতিহাসিক দিক হইতে বলা যায় ঐ তথ্য অসত্য, একদেশদর্শী এবং নিন্দনীয়। কংগ্রেস শাসকদের এই স্বার্থপ্রণোদিত প্রচারের মুখোশ খুলিয়া দিতে হইবে এবং এই ভুল শিক্ষা যাহাতে পরবর্তী বংশধরেরা না পায় তজ্জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

ছাত্র এবং শিক্ষক সকলেরই আজ ঘোষ করিতে হইবে যে তাহারা ইতিহাসের ছদ্মবেশে এই মিথ্যাপ্রচারণার অধ্যায়ন ও অধ্যাপনা করিবেন না। প্রকৃত তথ্য সম্পর্কে তাঁহাদের খোঁজ রাখা দরকার।

ব্রিটিশ শাসন অবসান হইবার পর বা তার কিছু পূর্বে, শাসনযন্ত্র পরিচালনের দায়িত্ব কংগ্রেসের উপর বর্তায়। যে হেতু কংগ্রেস ব্রিটিশের পরিত্যক্ত জুতা পরিধান করে, স্বভাবতই ছাত্রপাঠ্য ইতিহাসে অভিসন্ধিমূলক প্রচারকায্য সূচিতহয়। **বিদেশীরা এই ষড়যন্ত্রের হোতা;** তাহারা দেখে, যদি তাহারা এই দেশের একদল ভীরু ও স্বার্থ সর্বস্ব লোককে হাত করিয়া রাখিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের স্বার্থও ষোল আনা বজায় থাকিবে। সেই জন্য তাহারা উদ্দেশ্য মূলক মিথ্যা ইতিহাস প্রচার করিতে আরম্ভ করে এবং সশস্ত্র সংগ্রামের কাহিনী মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে থাকে।

এই প্রসঙ্গে আমি বলিয়া রাখিতে চাই যে আমরা কখনো এমন দাবী করি না যে কেবলমাত্র সশস্ত্র বিপ্লবীদের সাহায্যেই দেশ স্বাধীন হইয়াছে ঃ উহা বলিলে সত্যর অপলাপ করা হইবে এবং আমরা কংগ্রেসী শাসকদের মতই সমান অপরাধে অপরাধী হইব। কংগ্রেসীরা ঢক্কানিনাদে প্রচার করেন যে, তাঁহারা অহিংস উপায়ে নিরস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা স্বাধীনতা আনিয়াছেন। এই চীৎকারের উদ্দেশ্য অপর কিছু নয়; তাহারা মিথ্যাকে সত্য ইতিহাসে পরিণত করিবার চেষ্টা করেন। এই মিথ্যা প্রচারণার মুখোশ খুলিয়া দেওয়া পবিত্র কর্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি। অন্যথায় দেশ ও ইতিহাসের প্রতি আমাদের অকৃতজ্ঞত প্রতিপন্ন হইবে। ১৯৪৯

সালে ডিসেম্বর মাসে আমি হিন্দু মহাসভার কলিকাতা অধিবেশনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে এই কথাই বলিয়াছিলাম যে, 'ভারতকে বিদেশী ব্রিটিশ শাসনের হাত হইতে মুক্ত করা এবং স্বাধীন সার্বভৌম গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার কৃতিত্ব কোনও একটি রাজনৈতিক দলের নয়। ইহা সকল স্তরের এবং সকলদলের দেশ প্রেমিক জনসাধারনের সম্মিলিত ও সংঘ প্রচেষ্টার ফল এবং ইহা গত দুই তিন পুরুষের জনসাধারণের চেষ্টায় সম্ভব হইয়াছে।

"উদার নৈতিক হইতে বিপ্লবী—১৮৫৭ সালে প্রথম সশস্ত্র বিপ্লব হয়। তাঁহাদের অবদান ইহাতে কম নয়। তেমনি দেশের উদারনীতিক নেতারা—দাদাভাই নৌরজী হইতে গোখেল পর্য্যন্ত সকলেই নিজ নিজ স্তরে থাকিয়া স্বাধীনতার সংগ্রাম করিয়াছিলেন। সেই আমলে জাতীয়তাবাদীরা—যাহাদিগকে চরমপন্থী বলা হইত তাহাদের অবদানও কম নয়, এই সঙ্গে আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে শত সহস্র দেশ প্রেমিকদের কথাও স্মরণ করিব যাহারা নিজদিগকে অসহযোগ পন্থা ও অহিংসা সত্যাগ্রহী বলিয়া ঘোষণা করিয়া বারংবার কারাবরণ করিয়াছেন। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, যেসব লক্ষ লক্ষ দেশবাসী **সক্রিয়ভাবে** স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন নাই, তাহারাও এই সংগ্রামে **নীরব সমর্থন** দিয়াছেন এবং ভগবানের নিকট দেশের আশু মুক্তি **প্রার্থনা** করিয়াছেন। কাজেই জাতীয় বিজয়ে তাঁহাদেরও যথোপযুক্ত আসন দেওয়া উচিৎ। এ কথা ভুলিলে চলিবে না, তাঁহাদের নীরব সমর্থন বিপ্লবীদের পথ অনেকটা মসৃণ করিয়া দিয়াছিল।

"এই উদার এবং সৎদৃষ্টিভঙ্গী লইয়া যদি আমরা বিবেচনা করি, তাহা হইলে দেখিব সর্বশ্রেণীর ও সকল স্তরের দেশ প্রেমিকদের সমবেত প্রচেষ্টার ফলে দেশ বৈদেশিক শাসন মুক্ত হইয়াছে। ইহাই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের প্রকৃত চিত্র।

"কিন্তু সেই সব সশস্ত্র বা নিরস্ত্র বিপ্লবীদের যথোপযুক্ত সম্মান না দিয়া গত ১৩ বৎসর যাবৎ নিরন্তর প্রচার করা হইতেছে যে কেবল নিরস্ত্র সংগ্রামীরাই দেশ উদ্ধার করিয়াছে। এই সঙ্গে সশস্ত্র বিপ্লবীদের নাম মুছিয়া দেওয়ারও চেষ্টা চলিতেছে। আজ ক্ষমতা তথাকথিত কংগ্রেসীদের হাতে। কাজেই এই নিন্দনীয় প্রচার কার্য্য বর্তমানে দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। এইসব কংগ্রেসীদের সঙ্গে দেশের স্বাধীনতার লড়াই সূচিত হইয়াছিল ১৯২০ সাল হইতে। লক্ষ্য করিবার বিষয় লড়াই কথাটা অহিংসা নয়। এই একটা কথাই মিথ্যা ইতিহাসের মুখোশ খুলিয়া এইসব লোক-যাহারা অহিংস সত্যাগ্রহ করিয়া কয়েক মাস অথবা কয়েক বৎসর জেলে ছিলেন তাহাদেরও আমরা দেশপ্রেমিক বলিয়া মানিতে দ্বিধাবোধ করি নাই, তাহারাও আমাদের নিকট কৃতজ্ঞতা দাবী করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারাই একমাত্র দেশপ্রেমিক, এইরূপ প্রচার হাস্যকর। এই প্রচার কার্যের জন্যই আজ **কংগ্রেসী ছাপ দেওয়া দেশপ্রেমিকদের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা দেশ সেবার পুরষ্কার হিসাবে বন্টন করা হইতেছে, তাহাদের আত্মীয় কুটুম্ব পর্যন্ত সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা পাইতেছেন**। এই অবস্থা এমন স্তরে পৌঁছিয়াছে যে, চক্রবর্তী রাজগোপালাচারীর মত এককালের সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা এই সরকারী অর্থের দানসত্র বন্ধ করিবার দাবী করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, দেশপ্রেমের চেকগুলি আর সরকারী কোষাগার হইতে ভাঙ্গাইতে দেওয়া উচিৎ নয়।"

"যদি টাকা দিয়াই দেশপ্রেমের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হয় তবে যে সব সশস্ত্র সংগ্রামী দেশপ্রেমিক আমাদের মধ্যে নাই, তাঁহাদের প্রত্যেকেই কোহিনুর মণি দিয়া শোভিত করা কর্তব্য। যদি আজ দেশবাসী দেশপ্রেমিক ভগৎ সিং, ধিংড়া, রাসবিহারী বসু, ক্ষুদিরাম প্রভৃতি একদা তাঁহাদের দেশপ্রেমের চেক লইয়া আমাদের দেওলিয়া সরকারী কোষাগার হইতে ভাঙ্গাইতে পাইবেন বলিয়া জানিতেন তবে তাঁহারা যে সব কাজের জন্য অমরত্ব লাভ করিয়াছেন তাহা করিতে সাহসী হইতেন কি না সন্দেহ। অথচ তাঁহারা দুই চারিমাস কারাগারে ১ম শ্রেণীর বন্দী থাকিয়া অনায়াসে আবার জীবন যাপন করিতে পারিবেন, আর মাঝে সাঝে বন্ধু-বান্ধবদের পাঠানো নেবুর সরবৎ পান করিতেন। অবশ্য যাঁহারা দেশপ্রীতির অপরাধে কারাগারে নির্বাসিত জীবন যাপন করিয়াছেন তাঁহারা আমাদের নমস্য। কিন্তু **প্রধানমন্ত্রী নেহেরু শ্রেণীর কংগ্রেস মার্কা দেশপ্রেমিকগণ যখন ক্ষুদিরাম প্রমুখ বিপ্লবীদিগকে ভ্রান্তপথগামী বিকৃত বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ বলিয়া অবজ্ঞা করেন** তখন আমাদের স্পষ্ট বলিতে হয় যে যাঁহারা দেশের স্বাধীনতা ও অখন্ডত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মাহুতি দিয়াছেন তাঁহারা এই সব অহিংস মিথ্যাশ্রয়ী প্রচারকদের অপেক্ষা অনেক গুণে উপাস্য।

"যখনই চাপেকার বা নেতাজীর কথা উল্লিখিত হয় তখনই কংগ্রেসীরা তাঁহাদের অন্তরের অন্তস্থলে লজ্জাবোধ করেন সন্দেহ নাই। কারণ তাঁহাদের দেশপ্রেমের নিকট এই সব কংগ্রেস নেতাদের ২য় শ্রেণীর দেশ প্রেম নিস্প্রভ বোধ হয় এবং তাঁহাদের সামনে এই সব কংগ্রেস নেতারা বামন বলিয়া প্রতীয়মান হন। এই কারণেই তাঁহারা আজ উপরোক্ত মহান আত্মাদের উদ্দেশ্যে সম্মান দানে ইতস্ততঃ বোধ করেন। এই দেশপ্রেমহীন মনোভাব তাঁহাদের ঈর্ষাপরায়ণ এবং ক্লীব মনের পরিচয় দেয় কারণ তাঁহাদের হৃদয় বিকৃত উচ্চাকাঙ্খায় পূর্ণ।

"কংগ্রেস সরকার অনুমোদিত স্কুল পাঠ্য পুস্তক সমূহে যে সব প্রাথমিক নির্জলা মিথ্যা প্রচার করা হইতেছে তাহার মুখোশ খুলিয়া দিয়াছি। অতঃপর আমরা দ্বিতীয় মিথ্যা প্রচারণার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিতে চাই। কংগ্রেসী শাসন আমাদের বংশধরদের এই কথাই শিক্ষা দিতে চায় যে, গান্ধীজীর চরকা কাটুয়া কংগ্রেসীরা ব্রিটিশের হাত হইতে শাসন ক্ষমতা ছিনাইয়া লইয়াছেন তাহাও অহিংস ও অসামরিক প্রতিরোধের সাহায্যে। এই মিথ্যা প্রচার দ্বারা সহস্র সহস্র শহীদ বীর সংগ্রামীদের প্রতি চরম অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইতেছে। নিরপেক্ষ তথ্যানুসন্ধানী ও আমাদের শত্রুদের বক্তব্য উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই মিথ্যাপ্রচারকে অপ্রমাণিত করিব। হিন্দুজাতির সামরিক শক্তি এমন কী আমাদের জাতির পুরুষত্বকেও ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্য লইয়া এই মিথ্যাপ্রচার কার্য্য চালানো হইতেছে।

'ভারতের স্বাধীনতা অহিংস উপায়ে আসে নাই, আসিয়াছে আমাদের সশস্ত্র বিপ্লবীদের কর্মশক্তির সহায়তায়। যে দিন ব্রিটিশ দেখিল আমাদের সশস্ত্র বাহিনী তরবারি উন্মুক্ত করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করিয়াছে, তখন তাহারা ক্ষমতা হস্তান্তরে সম্মত হয় এবং একটা আপোষে আসিতে চেষ্টা করে। তদানীন্তন ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ইতিহাসের এই অনিবার্য পরিণতি মানিয়া লয়েন এবং ব্রিটীশ পার্লামেন্টে এইকথা স্বীকার করেন।

"১৯৫৪ সালে বিখ্যাত জাপানী গ্রন্থকার শ্রী জে, জি, ওসোয়া তাঁহার বিখ্যাত 'জাপানে

দুইজন খ্যাতনামা ভারতীয়' নামক পুস্তকে রাসবিহারী বসুর জীবনী বর্ণনা প্রসঙ্গে এই ঐতিহাসিক সত্য উল্লেখ করিয়াছেন।

'২য় মহাযুদ্ধের সময় যখন জাপানীরা সিঙ্গাপুর আক্রমণ করে এবং ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনী তাহাদের সম্মুখীন হয়, সেই সময় রাসবিহারী বসু চালিত আজাদহিন্দ ফৌজ ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছিল। শ্রীওসোয়ার পুস্তকের কয়েকটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হইল ঃ-

........ফেব্রুয়ারী মাসে জাপানীদের সিঙ্গাপুর আক্রমণ সূচিতহইল।.........ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনী প্রচণ্ড বিক্রমে প্রতিরোধ করিতে লাগিল। জাপানী বাহিনী বহু অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছিল।

"এই সময় আজাদহিন্দ্ ফৌজের অধিনায়ক একক যুদ্ধক্ষেত্রে আসিলেন এবং ব্রিটিশ বাহিনীর অফিসার এবং সৈনিকদের সহিত গোপন যোগাযোগ স্থাপন করিয়া আবেদন জানাইলেন, আপনারা ভারতের প্রতি ভালবাসার যথার্থ পরিচয় দিন এবং ভারতীয় স্বাধীনতা লাভের এই চরম মুহূর্তকে হেলায় বিসর্জ্জন দিবেন না। তাঁহার এই যোগাযোগের ফলে **বিস্ময়কর পরিবর্তন** ঘটিল। ব্রিটিশ পক্ষ হইতে অকস্মাৎ গুলীবর্ষণ বন্ধ হইল ২য় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে সাভারকর যে সামরিকীকরণ নীতি অবলম্বনের জন্য ভারতীয়দের আহ্বান জানাইয়াছিলেন, তাহা রূপায়িত হইতে আরম্ভ করিল। (The Shooting on the side of the British Indian Forces was Stopped. Savarkar's Militarijation policy in World War II began to take Shape.')

"বক্তৃতা শেষ হইল। ভারতীয় বাহিনীর সৈনিকরা যাহারা আজাদহিন্দ্ ফৌজ তাহারা সকলেই উন্মত্তের ন্যায় জয়ধ্বনি দিয়া উঠিলেন। এমন কী জাপানী ইম্পিরিয়েল গার্ডের অধিনায়কেরা এই দৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

"ব্রিটিশ বাহিনী হইতে যাহারা আত্মসমর্পণ করিলেন তাহাদের সংখ্যা প্রায় ৪৫০০০; মালয়ের ভারতীয়দের যোগদানে এই সংখ্যা প্রায় ৫০,০০০ হাজারে দাঁড়াইল।

"এই আত্মসমর্পণ কারী সৈনিকদের মধ্যে প্রায় ৩০ জন অফিসার ছিলেন। কর্ণেল গিল ইহাদের অন্যতম। রাসবিহারী বসু সর্বোচ্চ অধিনায়ক পদে বৃত হইলেন।"

জনৈক নিরপেক্ষ তথ্যানুসন্ধানীর পুস্তকের কয়েকটি অংশ উপরে প্রদত্ত হইল। এখন দেখা যাক্, তদানীন্তন ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলী ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'ভারতীয় স্বাধীনতা আইন' সম্পর্কিত বিল উত্থাপন প্রসঙ্গে কি বলিয়াছিলেন......... মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চিল ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের স্তম্ভগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িতে দেখিয়া বেদনায় অধীর হইয়া আর্ত্তস্বরে পার্লামেন্টে প্রশ্ন করেন 'ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের' কোনও বিকল্প পন্থা কি নাই? এটলী অসহায় ভাবে উত্তর দিলেন ঃ—

'বৃটেন ক্ষমতা হস্তান্তর করিতেছে দুইটি কারণে প্রথমতঃ ভারতীয় সৈনিকেরা আর বৃটেনের প্রতি অনুগত নহে; দ্বিতীয়তঃ ভারতকে পদানত রাখিয়া শাসন চালাইবার মত বিরাট ব্রিটিশ বাহিনী রাখা ইংরাজ সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়।' (Britain is transfer-

ring power due to the fact (1) the Indian Mercenary Army is no longer loyal to Britain (2) Britain cannot afford to have a large British Army to hold down India.)

'মিঃ ক্লিমেন্ট এটলী বা কোনও ব্রিটিশ এম্ পি এ কথা স্বীকার করেন নাই যে, তাঁহারা গান্ধীজী 'হৃদয়ের পরিবর্তনের' প্রার্থনায় এবং চরকা, তকলীর সুতা কাটার ফলে ভীত হইয়া অথবা সাম্রাজ্য দখলে রাখার অযৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া ভারত ত্যাগ করিয়াছেন। এই বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে, চরম পন্থীদের চাপে পড়িয়া ব্রিটিশেরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল এবং ১৯০৬ সাল হইতে ১৯৪৭ সালের মধ্যে ভারতীয় বাহিনীর মনোভাবের ক্রমপরিবর্তনে উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিল।

'একই সাথে ভারতীয় বিপ্লবীরা ব্রিটিশ বিরোধী অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতেছিলেন এবং উভয় মহাযুদ্ধের সুযোগ লইয়া অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া বিদ্রোহ ঘটাইবার আয়োজন করিয়া ছিলেন। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী এই বিষয়েরই উল্লেখ করয়াছিলেন।

'এই কারণেই আজ শিক্ষকদের কর্তব্য বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকগুলিতে যে সব মিথ্যা প্রচারণা চলিতেছে তাহা শিখাইতে অস্বীকার করা এবং ছাত্রদের প্রকৃত ইতিহাস বুঝাইয়া দেওয়া। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতার উল্লেখ করিয়া তাঁহারা এই ঐতিহাসিক তথ্য প্রতিপন্ন করিতে পারেন, ভারতীয় বিপ্লববাদীদের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ভারতীয় বাহিনীর আক্রমণে ব্রিটিশরা স্তম্ভিত হইয়াছিল।

'গান্ধীজীর ভীরুমনোভাব প্রসূত নিরস্ত্র সংগ্রামের চাপে তাহারা ভারত ত্যাগ করে নাই। ১৮৫৭ সন হইতে বিপ্লববাদীদের সংগ্রাম, ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে গোপনে প্রচার কায্য চালানো, 'অভিনব ভারত' প্রতিষ্ঠানের ফ্রান্সে, ইংল্যাণ্ডে ও ভারতে কায্য কলাপ, রাসবিহারী বসু এবং অন্যান্য বিপ্লবীদের প্রচেষ্টা, সামরিক বাহিনীর বিদ্রোহ এবং সর্বশেষ সুভাষচন্দ্র বোসের অভ্যুত্থান, সমস্ত মিলিয়া ব্রিটিশকে ভারত ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছে। এমন কী ভারতীয় বিমান বাহিনী, ভারতীয় নৌবাহিনীও ঐ সংগ্রামে যোগ দিয়াছিল। ব্রিটিশেরা ভারতকে দয়া করিয়া স্বাধীনতা দেয় নাই। বিপ্লবীরা উহা ছিনাইয়া লইয়াছেন। অহিংসা, অসহযোগ, তকলী-চরকা বা উপবাস নয়, সামরিকী রণ নীতিই এই মিরাকেল ঘটাইয়াছে।

ইতিহাসের ছাত্রেরা যেন এই কাহিনী স্মরণ রাখেন এবং এই প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্রিটিশকে পরাস্ত করিয়াছিল।''

১৯৬০ সনে বোম্বাই প্রদেশ ভাঙ্গিয়া মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্য গঠন করা হয়, এই উপলক্ষে গুজরাট বাসীদের অভিনন্দন জানাইয়া বীর সাভারকর নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রচার করেন ঃ—

গুজরাটের এই ঐতিহাসিক ও আনন্দময় দিনে গুর্জুরবাসীকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। শীঘ্রই তাঁহারা স্বীয় অভিরুচিমত পৃথক প্রাদেশিক সরকার গঠন করিতেছেন। এতদুপলক্ষে আমি তাঁহাদের অনুরোধ জানাই যেন তাঁহারা ঘৃণিত আমেদাবাদ নাম বর্জন করেন এবং ঐ নগরীর স্থাপয়িতা ও অধীশ্বর মহারাজ কর্ণের নামে উহার পূর্ব নামেই নামকরন করেন **কর্ণাবতী**।

এই নগরের আহমদাবাদ নাম করণের জঘন্য ইতিহাস এই, মুসলমান আক্রমণের দিনে সুলতান **আলাউদ্দিন** ও তাঁহার অনুচারগণ গুজরাটের রাজধানী কর্ণাবতী আক্রমণ করিয়া উহাকে বিধ্বস্ত করেন। কয়েক শতাব্দী ধরিয়া গুজরাট নির্মম ও পৈশাচিক মুসলমান অত্যাচারে জর্জরিত হইয়াছিল। নরহত্যা, নারীধর্ষণ, অপহরণ, অঙ্গচ্ছেদ বলপূর্বক ধর্মান্তর এবং শত সহস্র হিন্দুনরনারীকে ক্রীতদাসের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা ইত্যাদি বর্বরোচিত অত্যাচারে গুজরাট নিস্পিষ্ট হইয়াছিল। সুলতান আহমেদ শাহ বিধ্বস্ত কর্ণাবতী নগরীর ধ্বংস স্তূপের উপর নূতন ণাগরী নির্মাণ করাইয়া নিজের নামে নাম করণ করিলেন, আমেদাবাদ; কুখ্যাত অত্যাচারী মহম্মদবেগদার রাজধানী ছিল ইহাই।

ইতিহাসের অপরিবর্ত্তিতগতি পথে কর্ণাবতী নগর আমেদাবাদে রূপান্তরিত হইয়া সেই **ঘৃণিত স্মৃতি** বহন করিয়া চলিয়াছে। যদি ঐ নাম থাকিয়া যায় তবে কালিমালিপ্ত ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায় ইহার সহিত বিজড়িত থাকিবে।

অতএব আজিকার শুভদিন আমাদের পবিত্র কর্ত্তব্য গুজরাটের মানচিত্র হইতে ঐ ঘৃণ্য কলঙ্কজনক নাম চিরতরে লুপ্ত করিয়া উহার নামকরণ করা উচিত কর্ণাবতী।

যদি গুজরাটের রাজধানী অন্যত্র স্থাপিত হয়, তবে উহার নাম করণ করা উচিত '**বল্লভ-নগর**।' সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের অকম্পিত হস্ত ও দৃঢ় সংকল্প দেশকে সংগঠিতকরিতে যে চেষ্টা করিয়াছে, তাহার উপযুক্ত স্মৃতি ইহাতে রক্ষা করা হইবে।

গুজরাটের উপকূলে আরবসাগরের অপমানজনক বৈদেশিক নামও এই সঙ্গে ত্যাগ করা উচিৎ। এই সমুদ্র হিন্দুদের নিকট পবিত্র এবং ইহার সৈকত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী ছিল বলিয়া ইহার সুপ্রাচীন বহু স্মৃতি বিমণ্ডিত নামে পুনরায় নামকরণ হউক **রত্নাকর**।—ভারতের পূর্বপ্রান্তে গঙ্গাসাগর নামের সহিত সাদৃশ্য রাখিবার জন্য এই সাগরের নাম রাখা যাইতে পারে **সিন্ধুসাগর**।

জাতীয় মর্যাদাহানীকর বলিয়া ইংরাজ শাসন মুক্ত ভারতে শাসকের নামে পরিচিত রাস্তার, বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন, প্রতিমূর্তী স্তম্ভ ইত্যাদি অপসারিত করা হইয়াছে। বিশুদ্ধ এবং নির্ভেজাল জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ হিন্দু জাতীয়তাবাদের মহাভাষ্যকার সংগ্রামী সাভারকরের ভারতে ইসলাম শাসনের স্মৃতি বিলুপ্তির এই নির্দেশ ন্যায় সঙ্গত।

পাঠকগণ অবগত আছেন বীর সাভারকর পঞ্চাশ বৎসরের জন্য দণ্ডিত হন। অর্দ্ধ শতাব্দী ব্যাপী এই চরম দণ্ড প্রদানের উদ্দেশ্য ছিল সুনিশ্চিত মৃত্যুর করাল দন্তে নিস্পেশিত করা। বিদগ্ধ বন্দী বীর সাভারকর আন্দামান বন্দীনিবাসে মৃত্যুর সম্মুখীনও হইয়াছিলেন মৃত্যুদূত বাহু প্রসারিত করিয়াও বীর দেহ স্পর্শ করিতে পারে নাই। পূর্ণদণ্ড ভোগ করিতে হইলে ১৯৬০ সনের ২৪শে ডিসেম্বর বীর সাভারকর ব্রিটিশ দণ্ডাগার হইতে মুক্তি পাইতেন। চরম দণ্ডের শেষদিবস স্মরণ করিয়া অখিল ভারত হিন্দুমহাসভার উদ্যোগে ১৯৬০ সনের ২৪শে ডিসেম্বর সারা ভারতে সাভারকর মৃত্যুঞ্জয় দিবস' পালিত হয়। ঐ দিবস বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুমহাসভার কায্যালয় আলোক মালায় সুসজ্জিত করা হয়। 'অগ্নিশিশু সাভারকর'

নাটক অভিনীত হয় এবং জনসভায় মুক্তি সংগ্রামী সাভারকরের জীবনী ও বাণী আলোচনা করা হয়। উক্ত জন সভায় সভাপতিত্ব করেন বিপ্লবী **লোকনাথ বল**।

১৯১০ সালে সাভারকর রাজদ্রোহের অপরাধে দণ্ডিত হইলে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় সাভারকরের বি, এ ডিগ্রী **প্রত্যাহার** করিয়া লয়। ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামে স্মরণীয় ঐতিহাসিক ১৯৬০ সনে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ঐ ডিগ্রী **প্রত্যর্পণ** করেন। বলাবাহুল্য মাত্র যে, বিপ্লবী সাভারকরই একমাত্র স্নাতকোত্তর, স্বদেশ সেবার অপরাধে বিশ্ববিদ্যালয় যাঁহার বি, এ ডিগ্রী প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছিল।

১৯৬২ সনে কলিকাতায় অখিল ভারত হিন্দুমহাসভার ৪৭ তম অধিবেশনে বীর সাভারকর চীন কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণ পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন ঃ-

প্রিয় দেশপাণ্ডে, *

আমার বাণী টেপ রেকর্ড করিবার ইচ্ছা জানাইয়াছেন কিন্তু জনসাধারণ কি আমার কণ্ঠস্বর বুঝিতে পারিবেন? কারণ রোগ শয্যায় দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য আমার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ ও অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

বর্তমানে আমার পক্ষে প্রত্যেকটি প্রশ্নের পরিষ্কার ও সুষ্ঠ উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আমি এইটুকু আপনাকে বলিতে চাই যে, আপনি ১৯৩৭ হইতে ১৯৪৩ সাল পর্য্যন্ত আমার প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ গুলি পাঠ করুন। ঐ অভিভাষণগুলি 'হিন্দুরাষ্ট্র দর্শন' পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ আছে। সব সময় মনে রাখিবেন 'রাজনীতিকে হিন্দু ভাবাপন্ন করণ এবং হিন্দুরাষ্ট্রকে সামরিক শক্তিশালী করণ।'

বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আমি এইটুকু বলিতে চাই যে, ম্যাকমোহন লাইন যদিও বৃটিশ শাসনকালের স্বীকৃত সীমারেখা ছিল তবুও বৃটিশ শাসনের সহস্র বৎসর **পূর্বে** ব্রহ্মপুত্রই আমাদের প্রচলিত সীমারেখা ছিল। **পশ্চিম** প্রান্তে মানস সরোবর ছিল আমাদের প্রচলিত সীমারেখা। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাং এই পথেই ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। **লাদাক হইতে মানস সরোবর** পর্যন্ত ১২৫—১৫০টি মন্দির ও তীর্থস্থান আছে। এই সমস্ত মন্দির ও তীর্থস্থান সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া বহু তীর্থযাত্রী ও বণিকগণ কর্তৃক বিদেশী শাসকদের বাধা নিষেধ সত্ত্বেও ব্যবহৃত হইয়াছে। তীব্বত ভারত ও চীনের মধ্যবর্তী কীলক রাষ্ট্র (Buffer States) রূপে থাকিবে। সবসময় ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দেশের সীমারেখা যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের উপর নির্ভরশীল। আমরা যদি পরাজিত হই অথবা আমাদের সামরিক শক্তি যদি অপ্রতুল হয় তবে হয় ত অবস্থার প্ররিপ্রেক্ষিতে আমাদের শান্তিচুক্তি করিতে হইতে পারে কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা দরকার যে শান্তিচুক্তি অর্থ—সন্ধি নয়। যদি আমরা একের পর এক যুদ্ধে জয়ী হই, তবে আমরা ম্যাকমোহন লাইন বা মানস সরোবরের সীমা অতিক্রম করিয়া পিকিং অভিমুখে অভিযান চালাইব।

স্থির ও দৃঢ়চিত্ত লোকের কাছে অসম্ভব বলিয়া কিছু নাই। ঔরঙ্গজেবের সময় হিন্দুগণ

* উক্ত অধিবেশনে নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক ভি, জি, দেশ-পাণ্ডে।

কর্তৃক আটক জয়ের ধ্বনি বা আমাদের বাল্যকালে সার্বভৌম স্বাধীনতার ধ্বনি হাস্যকর বলিয়া মনে হইত কিন্তু সেই **দুই স্বপ্নই সার্থক** হইয়াছে। আটকের উপর গৈরিক পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল এবং ভারত স্বাধীন হইয়াছে।

পাকিস্তান ও ভারত এই দুইটি দেশ নিজেদের স্বাধীন সদ্ইচ্ছায় কোনদিনই একজাতি হইতে পারিবে না এবং স্বেচ্ছায় উভয় দেশ এক হইতে পারিবে না, কারণ ঐশ্লামিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত পাকিস্থান ভারতের প্রতি কখনো বন্ধু ভাবাপন্ন হইতে পারিবে না। আয়ুব খাঁও আজ ঐ কথাই বলিতেছেন এবং শত শত বৎসর ধরিয়া প্রত্যেকটি মুসলমান শাসকও ঐ কথাই বলিয়াছেন। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া হিন্দু-সাম্রাজ্য হিন্দুত্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত। যদি নেহেরুর দুর্বল নীতির ফলে কাশ্মীর বা দেশের কোন অংশ পাকিস্তানকে উপঢৌকন দেওয়া হয় ও পাকিস্থানের সহিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তবে হিন্দুমহাসভা তাহা মানিয়া লইতে অস্বীকার করিবে। কারণ যদি সমগ্র কাশ্মীরও পাকিস্থানকে দেওয়া হয়, তবু পাকিস্থান তৃপ্ত হইবে না। বরং জিগীর তুলিবে 'হাসকে লিয়া কাশ্মীর লড়কে লেঙ্গে হিন্দুস্থান।'

অন্যান্য রাজনৈতিক প্রশ্নের উত্তরে বীর সাভারকর বলেন, এই সব খুঁটিনাটি লইয়া অভিমত প্রকাশ আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বর্তমানে কোন রাষ্ট্রের সহিত মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিৎ এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন রাষ্ট্রনীতি কখনই স্থিতিশীল অচলায়তন হওয়া উচিৎ নয়। আজ আমরা নিরপেক্ষ আছি, কাল রাষ্ট্রের স্বার্থে আমাদের যে কোন দেশের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে হইতে পারে। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স চিরাচরিত শত্রুতা ভুলিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছে। ইহা আমরা চোখের সামনে দেখিয়াছি। রাষ্ট্রহিত যদি আমাদের বোধ হয় এবং হিন্দুবাদী রাষ্ট্র নীতি যদি আমরা গ্রহণ করি তাহা হইলে এই সব তর্কের অবকাশ থাকিবে না, আমরা আমাদের পথ সহজেই খুঁজিয়া লইতে পারিব। আপনারা রাজনীতিকে হিন্দু দৃষ্টি ভঙ্গি দ্বারা ভাবিত করার চেষ্টা করিয়া যান।"

আজন্ম বিপ্লবী সাভারকর তরুণ বয়সে অর্দ্ধ সসাগরা ধরণীর অধিপতি ইংরাজ শাসকের বুকের পাঁজরা কাঁপাইয়া তুলিয়াছিলেন, যৌবনে অবলীলাক্রমে সন্তরণে সাগর অতিক্রম করিয়া ছিলেন, কিন্তু বার্দ্ধক্যের এমনই দুর্ভাগ্য যে ৮১ বৎসর বয়স্ক সাভারকর স্নানাগারে পড়িয়া গিয়া ২৯শে মে, ১৯৬৩ আঘাত পান ও উরুঅস্থি ভাঙ্গিয়া যায় এবং নার্সিংহোমে চিকিৎসিত হইয়া আরোগ্য লাভ করেন।

৮ই নভেম্বর ১৯৬৩ বীর সাভারকরের পত্নী শ্রীমতী **যমুনা বাঈ সাভারকর** পরলোক গমন করেন।

১৯৬৪ সনের অক্টোবর মাস হইতে কেন্দ্রীয় সরকার বীর সাভারকরের সন্মানার্থ প্রতিমাসে ৩০০্ টাকা প্রদান করিতেন।

১৯৬৫ সালে পাকিস্তান বাহিনী ভারত আক্রমণ করিলে ভারতীয় বাহিনীও পাল্টা আক্রমণ করে। কাশ্মীর আক্রমণকারীদের উচ্ছেদ এবং পাক-আক্রমণ ক্ষমতা ধ্বংস করিবার জন্য ভারতীয় বাহিনী পাকিস্থানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। বীর সাভারকর রুগ্ন শয্যায়

শায়িত থাকিয়াও ভারতের বীর জওয়ানদিগকে অভিনন্দন জানাইয়া বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, পাকিস্থানের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীকে নিয়োগ করিয়া ভারত সরকার উচিৎ কায্যই করিয়াছেন। ভারত সরকারের এই দৃঢ়তায় তিনি উল্লসিত। এই ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য যে যাহাই বলুক ভারত যেন বিনা দ্বিধায় অগ্রসর হয়। ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনী স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে পূর্ণ মাত্রায় সচেতন। দেশবাসীর ঐক্যবদ্ধ সমর্থন তাহাদের পশ্চাতে আছে। তাহারা ভালভাবেই তাহা অবগত আছে। ভারতীয় বাহিনী বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোদ্ধৃবাহিনী ইহা স্মরণ করাইয়া দিয়া বীর সাভারকর বলেন, ভারতীয় বাহিনীর ঐতিহ্য নিশ্চয় তাহারা রক্ষা করিবে।

ভারতীয় জওয়ান তোমরা অগ্রসর হও—জয়লাভ তোমাদের সুনিশ্চিত।'

১৯৬৬ সনের জানুয়ারী বীর সাভারকর তাসখন্দে শাস্ত্রী আয়ুব বৈঠক সম্বন্ধে আশঙ্কা ও সন্দেহ প্রকাশ করিয়া অন্তর্জাতিক ভাবাবেগ ব্যাপারে সর্তক করিয়া শাস্ত্রীজীকে পত্র দেন এবং জাতীয় মর্যাদা, নিরাপত্তা, নিশ্চয়তা ও সততার বিষয় স্মরণ করাইয়া পত্রে উল্লেখ করেন যে, আমাদের বীর জওয়ানেরা বাহুবলে মাতৃভূমির যে অংশ **উদ্ধার** করিয়াছে প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয় তাহা আলোচনা বৈঠকে **বিতরণ** করিবেন না।

১৯৬৬ সনে বীর সাভারকর গুরুতর রূপে অসুস্থ হইয়া পড়েন। ডাঃ আর, ভি, শাথে (বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য) ও ছয় জন খ্যাতনামা চিকিৎসক দুই সপ্তাহ যাবৎ সর্বদা তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থাকিয়া চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তিনি কোন প্রকার চিকিৎসা গ্রহণে সম্মত হন নাই। আমৃত্যু তাঁহার স্মরণ শক্তি প্রখর ছিল। প্রথমে গলা ফুলিয়া উঠে, ফলে বাইশ দিন তিনি সামান্য জল ভিন্ন কিছুই গ্রহণ করেন নাই। ক্রমশঃ মুখমণ্ডলও স্ফীত হইয়া উঠে ফলে জলপান করাও কষ্টকর হয়। ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬ প্রভাত হইতেই সাভারকর-জীর অসুস্থতা বৃদ্ধি পায়। শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট বোধ হয়। চিকিৎসকগণ অক্সিজেন প্রয়োগ করেন, ফলে তিনি খানিকটা সুস্থতা বোধ করেন। কিছুপর অবস্থা পুনরায় খারাপ হইয়া পড়ে। ভারত জননীর অদ্বিতীয় সন্তান বিপ্লবী মহানায়ক বীর সাভারকরের এক মাত্র পুত্র **বিশ্বাস বিনায়ক সাভারকর**, পত্রবধু, **কন্যা প্রভাবতী চিপলাংকর**, নাতি-নাতনী এবং শ্রদ্ধাবনত দেসবাসীর সর্বপ্রেচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া পূর্বাহ্নে ১১-১০ মিনিটে স্বজ্ঞানে দেশ জননীর পাদপদ্মে আত্ম নিবেদন করিয়া মুক্তধামে মহাপ্রস্থান করেন।

'সাথে করে এনেছিলে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।'

* * * *

১৯৬৪ সালে বীর সাভারকর তাঁহার 'উইল'—শেষ অভিপ্রায় পত্র রচনা করেন। সাভারকরজীর মহাপ্রয়াণের পর তাহা প্রকাশিত হয়। বীর সাভারকর আজীবন দেশের সেবা করিয়াছিলেন, দেশবাসীকে ভালবাসিয়াছেন প্রাণ ভরিয়া। তাঁহার হৃদয়বীণার এই অকৃত্রিম সুরই ধ্বনিত হইয়াছে অন্তিম অভিপ্রায় পত্রে। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহার

মৃত্যুতে কেহ যেন শোক প্রকাশের জন্য হরতাল পালন না করেন, ব্যবসা বন্ধ না করেন। তাঁহার মরদেহ দাহনের জন্য কেহ যেন তাহা কাঁধে করিয়া বহন না করে, এমনি কি কোন পশু বাহিত শকটও যেন ব্যবহার না করে; শব বহনের জন্য **যন্ত্র চালিত যান** ব্যবহার করিতে হইবে। কোনপ্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠান ব্যতীত **বৈদ্যুতিক চুল্লীতে যেন দাহ** করা হয়। দাহকালে **বেদ পাঠের নির্দেশ** আছে। শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানাদি পারলৌকিক ক্রিয়াকলাপও নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

বীর সাভারকর কি তাঁহার শেষ অভিলাষপত্রে হিন্দুধর্মাচারের মূলে কুঠারাঘত করিয়াছেন? তিনি ভিতরে বাইরে একই মানুষ ছিলেন না? বীর সাভারকরের অন্তিম ইচ্ছাপত্র পাঠে অনুরূপ নানা প্রশ্ন অনেকের মনেই দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। যুগান্তর পত্রিকায়ও 'যখন রব না আমি মর্ত্যকায়ায়' (১৬ ফাল্গুন ১৩৭২) শীর্ষক সম্পাদকীয় মন্তব্যে বীর সাভারকরের অন্তিম অভিলাষ পত্রের বিশ্লেষণান্তে একটি জিজ্ঞাসার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়..........'কর্মনিষ্ঠ বলিষ্ঠ বস্তুবাদী মানুষের মতো নির্দেশ এগুলি এবং এই জায়গায় সাভারকর........**বিজ্ঞান নির্ভরমানুষ**। হিন্দুমহাসভার সভাপতি ও হিন্দু অভ্যুদয়ের আন্দোলনে আকণ্ঠ নিমগ্নরূপে যে মানুষটিকে আমরা জানতাম, ইনি কি সেই মানুষই?' বিপ্লবী সাভারকর **বস্তুবাদী, বিজ্ঞানধর্মী ও হিন্দুজাতীয়তাবাদের মহাভাষ্যকার**। বীর সাভারকর মানুষকে ভাল বাসিতেন। শব বহনকারীর কষ্ট লাঘবের জন্যই হয়ত তিনি যন্ত্রচালিত যানে তাঁহার শব বহনের নির্দেশ দিয়াছেন, ইহা তাহার উদার মানবিকতা। বিদ্যুৎ চুল্লীতে দেহদহনের নির্দেশ দিয়াছেন হয়ত এই জন্যই যেন তাঁহার চিতাভষ্মের উপর কোন স্মৃতি সৌধ নির্মিত হইতে না পারে। নামযশ মোহমুক্ত পুরুষের পক্ষেই অনুরূপ নির্দেশদান সম্ভব। বীর সাভারকর একাধারে **বিপ্লবধর্মী** এবং **হিন্দুত্বের মহাধ্যানী**, তাঁহার এই অকুণ্ঠ ধ্যান নিষ্ঠার পরিচয় শবদহনকালে বেদপাঠের নির্দেশনায়। বীর সাভারকর তাঁহার মৃত্যুজনিত হরতাল বা কর্মবিরতি না করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। অনুরূপ কর্মবিরতিতে জনগণেরই ক্ষতি হয়। কোনপ্রকার **জাতীয় ক্ষতি সাভারকরজীর ছিল অসহনীয়**। তাঁহার এই অতুলনীয় দেশ হিতৈষণা এবং অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব গভীর ধ্যান ধারণার বিষয়। কিন্তু ইদানিং মৃত্যু জনিত কর্মবিরতির হিড়িকের মধ্যে সেই ধ্যান ধারণার অবকাশ আছে কি? পিণ্ডদানাদি পারলৌকিক নির্দেশনায় বলিতে পারা যায় আজন্ম বিপ্লবী বীর সাভারকর সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে ইহলৌকিক প্রতি পদক্ষেপে বিপ্লব বহ্নিমশাল দৃঢ় হস্তে যেমন ধারণ করিয়াছিলেন, তেমনই জীবন মৃত্যুর সীমারেখায় দাঁড়াইয়া সমুন্নত শিরে পারলৌকিক ক্রিয়াকলাপেও দিয়াছেন বৈপ্লবিক পরিচয়। বিপ্লবী আত্মশক্তিতে বলীয়ান, কর্মশক্তিতে বিশ্বাসী। আদর্শ বিপ্লবী যে কালকৌলিন্যমণ্ডিত ধর্মীয় গণ্ডীর ঊর্দ্ধে, বীর সাভারকর তার চির উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখিয়া গেলেন। তরুণ সাভারকর অনুগামীগণের জয়ধ্বনি ছিল—**'স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্মী কি জয়'**। বিনায়ক দামোদর সাভারকর মানুষটির যাঁহারা পরিচয় পাইয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহাকে স্বাতন্ত্র বীর

নামে অভিহিত করিতেন। বিদগ্ধ বন্দী বিপ্লবী মহানায়ক বীর সাভারকরের অন্তিম অভিলাষ পত্রও এক স্বাতন্ত্র্য আলোকপাত।

বিশ্বের বর্ষীয়ান বিপ্লবী, বীর সাভারকরের মহাপ্রয়াণে এক শোক বাণীতে রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বলেন যে, শ্রীসাভারকর ছিলেন প্রবীণতম বিপ্লবীদের মধ্যে অন্যতম, যিনি অভিনব উপায়ে বন্দীদশা হইতে মুক্ত হইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি ধীর ও অক্লান্তভাবে কাজ করিয়াছেন এবং তাঁহার দৃষ্টান্ত বহু যুবককে পুরা কাহিনীর ন্যায় অনুপ্রাণিত করিয়াছে। শেষ বয়সে তিনি অবসর জীবন যাপন করিতেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বীর সাভারকরের স্মৃতির উদ্দ্যেশে শ্রদ্ধা জানাইয়া বলেন যে, বীর সাভারকরের নাম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীদের মুখে মুখে উচ্চারিত হইত এবং তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া বহুলোক অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বর্তমান ভারতের এক মহৎ ব্যক্তির তিরোধান হইল।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীচ্যবন বীর সাভারকরের পুত্র বিশ্বাস দামোদর সাভারকরের নিকট প্রেরিত শোকবাণীতে বলেন, বীর সাভারকরের মৃত্যুতে দেশ হারাইয়াছে একজন প্রবীণ স্বাধীনতা যোদ্ধাকে যিনি বৃটিশ শাসকবর্গকে উপেক্ষা করিয়াছেন এবং দেশের জন্য যথেষ্ট নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন।

উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ জাকির হোসেন তাঁর শোকবাণীতে বলেন যে, শ্রীসাভারকর তরুণ সম্প্রদায়কে দেশের মুক্তি সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক সংবাদপত্র সমূহও বীর সাভারকরের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। যুগান্তর (১৫ই ফাল্গুন, ১৩৭২) পত্রিকায় প্রকাশিত 'মৃত্যুতেও অমর বীর বিপ্লবী সাভারকর' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধ উদ্ধৃত হইল ঃ—'প্রায় শতাব্দীকালের চাঞ্চল্যকর জীবনের বহুকর্মকীর্তি পশ্চাতে রেখে বীর বিপ্লবী সাভারকর দেহ ত্যাগ করেছেন। ভারতের মুক্তি সংগ্রামী হিসাবে, বিপ্লবের ইতিহাসের চলমান উল্কারূপে ও নিজ আদর্শ অনুযায়ী দেশ প্রেমের দীপ্তিতে বীর সাভারকর অবিস্মরণীয়। সত্যকার বীর তিনিই, প্রতিপক্ষও যাঁর সাহস ও শৌর্যের নিকট মাথা নত করে। এই সাহস ও শৌর্যই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। জীবন মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে বিরামহীন সংগ্রামের যে পদচিহ্ন তিনি রেখে গিয়েছেন তা শিলালিপির মতোই চিরস্মরণীয়। দীর্ঘকাল ধরে মৃত্যুর সঙ্গেও তাঁর দিনের পর দিন সংগ্রামের দিনপঞ্জী বিস্ময়কর। ভারতবাসী মাত্রেই তার মৃত্যু সংবাদে মর্মাহত।

জাতীয় মুক্তির জন্য যাঁরা অগ্নিযুগের সৃষ্টি করেছিলেন, বীর সাভারকর তাঁদের অন্যতম। ১৯০৪-৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর যে কোন উপায়ে স্বাধীনতা লাভের জন্য 'অভিনব ভারত' প্রতিষ্ঠান গঠন ও লণ্ডনে 'ফ্রি ইন্ডিয়া সোসাইটির' মাধ্যমে সশস্ত্র বিপ্লবের উদ্যোগ আয়োজন, ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউটে তাঁর অনুচর মদনলাল ধিংড়ার স্যার কার্জন উইলির হত্যা, নাসিকে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট জ্যাকসন নিধন, ইত্যাদি ঐতিহাসিক কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। এইসব ঘটনা উপলক্ষে ইংল্যাণ্ডে সাভারকরের গ্রেপ্তার ও জাহাজ যোগে ভারতে প্রেরণের পথে

মার্সাই-এ জাহাজ থেকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে গুলীবর্ষণের মধ্যেও পলায়ন ও পুনরায় গ্রেপ্তার কাহিনী, গোয়েন্দা কাহিনী অপেক্ষাও চাঞ্চল্যকর। তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ, আন্দামানে সুদীর্ঘকাল যাপনের পরে নাসিকের জেলে অবস্থান ও মুক্তিলাভ সবই চাঞ্চল্যকর। যে স্বাধীনতা লাভের জন্য তিনি জীবনপণ করেছিলেন, সেই স্বাধীনতা-সংগ্রাম যে দিন সফল হল, সেই দিন তিনি ভারত বিভাগের জন্য খুশী হতে পারেন নি। অখণ্ড ভারতকে খণ্ডিত ও বিভক্ত করার জন্য যাঁরা আন্তরিকভাবে রুষ্ট হয়ে ছিলেন, বীর সাভারকরের নাম তাঁদের সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত। মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের মামলায় তাঁকে আসামী হিসাবে দাঁড়াইতে হলে তিনি যে ৫২ পৃষ্ঠা ব্যাপী বিবৃতি পাঠ করে ছিলেন তাও এক আন্তরিকতার দলিল হয়ে আছে। আত্মারামের বিচারে তিনি মুক্তি লাভ করেছিলেন।

"বীর সাভারকরের জীবন বহু অধ্যায়ে বিভক্ত। কিন্তু বিপ্লব ও সংগ্রামই তাঁর সারা জীবনের মর্মবাণী। স্বাধীনতা আন্দোলনে অগ্নিযুগের অবিস্মরণীয় বীর নায়ক হলেও হিন্দুমহাসভার সভাপতি হিসাবেই পরবর্তী জীবনে তাঁর কর্মকীর্তি অধিক পরিচিত হয়েছে। সেখানেও জাতিভেদের অবসানের জন্য, হরিজনদের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি নিরলসভাবে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। বিপ্লব ও সংগ্রামই ছিল তাঁর 'যৌবনের স্বপ্ন ও বার্ধক্যের বারাণসী।' তাঁর যত রচনা, যত পুস্তক পুস্তিকা তাঁর অধিকাংশই বিপ্লবের জয় গান অথবা জাতীয়তার জয়ধ্বনি। আন্দামান জেলে বসে তিনি মারাঠিতে পানিপথের যুদ্ধ পদ্যে লিখেছিলেন, কাগজ কলম না পেয়ে দেয়ালে দাগ কেটে লিখে মুখস্থ করে নিয়েছিলেন।

"বক্তৃতায় অনর্গল দ্রুতভাষী, রচনায় ভাষণে স্পষ্টবাদী, ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষায়, সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে চির-অগ্রনী বীর সাভারকরের মৃত্যু, ভীরু মানুষকে ভয়মুক্ত হওয়ার পথ নির্দেশ করছে। এই কথাই বারে বারে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, নিজের জ্ঞান, বিশ্বাস ও আদর্শ নিয়ে মানুষ যদি চলতে পারে, তবে সম্মুখে-সমরে জয়ের করতালি বা সম্মানের মানভূষণ প্রাপ্তি না ঘটলেও, তাঁর প্রতি অগণিত লোকের শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্ঘ্য নিবেদনের অভাব কখনো হয় না। বীর সাভারকর শত্রু মিত্র নির্বিশেষে সকলের বিস্ময় মিশ্রিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন।

"মৃত্যু জীবনের অবশ্যম্ভবী পরিণতি হলেও বিপ্লবী জীবনের এই অবসানে ভারতের চারিদিকে যে ধ্বনি প্রতিধ্বনি জাগতে থাকেব সে ধ্বনি ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ! অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে জীবনপথের শত বাধার সংগ্রামে নির্ভীকতাই জয়যুক্ত।"

আনন্দবাজার পত্রিকায় (১৬ই ফাল্গুন ১৩৭২) সম্পাদকীয় শ্রদ্ধাঞ্জলি ঃ—

'বিনায়ক দামোদর সাভারকরের নাম আধুনিক ভারতে ইতিহাসের প্রথম পাতায় জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত, একালের তরুণরা তাঁহাকে প্রায় ভুলিয়া বসিয়াছে, একালের রাজনীতিকরাও বীর সাভারকরকে যতদূর সম্ভব এড়াইয়া গিয়াছে। উপেক্ষা অথবা অবহেলা কোন কিছুই এই অমিতবীর্য বিপ্লবী নায়কের আদর্শ নিষ্ঠা এবং আত্মবিশ্বাসকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। এককালের সংগ্রামী ভারতীয় তরুণের নিকট প্রত্যক্ষ আদর্শ স্বরূপ বীর সাভারকর ছিলেন

অকুত ভয় ক্ষাত্রশক্তির ঋত্বিক ও পথিকৃৎ। বিগত শতাব্দীর শেষভাগে কংগ্রেস যখন কেবল হাঁটি হাঁটি পা, পা,' বিদেশী প্রভুদের কাছে দরবারের জন্য আবেদন নিবেদনের থালা সাজাইতে ব্যস্ত তখন মহারাষ্ট্রের এই বীর সন্তানই সর্বপ্রথম অভিনব ভারতের অগ্নিমন্ত্র সাধনে সংকল্পিত। সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের মদমত্ত ভ্রূকুটিতে ভয় নাই; মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা-লড়িবার সুযোগ দিয়াছেন বিনায়ক দামোদর সাভারকর পথও দেখাইয়াছেন তিনিই; মহারাষ্ট্র হইতে বাঙ্গলা দেশ পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে সাভারকরের বৈপ্লবিক সংগ্রামের অসীম সাহসিক আয়োজন ও উদ্যম। সংগ্রাম ভীরুতা ছিল তখনকার কালের নিস্তরঙ্গ জাতির জীবনের সবচেয়ে বড় অভিশাপ। এই অভিশাপ ঘুচাইতে সাভারকরের 'অভিনব ভারত'-এর লণ্ডনে ও পুণায় বজ্রনির্ঘোষে যে চমক লাগাইয়াছিল আধুনিক ভারতের জন্মকথায় তাহার মূল্য অবিস্মরণীয়। সশস্ত্র ব্রিটিশ প্রহরায় লৌহ শৃঙ্খলে বন্দী সাভারকরের সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ফ্রান্সের মার্সাই বন্দরে আশ্রয় লাভের চেষ্টাও নিতান্ত একটি রোমাঞ্চকর ঘটনা মাত্র নয়, শিবাজীর আদর্শানুসারী—বীর সন্তানের অসামান্য সাহসিকতার নিদর্শন। বিদেশী শাসকের বিচারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, আন্দামানে চরম নিগ্রহ কিছুই এই দৃঢ় চরিত্র বীর শ্রেষ্ঠকে ভাঙ্গিতে বা নোয়াইতে পারে নাই। কেবল সংগ্রামে নয়, স্পষ্ট কথনে স্বচ্ছ স্বাধীন চিন্তাতেও বীর সাভারকর অনন্যসাধারণ। পূর্ণ স্বাধীনতার বাণী প্রচারে, ক্ষাত্র শক্তির উদ্বোধনে তিনিই অগ্রগণ্য। তাঁহার রচনাবলীও সে দিক দিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক সম্পদ! পেশাদার রাজনীতি, সুবিধাবাদী আপস মনোবৃত্তি অথবা শৌখীন প্রগতিবাদ বীর সাভারকরের জীবনে ও মননে স্থান পায় নাই এবং সেই জন্যই তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত অদ্বিতীয় নিঃসঙ্গচারী, তবু ভারতের রাজনৈতিক গগনে ধ্রুব নক্ষত্রের মতই তাঁহার দীপ্তি। পরিণত বয়সে তাঁহার জীবন দীপ নিভিলেও তাঁহার চারিত্র্যধর্ম এবং অমেয় কীর্তির নিকট দেশবাসী সকলেই শ্রদ্ধায় নতশির হইবে।"

জন্মগত অধিকারেই জাতীয়তা অর্জিত হইতে পারে না। যে জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্যে জাতীয়তা বিধৃত তাহা অনুশীলন দ্বারা আত্মস্থ করা প্রয়োজন। স্বদেশীয়গণকে সংহত, বলিষ্ঠ, ঐক্যবদ্ধ মহাজাতিরূপে উদ্বুদ্ধ করাই বীর সাভারকরের জীবন সংগ্রাম। কবিগুরুর ভাষায়—

'যে তপস্যা সত্য তারে কেহ বাধা দিবেনা ত্রিদিবে,
নিশ্চয় তা জানি'

বন্দেমাতরম্।

সংযোজন -১

দেশভাগের অপরাধীরা

পবিত্রকুমার ঘোষ

(বীর বিপ্লবী সাভারকরকে নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মণিশংকর আয়ারের সাম্প্রতিক বক্তব্যে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। সত্যিই কি ভারত-ভাগের জন্য দায়ী ছিলেন বীর সাভারকর? সে সম্পর্কেই আলোকপাত করা হয়েছে আজকের এই 'বিশেষ নিবন্ধ'টিতে।-সম্পাদকীয় বিভাগ)

ভারত ভাগের জন্য দু'জন ব্যক্তিকে সমানভাবে দায়ী করেছেন মণিশংকর আয়ার। এই দু'জন মহম্মদ আলি জিন্না এবং বিনায়ক দামোদর সাভারকর। দু'জনই ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। কিন্তু দেশভাগের সঙ্গে জিন্নার নামটি যেভাবে জড়িয়ে আছে, সাভারকরকে আজ পর্যন্ত কোনও ঐতিহাসিকই সেভাবে জড়াননি। মণিশংকর ঐতিহাসিক নন। তিনি রাজনীতি করেন। সেই সুবাদে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হয়েছেন। শুধু মন্ত্রিত্বের গৌরবে তিনি ইতিহাস সম্পর্কে রায় দিতে বসেছেন।

সাভারকর অল্প বয়সেই বিপ্লবী হয়েছিলেন। ভারতের প্রথম তিন শহিদ, তিন ভাই, **দামোদর চাপেকর, বালকৃষ্ণ চাপেকর** এবং **বাসুদেব চাপেকর** ছিলেন সাভারকরের তিন শিষ্য। ১৮৯৮-৯৯ সালে ওই তিন ভাইয়ের ফাঁসি হওয়ার পর মহারাষ্ট্রে বৈপ্লবিক কাজকর্ম চালাতে অসুবিধা হতে থাকায় সাভারকর লন্ডনে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর শিষ্য **মদনলাল খিংড়া** ইংরেজ রাজপুরুষ উইলিয়াম কার্জন ওয়াইলিকে গুলি করে হত্যা করেন। মদনলালের ফাঁসি হয়। সাভারকর ধরা পড়েন। বিচারের জন্য তাঁকে ভারতে পাঠানোর সময় মার্সেইয়ে জাহাজ থেকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে পালিয়ে যান। কিন্তু আবার ধরা পড়েন। বিদেশে ভারতীয় ছাত্র ও বিপ্লবীদের সংগঠিত করে সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি। তিনি আবার ধরা পড়ার পর দীর্ঘকাল আন্দামানের সেলুলার জেলে কাটিয়েছিলেন। তিনিই বিশ্বের প্রথম বিপ্লবী, যাঁর বিচার হয়েছিল হেগের আন্তর্জাতিক আদালতে।

সাভারকর তাঁর বৈপ্লবিক জীবন শুরু করেছিলেন **অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন নিয়ে**। অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন নিয়েই তিনি জীবন শেষ করেছেন। তাঁর জীবদ্দশায় ভারত খণ্ডিত হয়েছিল। কিন্তু **'অখণ্ড ভারত অমর রহে'** ধ্বনি বরাবরই ছিল তাঁর অনুগামীদের কণ্ঠে।

তাহলে ভারত ভাগের জন্য দায়ী ছিল কারা? সোশ্যালিস্ট নেতা রামমনোহর লোহিয়া Guilty Men of India's Partition নামে একটি বই লিখেছিলেন। দেশভাগের আগে লোহিয়া ছিলেন জওহরলালের অন্তরঙ্গ সহকর্মী, দু' জনই এলাহাবাদের লোক। জওহরলাল তাঁর মনের গোপন চিন্তাগুলিও লোহিয়াকে বলতেন। ভারত ভাগের ষড়যন্ত্রে জওহরলালের অন্যতম প্রধান ভূমিকার কথা লোহিয়া লিখে গিয়েছেন।

সাভারকর সে সময় রাজনীতিতে প্রান্তিক মানুষ হয়ে গিয়েছেন। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের জয়জয়কার হয়েছিল। জওহরলাল অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। সেই অবস্থাতেই মাউন্টব্যাটেন ভাইসরয় হয়ে ভারতে এসেছিলেন। বিজয়ী মুসলিম লিগের নেতা **জিন্না**, কংগ্রেস নেতা **জওহরলাল**, সর্বোপরি **মাউন্টব্যাটেন ভারতের বুকে ছুরি** বসিয়েছিলেন।

সে সময় সাভারকর ক্ষমতার ধারেকাছেও ছিলেন না। রাজনীতিতে তিনি তখন পরিত্যক্ত। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে সাভারকরের দল হিন্দু মহাসভা হেরে ভূত হয়েছিল। সেই সময় ওই দলের সবচেয়ে সম্ভাবনাপূর্ণ নেতা ছিলেন **শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়**। তাঁরা ভারত ভাগ করে পাকিস্তান সৃষ্টির ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন-জওহরলাল-জিন্না চক্র যখন পাকিস্তান সৃষ্টির সিদ্ধান্ত পাকাপাকিভাবে নিয়ে ফেলেছিলেন সে সময় প্রস্তাবিত পাকিস্তানকে খণ্ডিত করে পূর্ব পঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গকে ভারতভুক্ত করার জন্য সফল আন্দোলন করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ।

মুসলিম লিগের পাকিস্তান দাবির সমর্থনে প্রকাশ্য আন্দোলন করেছিল অবিভক্ত কমিউনিষ্ট পার্টি। মুসলিম লীগ দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান চেয়েছিল। তাদের মনে, হিন্দু ও মুসলমান দু'টি আলাদা জাতি, অতএব তাদের জন্য দু'টি পৃথক রাষ্ট্র প্রয়োজন। কমিউনিষ্ট পার্টি এই মতকে তো সমর্থন করেছিলই, উপরন্তু তারা আরও ভয়ঙ্কর মতের আমদানি করেছিল। তারা বলেছিল, ভারত বহুজাতির দেশ। এই বহুজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতকে টুকরো টুকরো করে ফেলাও সম্ভব। সৌভাগ্যবশত, এই বহুজাতিতত্ত্ব কল্কে পায়নি।

ভারত ভাগের জন্য জিন্না-জওহরলাল-মাউন্টব্যাটেন চক্রের সহযোগীরূপে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির নেতা **পি সি যোশি** এবং সে সময়ের উঠতি নেতা **জ্যোতি বসু** সোচ্চার ছিলেন। **জ্যোতি বসু পাকিস্তানের দাবিতে সুরাবর্দিকে সহচর্য** দিয়েছিলেন।

তবে ভারত ভাগ হঠাৎ হয়নি। সেজন্য চতুর ইংরেজ বীজ বুনেছিল ১৯০৫ সালে বাংলা ভাগ করে। সে সময়ই পূর্ববঙ্গকে আলাদা একটি মুসলিম প্রদেশ করা হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে একান্তভাবে হিন্দুর আন্দোলনরূপে দেখিয়া মুসলিমদের স্বার্থরক্ষায় ঢাকার নবাব বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মুসলিম লিগ।

মুসলিম লিগ বরাবরই ছিল ইংরেজ সরকারের **কোলাবোরেটর**। ১৯৪২ সালে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিও ইংরেজ সরকারের **কোলাবোরেটর** হয়ে দাঁড়ায়। এই দুই কোলাবোরেটর পার্টি পাকিস্তানের দাবিতে হাত মিলিয়েছিল, কেননা ইংরেজরা তা-ই চেয়েছিল।

ব্রিটিশ শক্তি দেশভাগের বীজ বুনেছিল ১৯০৯ সালে **মর্লে-মিন্টো** শাসন সংস্কার আইন পাশ করে। ওই আইনে হিন্দু ও মুসলিমদের জন্য **পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা** করা হয়েছিল। দ্বিজাতিতত্ত্ব ছিল ওইভাবে উপ্ত বীজের **অঙ্কুরোদ্গম**।

দ্বিজাতিতত্ত্ব ও পাকিস্তান প্রস্তাবের প্রথম প্রচারক জিন্না নন। ১৯১৭ সালে স্টকহোমে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট কনফারেন্সে ভারতের দুই প্রতিনিধি **আবদুল জব্বার** এবং **আবদুল সাত্তার** ভারতে মুসলমানদের জন্য আলাদা বাসভূমির প্রস্তাব পেশ করেন।

১৯২১ সালে খিলাফত আন্দোলনের সময় নাদির আলি বই লিখে বলেন, ভারত ভাগ করাই হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়। ১৯২৪ সালে মৌলনা মহম্মদ আলি আলিগড়ে ঘোষণা করেন: হিন্দু-মুসলিম সমস্যা না মিটলে ভারতবর্ষ হিন্দু ভারত ও মুসলিম ভারতে বিভক্ত হবে।

এইসব ব্যক্তিগত মতামতের বদলে ১৯৩০ সালে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত মুসলিম লিগের অধিবেশনে স্যার মহম্মদ ইকবাল মুসলিম হোমল্যান্ড প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাঁর প্রস্তাব মতো এই হেমল্যান্ডগঠিত হবে পঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ, সীমান্ত প্রদেশ ও বালুচিস্তানকে নিয়ে। এগুলি নিয়েই হয়েছে এখনকার পাকিস্তান রাষ্ট্র।

এই সময় পর্যন্ত জিন্না মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের কথা ভাবেননি। তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী। তিনি তখনকার কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলিম কেন্দ্র থেকে বরাবর নির্বাচিত হয়েছেন, কিন্তু খিলাফত আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি মনে করতেন, খিলাফত আন্দোলনের ফলে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা শক্তিশালী হবে। গান্ধীজির সঙ্গে এ বিষয়ে মতপার্থক্য হওয়ায় ও গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন না করায় জিন্না কংগ্রেস ত্যাগ করেন। তিনি ভারত ছেড়ে বিলেতে চলে গিয়েছিলেন ও সেখানেই ব্যারিস্টারী করছিলেন। ভারতের রাজনীতিতে তিনি আর জড়াবেন না বলে স্থির করেছিলেন।

কিন্তু ১৯৩৩ সালের জানুয়ারিতে চৌধুরি রহমত আলি নামে কেমব্রিজে পাঠরত এক ভারতীয় ছাত্রকে দিয়ে ব্রিটিশ সরকার পাকিস্তানের পরিকল্পনা লন্ডনে গোল টেবিল বৈঠকে পেশ করায়। কবি ইকবাল চেয়েছিলেন মুসলিমদের জন্য **হোমল্যান্ড**। রহমত আলির প্রস্তাব ছিল **স্বতন্ত্র পকিস্তান রাষ্ট্র।**

লন্ডনে বস-বাসকালে ব্রিটিশ রাজশক্তিই জিন্নাকে পাকিস্তানের দাবি জানাতে মন্ত্রণা দেয়। মুসলিম লিগের নেতারাও তাঁকে রাজি করান দেশে ফিরে গিয়ে লিগকে নেতৃত্ব দিতে। জিন্না ব্রিটিশের সঙ্গে বোঝাপড়া করেই ভারতে ফিরে আসনে। তিনি মুসলিম লিগের প্রেসিডেন্ট হন।

সুভাষচন্দ্র বসু তিনের দশকে কয়েক বছর ইউরোপে থাকার সময় বুঝতে পেরেছিলেন, ব্রিটিশ সরকার ভারত ভাগের ষড়যন্ত্র করছে। তিনি ইউরোপে থাকতেই খবর পান,১৯৩৮ সালের জন্য তিনি কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। দেশে ফিরে কংগ্রেসের সভাপতি হওয়ার পর ১৯৩৮ সালের মে থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত জিন্নার সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসার জন্য তিনি চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু জিন্না দাবি করেন, ভারতের মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিরূপে মুসলিম লিগকেই স্বীকার করে নিতে হবে। সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, এই দাবি স্বীকার করা সম্ভব নয়, কেননা কংগ্রেস হিন্দু ও মুসলমানকে আলাদারূপে দেখে না। কংগ্রেস **সমগ্র জাতির প্রতিনিধি।** "কংগ্রেস মাত্র একটি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বলে নিজেকে মনে করে না ও সেভাবে কাজ করতে পারে না। তার দরজা অনিবার্যভাবে সব সম্প্রদায়ের জন্য খোলা থাকবে। কংগ্রেস একটি সাম্প্রদায়িক সংগঠনে পরিণত হতে পারে না।"—জিন্নাকে লেখা সুভাষচন্দ্রের চিঠি, ২৪ মে ১৯৩৮।

কিন্তু কংগ্রেসকে হিন্দু সংগঠনের বেশি মর্যাদা দিতে জিন্না কিছুতেই রাজি হননি। তাই সুভাষ-জিন্না পত্রালাপ ভেস্তে গিয়েছিল। ঘটনার গতি কোন দিকে এগোচ্ছে তা বুঝতে সুভাষচন্দ্রের একটুও অসুবিধা হয়নি। জিন্নার জিদের পিছনে যে ব্রিটিশের নির্দেশ আছে তাও তিনি জানতেন।

দেশ ছেড়ে যাওয়ার আগে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য তাঁর শেষ প্রচেষ্টা ছিল হলওয়েল মনুমেন্ট আন্দোলন পরিচালনার মাধ্যমে। দেশ থেকে চলে যাওয়ার পর ভারতের বাইরে তিনি **আজাদ হিন্দ সরকার** ও ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি গড়েছিলেন **হিন্দু-মুসলমান-শিখের মিলিত সংগঠন ও শক্তিরূপে।**

কিন্তু এসবের আগেই ১৯৪০ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লিগের অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়ে গিয়েছে। ওই প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, ভারতের উত্তর-পশ্চিমে ও পূর্বে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলিকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে গঠন করতে হবে।

১৯৪৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বর সম্প্রচারিত বেতার ভাষণে নেতাজী বলেছিলেন "I vehemently oppose the Pakistan scheme for the vivisection of our motherland." ওই একই বক্তৃতায় তিনি আরও বলেছিলেন: "কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ একটা বোঝাপড়ায় আসতে চাইছে যাতে তারা ব্রিটেনের সঙ্গে আপস চাইছে যাতে তারা ব্রিটেনের সঙ্গে আপস চুক্তিতে পৌঁছাতে পারে। সেজন্য কংগ্রেসের যে নেতারা ব্রিটিশের সঙ্গে আপস চান তাঁরা পাকিস্তান নামক তিক্ত বটিকাটি গলাধঃকরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু আপস নয়, ব্রিটিশ শক্তিকে ভারত থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে।" নেতাজীর ওই ভাষণের শেষ কথাটি ছিল: "Our devine motherland shall not be cut up."

কংগ্রেস ওপরে-ওপরে ভাব দেখিয়েছিল,তারা পাকিস্তান চায় না। কিন্তু জওহরলাল প্রমুখ নেতারা তখন ক্ষমতা-পাগল হয়ে গিয়েছেন। যে কোনও মূল্যে তাঁদের ক্ষমতা চাই—সেজন্য পাকিস্তানের দাবি মেনে নিতে হলেও। গান্ধীজি ততদিনে অসহায় হয়ে পড়েছেন। তাঁর কথা জওহরলাল শোনেন না।

জওহরলালের প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ প্রণেতা এস গোপাল লিখেছেন: "জওহরলাল এবং প্যাটেল এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, দেশ ভাগ ছাড়া উপায় নেই। ...জওহরলাল ও কংগ্রেস সিদ্ধান্ত করলেন, দ্বিজাতিতত্ত্ব না মানলেও দেশভাগ তাঁরা মেনে নেবেন।" (জওহরলাল নেহরু, আ বায়োগ্রাফি, ভল্যুম ১, পৃঃ-৩৪৫)।

এমন সময়েই ভাইসরয়ের দায়িত্ব নিয়ে মাউন্টব্যাটেন এসেছিলেন। তিনি পাকিস্তান যাতে দ্রুত হতে পারে সেজন্য চাপ দিতে লাগলেন। এস গোপাল লিখেছেন: "দেশভাগের কাজটি যাতে ঠিকভাবে করা যায় সেজন্য জওহরলাল **পুরোপুরি সুযোগ** করে দিলেন মাউন্টব্যাটেনকে।" (পূর্বোক্ত বই,পৃঃ-৩৪৬)

গান্ধীজি যতই বেদনার্ত হন, **ভারত ভাগে বাধা দেননি**। কংগ্রেসের যে বৈঠকে পাকিস্তান প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়া হয়েছিল সে বৈঠকে গান্ধীজিও **উপস্থিত** ছিলেন। তিনি ওই বৈঠকে **পাকিস্তান প্রস্তাবে সম্মতি** জানিয়েছিলেন।

এসবের মধ্যে সাভারকরের স্থান কোথায় ছিল? সে সময় ক্ষমতার পাশা নিয়ে খেলছিলেন তিনজন—মাউন্টব্যাটেন, জওহরলাল এবং জিন্না। সাভারকর কোনও দিন ক্ষমতার কাছাকাছিও যাননি। ১৯৪৭ সালে ইতিহাসকে প্রভাবিত করার কোনও সামর্থ্যই সাভারকরের ছিল না।

তবু দেশভাগের জন্য তাঁকেই দায়ী করেছেন মণিশংকর আয়ার। জওহরলাল নির্দোষ। কংগ্রেস নেতৃত্ব নির্দোষ। দেশভাগ করে যাঁরা ক্ষমতা হাতে পেলেন তাঁরা সবাই নির্দোষ। **সারা জীবন যিনি অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছেন তিনিই দোষী।**

সাভারকরের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি হিন্দুত্ব প্রচার করেছিলেন। কী এই হিন্দুত্ব? ১৯২১ সালে রত্নগিরি কারাগারে বসে সাভারকর 'হিন্দুত্ব' নামে একটি বই লিখেছিলেন। হিন্দুত্ব সম্পর্কে তাঁর ধারণা ওই বইয়েই স্থায়ীভাবে নথিভুক্ত হয়েছিল।

তাতে তিনি লিখেছিলেন: হিন্দুত্ব ও হিন্দুইজম এক কথা নয়। "হিন্দুত্ব শব্দের সংজ্ঞা ধর্মগত দিক থেকে নির্ণয় করা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়" (হিন্দুত্ব, পৃঃ-১৪২)। যারা সিন্ধু নদীর এপারে-ওপর বাস করে, ভারতবর্ষকে পিতৃভূমি ও পণ্যভূমি মনে করে তারাই হিন্দুত্বের অধিকারী। "যখন হিন্দুত্বের শ্রেষ্ঠ শিখরে আরোহণ করবেন,তখন ধর্মীয় ও আঞ্চলিক সংকীর্ণতা তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র থাকবে না। শঙ্করের ন্যায় সমগ্র বিশ্বকে বারাণসী তীর্থক্ষেত্রে মনে করবেন—'বারাণসী মেদিনী!' অথবা তুকারামের ন্যায় স্বদেশের সীমারেখা ত্রিভুবনের পরিধি পর্যন্ত বিস্তৃত বলে মনে করবেন। বলবেন "আমুচা স্বদেশ, ভুবনত্রয় মধ্যে বাস।" (হিন্দুত্ব, পৃঃ-১৬৫)

এই ব্যক্তি দেশভাগ চেয়েছিলেন? তিনি জিন্নার সঙ্গে সমভাবে দেশভাগের জন্য দায়ী? আর জওহরলাল বেকসুর খালাস! মণিশংকরের এই অত্যাশ্চর্য সিদ্ধান্তে কোনও বিচারশীল মানুষ সায় দেবেন না।

দৈনিক বর্তমান (৩.৯.২০০৪) এর সৌজন্যে।

সংযোজন -২

দেশবিভাগের দায় সাভারকরের ওপর চাপে কী করে

নির্মলেন্দুবিকাশ রক্ষিত

সম্প্রতি একজন বড় কংগ্রেস নেতা দেশবিভাগের ব্যাপারে বীর সাভারকরকে অন্যতম প্রধান আসামী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি কাচের ঘরে থেকে বাইরে ঢিল মারেন না। এক্ষেত্রে কিন্তু সেটাই ঘটেছে। আসলে, জ্যোতি বসু প্রমুখ বহু নেতা বহু সময় বলেছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ঠিকমতো লেখা হয়নি। কিন্তু মুশকিল হল,

নেতারাই যদি ইতিহাস লেখা ও ব্যাখ্যা শুরু করেন, তাহলে ইতিহাস কিন্তু আর ইতিহাস থাকবে না।

দেশভাগের ব্যাপারে আসলে তিনটে পক্ষ ছিল। কংগ্রেস, মুসলিম লিগ ও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ। অবশ্য তখন ছোট দল হলেও কমিউনিষ্ট পার্টিরও এই ব্যাপারে অংশ ছিল। প্রবীণরা বলেন, তখন দাঙ্গাবাজ মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দির পাশে মিটিংয়ে কোনও কোনও কমিউনিষ্ট নেতাকেও দেখা গিয়েছে। ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন, মুসলিম লিগ দেশভাগ চেয়েছে, আর কমিউনিষ্ট দলের ছাত্র ফেডারেশনের হীরেন মুখোপাধ্যায়, কে এম আসরফ প্রমুখ তরুণ নেতারা জানিয়েছেন ভারতবর্ষ হল একটা বহু জাতির দেশ—সেই জন্য এটাকে স্বেচ্ছামূলক ফেডারেশন করা উচিত (ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, পৃঃ-২৩২-৩৩)। ওভারষ্ট্রিট-উইণ্ডমিলারও ওই দলের নীতি সম্পর্কে এই ধরনের মন্তব্য করেছেন (কমিউনিজম ইন ইণ্ডিয়া, পৃঃ-১৮৮)।

একটা কথা মনে রাখতে হবে, সেই সময় বীর সাভারকর আদৌ ভারতীয় রাজনীতিতে কোনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিলেন না। তাঁর দল 'হিন্দু মহাসভা'ও না। লক্ষ্য করুন, ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরে যে সাধারণ নির্বাচন হয়, তাতে হিন্দু এলাকায় কংগ্রেস ৫৭টি এবং মুসলিম অঞ্চলে লিগ ৩৪টি আসন পেয়েছিল। ইন্ডিপেন্ডেন্টরা পেয়েছিলেন পাঁচটি। অকালি দল দু'টি এবং ইউরোপীয়ানরা আটটি। এক্ষেত্রে হিন্দু মহাসভার স্থান কোথায়? এরপর ১৯৪৬ সালে যখন গণপরিষদ গঠিত হয়, সেখানে ব্রিটিশ ভারতের জন্য নির্ধারিত ২৯৩টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছিল ২১১টি আসন, মুসলিম লিগ ৭৮টি এবং অন্যান্য ১২টি।

সুতরাং বলা যায়, সেই সময় ভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দু মহাসভার তেমন কোনও ভূমিকাই ছিল না। আর সাভারকর দেশবিভাগের আলোচনা-টেবিলে আদৌ কোনও স্থান পাননি। এতে অংশ নিয়েছিলেন মূলত নেহরু, প্যাটেল, আজাদ, জিন্না, লিয়াকত আলি প্রমুখ দু' পক্ষের নেতারা। এমনকী, শিখ নেতা বলদেব সিংও। ওইসব আলোচনায় সাভারকর কখনও ডাক পাননি। সেই জন্য ভি. পি. মেনন মন্তব্য করেছেন, **হিন্দু মহাসভা ছাড়া প্রায় সব দলই দেশবিভাগ মেনে নিয়েছিল। এই দলের ওয়ার্কিং কমিটি দিল্লিতে অখণ্ড ভারতের কথা বলেছিল**। এমনকী, পাকিস্তান-বিরোধী দিবসও পালন করে (ট্রান্সফার অব পাওয়ার, পৃঃ-৭৯)

লিগ ১৯৪০ সালে লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব পেশ করেছিল। তখন থেকেই কিন্তু সাভারকর এর **প্রতিবাদ** করেছিলেন এবং ভারতকে অখণ্ড রাখার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। তবে তাঁর দলীয় শক্তি ছিল সীমিত এবং দুর্ভাগ্যক্রমে ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য তিনি তখন প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছেন (ডঃ বিজয় আঢ্য: বীর সাভারকর, পৃঃ-১৭)।

আসলে, দেশবিভাগের মূলে ছিল কংগ্রেসের দুর্বলতা, জিন্নার অনমনীয়তা এবং ব্রিটিশ সরকারের **ভেদনীতি**।

আগে কংগ্রেসের কথা বলি।

যে সময়ে নেতাদের একটা বাস্তবধর্মী ও বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করার কথা, তখন কিন্তু

গান্ধীজী, নেহরু প্রমুখ নেতা ভুলের পর ভুল করে গিয়েছেন, আর শেষদিকে ক্ষমতার মোহ তাঁদের পাগল করে দিয়েছে।

প্রথমত, ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস বিপুল প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। আটটি প্রদেশে তাদের সরকার গঠিত হয়। এই নির্বাচনের ফলাফলে হতাশ হয়ে লিগ নেতা জিন্না দেশ ছেড়ে বিলেতে চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানেই আইনব্যবসায় পাকাপাকিভাবে থেকে যাবেন বলে স্থির করেছিলেন। এটা লক্ষণীয় যে, মুসলিম-অধ্যুষিত প্রদেশে বা অঞ্চলেও লিগ সুবিধা করতে পারেনি। তার ফলে ক্রমে তাদের রাজনীতি কংগ্রেস তথা **হিন্দুবিদ্বেষের** দিকে চলে যায়। এইচ ভি হাডসন মন্তব্য করেছেন, এই মানসিকতাই দেশকে বিভক্ত করার পেছনে মূল শক্তি হিসাবে কাজ করেছে। তাঁর ভাষায়, "There is no doubt that the conduct of provincial self-government from 1937 to 1939 was a major cause of the two-nation theory and the Pakistan movement" (দ্য গ্রেট ডিভাইড, পৃঃ-৭৫)। হতাশাগ্রস্ত লিগ নেতারা তখন ক্রমাগত প্রাদেশিক কংগ্রেস সরকারগুলির বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক আচরণ ও মুসলিমদের ওপর অত্যাচারের অভিযোগ তোলেন। কিন্তু কংগ্রেস যখন প্রধান বিচারপতি মরিস গাইয়ারের নেতৃত্বে তদন্ত কমিশন গঠনের প্রস্তাব তুলেছে, লিগ নেতারা তখন আর আগ্রহ দেখাননি। পেণ্ডেরেল মুন লিখেছেন, লিগ তখন বরং দেশভাগের কথা চিন্তা করতে শুরু করেছে (ডিভাইড অ্যান্ড কুইট, পৃঃ-২১)।

কংগ্রেস তখন একটু বাস্তববোধের পরিচয় দিলে কী হত কে জানে। ধরা যাক বাংলার কথা। এই রাজ্যে মুসলমানদের ছিল তিনটে দল—লিগ পেয়েছিল ৪০টি আসন, আর স্বতন্ত্র মুসলিম এবং ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টি পেয়েছিল যথাক্রমে ৪১টি ও ৩৫টি আসন (জে পি সুদা: ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশান ডেভেলপমেন্ট, পৃঃ-৩৪৯)। এক্ষেত্রে কংগ্রেস বা অন্য কারও একক গরিষ্ঠতা ছিল না। হক সাহেব কংগ্রেসের সঙ্গে সরকার গড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু নেহরুর তত্ত্ব ছিল, একক গরিষ্ঠতা না পেলে কংগ্রেস সরকারে যাবে না। এর ফলে, জিন্না যেমন কংগ্রেসকে মুসলিম-বিরোধী বলার সুযোগ পেয়েছেন, তেমনই হক সাহেবের সঙ্গে লিগের সমঝোতা হওয়ায় সরকারের সাম্প্রদায়িক ঝোঁক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

তাছাড়া নেহরু সেই সময় একটা অবিবেচনাপ্রসূত উক্তি করেছিলেন। তাঁর মতে, দেশে শুধু দু'টি শক্তি—কংগ্রেস ও সরকার। উত্তরপ্রদেশে অবশ্য লিগকে সঙ্গে নেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু সেখানে তাদের বলা হয়েছিল কংগ্রেসের নীতি মেনে নিতে হবে। কংগ্রেসের এই মনোভাব কিন্তু লিগের জন-সমর্থন বৃদ্ধি করে (চৌধুরী খালেকুজ্জমান: পাওয়ার টু পাকিস্থান, পৃঃ-১৬১)। এমনকী, মওলানা আজাদও স্বীকার করেন যে, এর ফলে মুসলিম সম্প্রদায়ের কংগ্রেস-বিদ্বেষ বেড়েছে এবং লিগের প্রভাব সম্প্রসারিত হয়েছে (ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম পৃঃ-১৬২)। বিশেষ করে, অতি-উৎসাহী হয়ে নেহরু ঘোষণা করেছিলেন, কংগ্রেসে সংখ্যালঘুদের টানার জন্য ব্যাপক গণসংযোগ ও প্রচারকার্য্য চালানো হবে। বলা বাহুল্য, এটাকে জিন্না চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, এরপর লিগের ১৭০টি শাখা খোলা

হয়েছে—উত্তরপ্রদেশেই এক লক্ষ নতুন সদস্য নেওয়া হয়েছে (আর কুপল্যান্ড: কনস্ট্রিটউশনাল প্রবলেম ইন ইণ্ডিয়া, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ-১৮১)।

এমনটা হয়েছে পরেও। ক্যাবিনেট মিশনের সময় (১৯৪৬) নেহরু হঠাৎ বলেছিলেন তাঁরা রাজ্যগুলোর তিন ধরনের বিভাজন (ক, খ এবং গ) আপতত মেনে নিচ্ছেন। কিন্তু পরে ইচ্ছামতো সিদ্ধান্ত নেবেন। তাঁর জীবনীকার মাইকেল ব্রেচার মন্তব্য করেছেন, নেহরুর রাজনৈতিক জীবনে সবচেয়ে প্ররোচনাপূর্ণ ভাষণ এটাই। কারণ এর ফলে জিন্না বলার সুযোগ পান যে, কংগ্রেসকে বিশ্বাস করা যায় না (নেহরু—এ পলিটিক্যাল বায়োগ্রাফ) এটাও রাজনীতিকে দ্রুত দেশবিভাগের দিকে নিয়ে গিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, তাঁদের কথাবার্তাতেও কোনও সঙ্গতি ছিল না। লক্ষ্য করুন, ১৯৪২ সালে রাজা গোপালচারী তার 'স্পোর্টিং ফরমূলা' তৈরি করেছেন তার মধ্যে পাকিস্থানের বীজ নিহিত ছিল। এলাহাবাদে আই সি সি ১২০/১৫ ভোটে সেটা প্রত্যাখ্যান করে (মে ১৯৪২)। অথচ আগস্ট আন্দোলনের পর গান্ধীজী জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তার ভিত্তিতেই জিন্নার সঙ্গে কথা বলেন অনেক দিন ধরে (২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪)। ব্যাকুলভাবে তিনি জিন্নাকে জানিয়েছিলেন, "I have always been a servant and friend to you, do not disappoint me." জিন্নার অনমনীয়তার ফলে ওই বৈঠক ব্যর্থ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু কংগ্রেস-প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেই গান্ধীজি সেই বৈঠক করেছিলেন। আজাদের মতে, এর ফলে জিন্নাকেই তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে 'হিরো' বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

তাছাড়া, এক সময় গান্ধীজি দৃঢ়কণ্ঠে আজাদকে বলেছিলেন, "If the congress wants to accept partition, it will be over my dead-body" (আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ-৬৭)। একটা প্রার্থনা সভায় তিনি জানিয়েছিলেন, যদি সারা ভারত বলতে থাকে এবং যদি তরবারির মুখেও দেশভাগের দাবি ওঠে, তাহলেও তিনি তা মেনে নেবেন না (লাম্লি: দ্য ট্রান্সফার অব পাওয়ার ইন ইন্ডিয়া, পৃঃ-১৬১)।

অথচ, ১৯৪২ সালের ২০ জুলাই তিনি ফকির নাজির আমেদকে লিখেছেন, শর্তসাপেক্ষ পাকিস্তানের দাবি তিনি, মেনে নিতে প্রস্তুত। ১৯৪৪ সালের ২৫ অক্টোবর তিনি তেজবাহাদুর সপ্রুকে লিখেছে, পাকিস্তান প্রস্তাব নিয়ে একটা আলোচনা শুরু হওয়া দরকার (পি সি রায়চৌধুরী: 'গান্ধী অ্যান্ড দ্য পার্টিশন'। হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, ২৬/০১/১৯৬৮)। এমনকী, নোয়াখালিতে গিয়ে দাঙ্গার সময় তিনি বলেছিলেন, পাকিস্তান বা ওই ধরনের কোনও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র মুসলিমদের জন্য গঠিত হলে তাঁর আপত্তি নেই (ডাঃ নিতাই বসু: ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম, পৃঃ-২৩৯)।

আসলে, তিনি এক স্বপ্ন ও বাস্তবের মধ্যে বাস করছিলেন—বলা যায়, অবাস্তবতাই তাঁকে বেশি প্রভাবিত করেছিল। দেশকে অখন্ড রাখার বাসনা তাঁকে একটা সময়ে চালিত করেছে। কিন্তু তিনি বোঝেননি যে, এই নিয়ে একটা সমস্যার মুখোমুখি তাঁকে হতেই হবে।

তা তিনি রুখতে চেয়েছিলেন অবাস্তব পদ্ধতিতে। **ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার** লিখেছেন, "It is nothing but the pursuit of phantasy. It is possibly this phantasy that was mainly responsible for the partition of India" (হিস্ট্রি অব মডার্ন বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃঃ-৪৩৮)। তিনি বোঝেননি যে, ভাবাবেগ ও কল্পনা দিয়ে রাজনীতি হয় না।

এ রকম অবাস্তবতার নমুনা অনেক আছে। তিনি লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে দু'টি বৈঠকে বসেছিলেন। দ্বিতীয় দিন তিনি প্রস্তাব দেন, জিন্নার হাতেই বড়লাট ক্ষমতা তুলে দিন। এই অদ্ভুত প্রস্তাবে বড়লাট চমকে গিয়েছিলেন, কিন্তু চাতুর্যের সঙ্গে তিনি প্রস্তাবটা বিবেচনা করার প্রতিশ্রুতি দেন। আসলে, তার উদ্দেশ্য ছিল প্রস্তাবটা বাতিল করা। সেটা তিনি করেন কংগ্রেসের অন্য নেতাদের মাধ্যমে। মর্মাহত হয়ে গান্ধীজি চলে যান বিহারে— আর তিনি আলোচনায় বসেননি। অ্যালান ক্যাম্পবেল জনসন তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন (১২/০৪/১৯৪৭): "Gandhiji has written to mountbatten that his own plan is not accepted to Congress and that he is personally handing over all future negotiation to the Working Committee" (মিশন উইদ মাউন্টব্যাটেন, পৃঃ-৫০) অথচ, দেশভাগ ঠেকানোর জন্য বৈঠকে তাঁর উপস্থিতি অত্যন্ত দরকার ছিল। আরও উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল, যখন সব ঠিক হয়ে গেল, বড়লাট তাঁকেও ডেকেছিলেন। তাঁর ভয় ছিল, গান্ধীজি তখনও সব উল্টে দিতে পারেন। কিন্তু গান্ধীজি এসে লিখে জানিয়ে দেন, সেদিন তার ***'মৌন দিবস'। অর্থাৎ, সেদিনও তিনি এতে বাধা দেননি।***

আর কংগ্রেসের প্রস্তাব গ্রহণের সময় কী হল? ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে (৩ জুন) গান্ধীজি দেশবিভাগের প্রস্তাব সমর্থনই করলেন। কংগ্রেস অধিবেশনে (১৪-১৫ জুন, ১৯৪৭) সেটা গৃহীত হয় ১৫৭/২৯ ভোটে। ৩২ জন ছিলেন নিরপেক্ষ। বলা বাহুল্য, গান্ধীজি ছিলেন প্রস্তাবের পক্ষে। গণতন্ত্রের ধারক হয়ে গান্ধীজি বলেছিলেন, ভোটাধিক্যে কংগ্রেস নেতারা এটা করাতেই পারেন, "Gandhiji conceded their right to do so" (ভিনসেন্ট শিয়ান: মহাত্মা গান্ধী, পৃঃ-১৭০)। সচিব নির্মলকুমার বসু তাঁকে প্রশ্ন করেন, তিনি এক্ষেত্রে অনশন করেননি কেন? গান্ধীজির উত্তর ছিল, সেটা গণতন্ত্রসম্মত হত না। এমন একটা বিষয়ে তাঁর গণতন্ত্রের কথা মনে পড়ল?

নেহরুর কথা চিন্তা করুন মনে হবে, তিনিও ছিলেন দেশভাগের বিরুদ্ধে। তাহলে ক্রিপস এদেশে আসার আগেই (১৯৪১) কেন তিনি বলেছিলেন যে, দেশভাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে?

আরও একটা ব্যাপার আছে। কংগ্রেস নেতারা পরস্পরের সঙ্গে এই নিয়ে লুকোচুরিও খেলেছেন। ক্যাবিনেট মিশন যখন এদেশে আসে তখন কংগ্রেস-লিগের দ্বন্দ্ব তুঙ্গে। ১৪ জন সদস্যকে নিয়ে একটা অস্থায়ী ক্যাবিনেট গঠন করার প্রস্তাব উঠেছিল। কিন্তু জিন্না জানিয়েছিলেন, কংগ্রেস হিন্দু প্রতিষ্ঠান। সুতরাং কোনও মুসলমানকে (অর্থাৎ আজাদকে)

কংগ্রেস মনোনীত করতে পারবে না। মওলানা আজাদ ক্রিপসকে লিখেছিলেন, এই নিয়ে কোনও অসুবিধা হবে না। এই শুনে গান্ধীজি চিঠির কপি চেয়ে আনেন। কিন্তু আজাদ তাঁকে বলেন, এমন চিঠি তিনি লেখেননি (সুধীর ঘোষ: গান্ধীজি'স এমিসারি, পৃঃ-১৬৫-৬৭)।

আরও দেখুন, পঞ্জাবের হিংস্র দাঙ্গায় হতাশ হয়ে প্যাটেলের উদ্যোগে কংগ্রেস পঞ্জাব ভাগ করার প্রস্তাব নিয়েছিল। খসড়াটি তৈরি করেছিলেন ভি পি মেনন। কিন্তু গান্ধীজি ও আজাদ তাতে বাধা দিতে পারেন বলে সেটা এমন সময় গ্রহণ করা হয়েছিল যখন গান্ধীজি বিহারে আর অসুস্থ আজাদ নার্সিং হোমে ভর্তি। নেহরু-প্যাটেলের ছকটা ছিল, গান্ধী ও আজাদ সেটা যত দেরিতে জানতে পারেন, ততই মঙ্গল। লিওনার্ড মস্‌লে লিখেছেন, "And even when it was passed, steps were taken to keep it secret and no message was sent to Gandhi to tell him what had taken place" (দ্য লাস্ট ডেজ অব দ্য ব্রিটিশ রাজ, পৃঃ-১০৮)। গান্ধীজি পরে এ ব্যাপারে তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করেন। কিন্তু নেহরু তাঁকে লিখেছিলেন, বিহারে শান্তি স্থাপনের জন্য ঘোরাঘুরির ফলে কংগ্রেস তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি। বলা বাহুল্য, অজুহাতটা গান্ধীজিরও ভালো লাগেনি (কলিন্স/লাপিয়ে: ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট)।

আসলে, এক্ষেত্রে একদিকে গান্ধীজির দুর্বলতা-অস্থিরতা যেমন ছিল, তেমনই অন্যদিকে তাঁর শিষ্যরা তখন সাবালক হয়ে গিয়েছেন। দূর্গা দাসের গ্রন্থে (ইণ্ডিয়া: ফ্রম কার্জন টু নেহরু) আছে, গান্ধীজি তাঁকে বলেছিলেন, জিন্না ও নেহরু **দুজনেই প্রধানমন্ত্রী** হতে চান, **সুতরাং দু'টি দেশ দরকার।**

সেই তুলনায় মুসলিম লিগের রাজনীতি সঙ্কীর্ণ ও একমুখী হলেও, নেতারা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছিলেন। ১৯৪০ সাল থেকে তাঁরা চেয়েছিলেন পৃথক রাষ্ট্র, অনমনীয় নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁরা তার জন্য লড়াই করে গিয়েছিলেন বারবার।

তাঁদের সংগ্রাম সরকারের বিরুদ্ধে ছিল না—ছিল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। তার ফলে সব সময় ওই দল সরকারের কাছাকাছি থেকেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সরকারের ওপর কংগ্রেস চাপসৃষ্টি করলেও লিগ সরকারকে সাহায্য করে গিয়েছে। ১৯৪২ সালের আগস্টে কংগ্রেস আন্দোলন শুরু করলে লিগের নির্দেশে মুসলিম সম্প্রদায় তাতে যোগ দেয়নি। (ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার: হিস্ট্রি অব দ্য ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃঃ-৬৭৯)। জিন্না কংগ্রেস নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পক্ষে ছিলেন।

১৯৪১ সালে ক্রিপস মিশন এসেছিল। তাদের প্রস্তাব লিগ প্রত্যাখ্যান করে তাতে পাকিস্তানের কথা ছিল না বলে। ১৯৪৬ সালে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব নিয়েও মতবিরোধ ঘটেছে। "But later, differences arose regarding the interpretation of the scheme" (চন্দ্র-ত্রিপাঠী-দে: ফ্রিডম স্ট্রাগল, পৃঃ-২২৭)। আরও পরিষ্কারভাবে বললে, তখন প্রতিটি ব্যাপারে জিন্না ফ্যাঁকড়া তুলছিলেন। সিমলা বৈঠক তাঁর জন্যই ভেস্তে গিয়েছিল। ডাঃ

নিমাইসাধন বসু মন্তব্য করেছেন, জিন্না অত্যন্ত গোঁয়ার্তুমির সঙ্গে (obstinately) সঙ্গে মিটমাটের সব প্রয়াস নষ্ট করে দিয়েছিলেন (দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল মুভমেন্ট, পৃঃ-১৩১)।

আর ওয়াবেলের আমন্ত্রণে লিগ অর্ন্তবর্তী ক্যাবিনেটে প্রথমে যোগ দেয়নি। নেহরুকে নিয়ে সেটা গঠিত হতেই জিন্না 'ডাইরেক্ট অ্যাকশনে'র নীতি গ্রহণ করেন। **নারকীয় হত্যা ও ধ্বংসলীলা চলেছিল প্রধানত কলকাতায়**-অন্তত ৬ হাজার মানুষের অপমৃত্যু ঘটেছিল তাতে। আহত হয়েছিল ১৫ হাজার মানুষ। অন্তত ১ লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়েছিল। পরে ক্যাবিনেটে লিগ যোগ দিয়েছিল। কিন্তু দিয়েছিল অন্তর্ঘাত করার জন্য। তাতে কংগ্রেস ও লিগ মন্ত্রীরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। ডঃ পি এন চোপরার ভাষায়: "each functioning under separate leadership" (ইন্ডিয়া'জ স্ট্রাগল ফর ফ্রিডম, পৃঃ-৬৭)।

আসলে লিগের উদ্দেশ্যই ছিল এভাবে এটা বুঝিয়ে দেওয়া যে, কোনও সমঝোতা হবে না—পাকিস্তান সৃষ্টিই একমাত্র সমাধান। ডঃ এস এন সেন লিখেছেন: "The League tried to push through its demand for Pakistan." (হিস্ট্রি অবদ্য ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া, পৃঃ-২১৪)

আর কমিউনিস্ট দল? তারা শুধু দু' ভাগ নয়— দেশকে অন্তত চোদ্দোটা ভাগে বিভক্ত করতে চেয়েছিল তাত্ত্বিক বিভ্রান্তির কারণে। হয়তো তার পেছনে দলীয় স্বার্থও ছিল (ডঃ এ কে মজুমদার: দ্য অ্যাডভেন্ট অব ইন্ডিপেনডেন্স, পৃঃ-১৯০, এবং শ্যামলেশ দাস: ভারত বিভাগ, সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয় নেতৃত্ব, পৃঃ-৬৪)।

সর্বোপরি, ব্রিটিশ সরকারের ভেদনীতি তো এর পেছনে ছিলই। ১৯০৬ সালে তাদেরই উৎসাহে মুসলিম লিগের উদ্ভব ঘটেছিল কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলনকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য। সেই ভেদনীতিরই পরিণতি ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগ। ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠী লিখেছেন, বড়লাটরা জিন্নার হাতেই ভোট-ক্ষমতা দিয়ে ফেলেছিলেন ('একুশের অসহযোগ থেকে বিয়াল্লিশের বিদ্রোহ', আনন্দবাজার, সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা)।

জিন্না চেয়েছিলেন দেশভাগ ও ক্ষমতা। তিনি জানতেন, তাঁর সময় কম (এর মধ্যে ক্যানসার ও টি বি ধরা পড়েছিল। অল্পকাল পরে তিনি মারাও যান)। মাউন্টব্যাটেন চেয়েছিলেন কাজ সেরেই নৌবাহিনীতে পদোন্নতি। **গান্ধীজি চেয়েছিলেন পদ না নিয়েও ক্ষমতা হাতে রাখতে।** প্যাটেল-নেহেরু প্রমুখ নেতা চেয়েছিলেন **প্রত্যক্ষ ক্ষমতা**। নেহরু মস্‌লেকে বলেছিলেন, তাঁদের বয়স হয়ে গিয়েছে। দেশভাগ না মানলে আবার আন্দোলন করে জেলে যেতে হত— "prison obvisouly awaited us" (পূর্বোক্ত, পৃঃ -২৮৫)।

সুতরাং দেশভাগ ছিল সব পক্ষেরই লাভের ব্যাপার। **এ ব্যাপারে সাভারকরকে জড়ানো কেন?**

দৈনিক বর্তমান (১৮.৯.২০০৪) এর সৌজন্যে।

সংযোজন -৩

সাভারকর লণ্ডনে ব্রিটিশবিরোধী কার্য্যকলাপে ছিলেন অত্যন্ত সক্রিয়

অমিয় কুমার সামন্ত

মহারাষ্ট্রের বিনায়ক দামোদর সাভারকরকে (১৮৮০-১৯৬৬) নিয়ে এখন জোরদার বিতর্ক চলছে। সাভারকর বেশির ভাগ মহারাষ্ট্রবাসীর নিকট স্বদেশপ্রেমের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ। তাই সাভারকরের নিন্দা বা সমালোচনা হলে মহারাষ্ট্রবাসীর মনে আঘাত লাগবে। সম্প্রতি কোনও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মন্তব্য ঘিরে মহারাষ্ট্রে আবহাওয়া কিছুটা কিছুটা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

সাভারকর নিজেই তাঁর বিলেত প্রবাসের ঘটনাবলী (১৯০৬-১৯১০) বিবৃত করেছেন। এখানে যা বলা হচ্ছে তা, ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের একটি ধারাবাহিক প্রতিবেদন। তাঁদের নিতান্ত শুষ্ক প্রতিবেদনে একটা নিরাবরণ সত্যের স্পর্শ আছে।

এইবার ইংল্যান্ডে ভারতীয়দের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে গোয়েন্দা রিপোর্টের দিকে তাকানো যাক। এর মধ্যেই আছে সাভারকরের কাহিনী।

"কাথিয়াবাড়ের গরিব কনিয়া পরিবারের শ্যামাজী কৃষ্ণ ভার্মা ১৯০৪ সালে মনিয়র উইলিয়মসের সাহায্যে যখন ইংল্যান্ডে পৌঁছালেন তখন তাঁর বয়স ৪৭। দেশে ব্যবসা করেছেন, পরে চাকুরিও করেছেন। ইংল্যান্ডে গিয়ে অক্সফোর্ডের ব্যালিয়ল কলেজ থেকে তিনি স্নাতক হলেন। ১৯০৫ সালে India Home Rule Society স্থাপন করে তিনি হলেন তার প্রেসিডেন্ট। সেই হোমরুল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভারতীয় ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি কাজ শুরু করলেন। লণ্ডনে ভারতীয়দের থাকার জন্য ৬৫ নং ক্রমওয়েল অভ্যানিউয়ের বাড়িতে চালু করলেন 'ইণ্ডিয়া হাউস' ১৯০৫ সালের ১ লা জুলাই। দাদাভাই নৌরজি, লালা লজপত রায় এবং আরও অনেক ভারতীয় ও ইংরেজ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। লালা লাজপত রায় 'ইণ্ডিয়া হাউসে' প্রথম বাসিন্দাদের একজন। এখানে প্রতি সপ্তাহে ভারতীয়দের মিটিংয়ে ব্রিটিশ বিরোধিতা প্রচার করা হত।

১৯০৬ সালের ৯ই জুন লণ্ডনে পৌঁছালেন বিনায়ক দামোদর সাভারকর, বিএ, ২৫ বৎসর বয়সের কোঙ্কনস্থ ব্রাহ্মণ। বোম্বাইয়ে ভিহারী নামে একটি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন অল্পদিনের জন্য। তিনি ছিলেন রাজদ্রোহ প্রচারে দক্ষ, নাসিকের বিশিষ্ট রাজদ্রোহী ডব্লিউ এস খারের শিষ্য।

সাভারকর ইণ্ডিয়া হাউসের তত্ত্বাবধানের সঙ্গে যুক্ত হলেন বটে, কিন্তু প্রথমেই রাজদ্রোহমূলক কাজকর্মে লিপ্ত হননি। প্রথম এক-দেড় বছর ব্যারিস্টারী পড়ায় ব্যস্ত ছিলেন। ১৯০৮ সালের ১ আগস্ট তিলকের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদসভায় তিনি বক্তৃতা দেন। ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয়দের উপর অত্যাচারের অনেক ঘটনা বর্ণনা করেন। কয়েকটি প্রচারপত্রও প্রকাশ করেন।

এই সময়ে ভারতীয়দের মধ্যে উগ্রপন্থী বিপ্লবী বলে তাঁর নাম রটে যায়। সিপাহি বিদ্রোহ সম্পর্কে বই রচনা করছেন বলেও ভারতীয়দের মধ্যে ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হয়। ডিসেম্বর মাসে গুরুগোবিন্দ সিংহের স্মরণসভায় তিনি বিদেশি শাসনের তীব্র নিন্দা করেন। সকলে একত্রিত হয়ে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের জন্য তিনি আহ্বান জানান। হিন্দু শিখ ঐক্যের ফলে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ের সম্ভাবনা বাড়বে। সিপাহি বিদ্রোহকে তিনি প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসাবে অভিহিত করে জানান যে এই বিষয়ে তিনি মারাঠিতে পুস্তক রচনা করেছেন। ২১ শে মার্চ তিনি ইণ্ডিয়া হাউসে তাঁর বইয়ের অংশবিশেষ পাঠ করেন। এই সময় ইণ্ডিয়া হাউসে হায়দার রাজা নামে একজন ভারতীয় থাকতে শুরু করেন।

১২ই এপ্রিল (১৯০৯) সাভারকরের "সিপাহি বিদ্রোহ" থেকে পাঠ করা হয়। তিনি ভারতীয় সিপাহিদের বীরত্ব ও ইংরেজদের কাপুরুষতার কথা বিশদভাবে বলেন তিনি বিদ্রোহের বার্ষিকী বেশি লোকজন নিয়ে পালন করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু হায়দার রাজা অর্থাভাবের অজুহাতে ছোট করে করার পক্ষপাতী ছিলেন।

৯ ই মে'র মিটিং-এ ইণ্ডিয়া হাউসের সদস্য ও আরও প্রায় ত্রিশজন ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। সাভারকর জ্বালাময়ী বক্তৃতায় নানা সাহেব, লক্ষ্মীবাঈ ও অন্যান্যদের বীরত্ব ও স্বদেশ প্রেমের বর্ণনা দিয়ে উপস্থিত সকলকে একমাস ধরে "বিদ্রোহ ব্যাজ" পরার জন্য অনুরোধ জানালেন। "বোমা মারার" কর্মপদ্ধতিতে তিনি বিশ্বাস করেন না; কিন্তু ব্রিটিশ সরকার যে অত্যাচার করছে তাতে ভারতীয়রা অচিরেই ঐ পথ গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।

"পরদিন ১০ই মে বেশ সাফল্যের সঙ্গে সিপাহি বিদ্রোহের বার্ষিকী পালন করা হয়। মোট ত্রিশজন ভারতীয় উপস্থিত ছিলেন। হায়দার রাজা উপস্থিত ছিলেন না। সাভারকর বিদ্রোহের ইতিহাস আলোচনা করে ব্রিটিশদের নিষ্ঠুরতা ও পাশবিকতার অনেক দৃষ্টান্ত দিলেন। নানা সাহেবের বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি কানপুরের ইউরোপিয়ানদের হত্যাকে বীরোচিত কাজ বলে অভিহিত করলেন। তিনি মনে করেন ভারতের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত মানুষ অস্ত্র হাতে নিয়ে ব্রিটিশ বিতাড়নের জন্য প্রস্তুত। ব্রিটিশ সৈন্য বাহিনীর শিখ ও অন্যান্য ভারতীয় সৈন্যরাও ব্রিটিশের অত্যাচারী শাসন থেকে ভারতকে মুক্ত করার জন্য বিদ্রোহ করতে প্রস্তুত।

"২০ জুনের (১৯০৯) সভায় সাভারকর ছিলেন অত্যন্ত উত্তেজিত ও আগ্রাসী। তিনি খবর পেয়েছিলেন যে নাসিকে তাঁর ভাই-এর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে। ভাই গণেশ দামোদর সাভারকরও একটি সন্ত্রাসবাদী দলের কাজকর্মে যুক্ত হয়ে পড়েছিল। শাস্তির

প্রচণ্ডতায় ক্ষুব্ধ সাভারকর ভারতে সমস্ত ইংরেজকে হত্যা করার কথা বলেন। স্বাধীনতার জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীকেই আত্মোৎসর্গ করতে সকলকে আহ্বান জানান।

"১ জুলাই (১৯০৯) রাত্রি সাড়ে এগারটার সময় লন্ডনের ইম্পিরিয়াল ইন্সিটিউটের এক সভা থেকে বেরিয়ে আসার সময় লন্ডনে ইণ্ডিয়া অফিসের রাজনৈতিক সহায়ক কর্ণেল **উইলিয়ম কার্জন উইলিকে মদনলাল ধিংড়া নামে এক পাঞ্জাবি গুলি করে হত্যা করে।** কয়াসজি লালকাকা নামে এক পার্সি ডাক্তার ধিংড়াকে থামাতে গেলে তাকেও গুলি করে হত্যা করে। ধিংড়া একটি স্বয়ংক্রিয় কোল্টপিস্তল দিয়ে কাণ্ডটি ঘটিয়েছিল। কিন্তু তার সঙ্গে আরও একটি গুলিভর্তি ম্যাগাজিন ও একটি বেলজিয়ামে তৈরি পিস্তল ও একটি বড় ছুরি পাওয়া যায়। বেলজিয়ান পিস্তলটি প্যারিসে অবস্থিত সন্ত্রাসবাদীদের সংগঠনের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছিল।

লণ্ডন পুলিশ আদালতকে জানিয়েছিল যে উইলিকে হত্যার পিছনে কোনও চক্রান্ত নেই। সেই সঙ্গে এও জানিয়েছিল যে দুই সন্ত্রাসবাদী, অর্থাৎ প্যারিসের শ্যামজি ভার্মা ও লন্ডনের সাভারকর এই হত্যায় প্ররোচনা জুগিয়েছিল। তদন্তে জানা গিয়েছিল, ইণ্ডিয়া হাউসের সদস্যরা টটেনহাম কোর্ট রোডের একটি রেঞ্জে পিস্তল ছোঁড়া অনুশীলন করে, ধিংড়াও ওখানেই তিনমাস ধরে নিজের পিস্তল থেকে গুলিছোঁড়া অনুশীলন করেছিল।

"১২ জুলাই। (১৯০৯) ইণ্ডিয়া হাউসের সভায় ধিংড়ার প্রশংসা করে বক্তৃতা করেন **ভি ভি এস আয়ার, হায়দার রাজা, এস এম মাস্টার ও সাভারকর**। আয়ার বলেন ধিংড়ার গুরু প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণের অবতার কারণ তিনি ধিংড়ার মত এক শিষ্য তৈরি করতে পেয়েছেন। আয়ার ইঙ্গিতে সাভারকরকে গুরু বলে নির্দেশ করেছিলেন। সাভারকরও তার বক্তৃতায় বলেন, "একজন মানুষই ধিংড়াকে প্রশিক্ষণ ও নির্দেশ দিয়েছিল। সেই জন্য ধিংড়া ঠাণ্ডা মাথায় গুলি চালাতে পেরেছে। এমন কি যখন দেশের শত্রু উইলি মাটিতে পড়ে গেছে তখনও সে থামে নি।" মিটিং-এর পর নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার সময় ডাঃ রাজনকে বলতে শোনা যায় যে ধিংড়া সাভারকরের উপযুক্ত শিক্ষার ফল। ধিংড়া তিনজন ঔপনিবেশিক প্রশাসককে হত্যার জন্য বেছে নিয়েছিল—তাঁরা হলেন লর্ড মরলি, লর্ড কার্জন, ও স্যার কার্জন উইলি। ঘটনার দিন সাভারকর, রাজন ও আয়ার কোরগাঁওকে ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউটে পাঠিয়েছিলেন, উইলিকে চিনিয়ে দেওয়ার জন্য ও ধিংড়াকে সাহস দেওয়ার জন। মিটিং এর পর উইলি যখন বেরিয়ে যাচ্ছিলেন তখন করগাঁও ধিংড়াকে বলেন, "যাও, দেরি করছ কেন?" তারপর ধিংড়া আর দ্বিধা করেনি।

"সমস্ত খবরাখবর খুঁটিয়ে দেখার পর আর কোনও সন্দেহই থাকে না যে সাভারকরই এই হত্যার পরিকল্পনা করেছিলেন। প্যারিসে শ্যামাজি ভার্মার সঙ্গে এই হত্যার কোন প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না; কিন্তু ভার্মার সঙ্গে ইণ্ডিয়া হাউস ও সাভারকরের যোগাযোগ ছিল।

"উইলি হত্যার পরই ইণ্ডিয়া হাউসের অধিবাসীরা বাসস্থান ছেড়ে ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ে। সাভারকর অনেক আগে থেকেই **বিপিন চন্দ্র পালের** সঙ্গে তাঁর ১৪০ নম্বর সিনক্রেয়ার

রোডের বাড়িতে থাকতেন। ৩রা জুলাই সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এর সভাপতিত্বে ভারতীয়দের এক সভায় ধিংড়ার কাজের নিন্দা করা হয়। অন্য অনেকের সঙ্গে বিপিন পালও এই সভায় বক্তৃতা করেন।

"৫ জুলাই ক্যাক্সটন হলে ভারতীয়দের আর একটি মিটিংযে সভাপচিতত্ব করেন **আগা খান**। এই মিটিং-এ সাভারকর উপস্থিত ছিলেন। এখানে উইলিহত্যার নিন্দা প্রস্তাব নেওয়ার সময় সাভারকর দাঁড়িয়ে উঠে বলেন তিনি ঐ প্রস্তাবের সঙ্গে একমত নন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তিরুমালাচারী। জনৈক এডওয়ার্ড পামার সাভারকরকে হলের বাইরে বার করে দেওয়ার চেষ্টা করলে তার সঙ্গে হাতাহাতি হয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সাভারকর ও তিরুমালাচারিকে হল থেকে বার করে দেওয়া হয়।

"পরের দিন 'টাইমস' পত্রিকায় একটি চিঠি লিখে সাভারকর তাঁর অবস্থান ব্যাখ্যাকরেন। তিনি লেখেন যারা এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছিলেন এবং যারা সমর্থন করেছিলেন তারা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হত্যাকারী বলে ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু অভিযুক্ত, হত্যা অপরাধে অপরাধী কিনা তা আদালত এখনও সাব্যস্ত করেনি। সুতরাং এই প্রস্তাব প্রকৃতপক্ষে আদালতের এক্তিয়ারে অযথা হস্তাক্ষেপ বলেই আমার মনে হয়েছে। যদি অপরাধ ও অপরাধী কথা দুটি বাদ দেওয়া হয় তবেই প্রস্তাবটি সত্য ও যথার্থ হবে বলে আমার মনে হয়েছিল। কথা দুটি বাদ দেওয়া হয়নি। তাই আমি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলাম; এবং প্রস্তাবটিও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় নি। এই কথাই আমি বলতে চেয়েছিলাম।" চিঠিতে তিনি আরও জানিয়েছিলেন যে " তাঁর গায়ে হাত তোলার জন্য পামারের বিরুদ্ধে মামলা করবেন।" এই চিঠিটি ১৪০ নং সিনক্লেয়ার রোড থেকে লেখা, অর্থাৎ তখন তিনি বিপিন পালের বাড়িতেই ছিলেন।

"১৪ জুলাই (১৯০৯) গ্রেস ইন-এর পরিচালকমণ্ডলী সিদ্ধান্ত নিলেন যে তাঁরা কোনওক্রমে সাভারকরকে ব্যারিষ্টার বলে ঘোষণা করবেন না। বিপিন পালের বাড়িতে সাভারকরকে এই কথা জানানো হলে তিনি আনন্দের সঙ্গে বললেন, "এতে আমার কিছুই যায় আসে না। ওরা যখন আমাকে ব্যারিষ্টার করল না, তখন আমি আরো গভীরভাবে নিজেকে দেশের কাজে নিযুক্ত করব।"

"এই সময় একদিন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গোপনে সাভারকরের সঙ্গে দেখা করে উইলিহত্যার জন্য তাঁকে **অভিনন্দন** জানান। সাভারকর ঘনিষ্ঠমহলে বলেছেন সুরেন্দ্রনাথ গোপনে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম সমর্থন করতেন। জুলাই মাসের শেষ দিকে কিছু দিনের জন্য ব্রাইটন যাচ্ছেন বলে সাভারকর লন্ডনে ছেড়ে চলে যান। এটি ছিল পুলিসের দৃষ্টি এড়িয়ে কোনও গোপন কাজে যাওয়ার ছল মাত্র।

'১৯০৯ সালে "দশেরা" বা বিজয়াদশমী উৎসব ইন্ডিয়া হাউসে পালন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই উপলক্ষে একটি নৈশভোজে কিছু হিন্দু ও বন্ধুস্থানীয় মুসলমানকে নিমন্ত্রণ জানানো হবে। এই ধরনের ভোজসভা বা ভারতীয়দের নিয়ে খোলামেলা সভা করার পরিকল্পনাটি ছিল সাভারকরের। এইরূপ সভায় অনেক ছাত্র-যুবকের সঙ্গে সাক্ষাৎ

হয় এবং সামাজিক ও ধর্মীয় সভায়। তাদের ভীরু ও দাসসুলভ মনোভাবের পরিবর্তন ঘটনোর চেষ্টা করা যায় বলে সাভারকর মনে করতেন।

"২৪ শে অক্টোবর (১৯০৪) ইণ্ডিয়া হাউসে "দশেরা" উপলক্ষে ডিনারে সভাপতি ছিলেন ট্রান্সভালখ্যাত এম কে গান্ধি। ভোজসভায় প্রারম্ভিক বক্তৃতায় সাভারকর দশমুন্ডধারী রাবণের অত্যাচারের সঙ্গে ব্রিটিশের অত্যাচারের তুলনা করে, রাবণবধের ন্যায় ব্রিটিশকেও সংহারের কথা বলেন এবং দেশের মানুষের জন্য শক্তি প্রার্থনা করেন। ডিনারের পর বক্তৃতা দিতে উঠে এম কে গান্ধি বললেন যে, সাভারকরের চিন্তার সঙ্গে তাঁর নিজের চিন্তার পার্থক্য আছে। তাঁর মতে শত্রু বাইরে নেই শত্রু আছে প্রত্যেকের অন্তরে। দশমুন্ডধারী রাবণের ন্যায় অত্যাচারী শত্রুকে আগে নিজেদের অন্তর থেকে নির্মূল করতে হবে। এই বক্তৃতায় বিশেষ হাততালি পড়ল না। তারপর সভাপতি ট্রান্সভালের হাজি সাহেব। হাজি সাহেব ভারতে হিন্দু মুসলমান ঐক্যের কথা বলে এবং দেশের জন্য প্রার্থনা করে বক্তৃতা শেষ করেন। এরপর ধীরেন চট্টোপাধ্যায় বলতে উঠে এম কে গান্ধির সমালোচনা করেন।

সাভারকর ধন্যবাদ দিতে উঠে বলেন, রাম, রাবণের দেশ দখল করেনি, বরং রাবণই সীতা হরণ করেছিল। কিন্তু আধুনিক রাবণ আমাদের দেশ দখল করে রেখেছে। সীতাকে যদি দেশের সঙ্গে তুলনা করা যায় তবে রাবণ আমাদের দেশ হরণ করেছে।

পরে সাভারকর এই ভোজসভা সম্পর্কে বলেছিলেন যে তাঁর শত্রুপক্ষ এই সভা বানচাল করতে চেয়েছিল।"

উপরের বিবরণটি ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের প্রতিবেদন হলেও একটি মানুষের চিন্তা ও চরিত্র কী এই প্রতিবেদনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে না?

লেখক প.ব. পুলিশের প্রাক্তন ডিজি

সৌজন্যে : দৈনিক স্টেটসম্যান ১৯.০৯.২০০৪

"বীর সাভারকরের এই ৭৬তম জন্মোৎসবে কলকাতায় আহুত এক জনসভায় প্রখ্যাত সাংবাধিক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথির ভাষণে বলেন, বীর সাভারকরের প্রতি আমর ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা আছে। সে শ্রদ্ধা কোন দলগত মতবাদের জন্য নয়। সাভারকরের জীবনের মধ্যে এমন একটা আশ্চর্য দিক আছে বর্তমানে নবগঠিত জাতির তা জানা দরকার।"

— প্রখ্যাত সাংবাদিক বিবেকানন্দ মখোপাধ্যায়।

"প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বীর সাভারকরের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাইয়া বলেন যে, বীর সাভারকরের নাম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীদের মুখে মুখে উচ্চারিত হইত এবং তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া বহুলোক অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বর্তমান ভারতের এক মহৎ ব্যক্তির তিরোধান হইল।"

— ইন্দিরা গান্ধী

"মহান কাল মার্কসের পৌত্র এম্ জান ল্যাংগোয়েট্ সাভারকরের এই নির্ভীকতা কাজের দ্বারা দৃষ্টান্ত স্থাপন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

লণ্ডন হইতে প্রকাশিত 'দি হের‍্যাল্ড অব রিভোল্ট (The Herold of Revolt) পত্রিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল,'.....ফরাসী বিচারালয়েই মিঃ সাভারকরের বিচার হওয়া বিধেয়, কারণ মিঃ সাভারকর রাজনৈতিক বিপ্লবী এবং ফরাসী উপকূলে অবতরণ করায় আন্তর্জাতিক নিয়মানুযায়ী ব্রিটীশ সরকার মিঃ সাভারকরের প্রতি কোন আধিপত্যই দাবী করিতে পারেন না এবং ফরাসী পুলিশও তাঁহাকে ব্রিটীশ সৈনিকের হস্তে সমর্পন করিয়া অমার্জনীয় অপরাধ করিয়াছে।....."